অন্নদাশঙ্কর রায়

# কলঙ্কবতী

কলিকাতা

ডি এম লাইব্রেরী

## পরিচ্ছেদ সূচী


| | |
|---|---|
| গৃহত্যাগের পূর্বে | ৩ |
| গৃহত্যাগ | ৩৭ |
| তদন্ত | ১০১ |
| নবজীবনের প্রান্তে | ১৩৪ |
| মনের খুশি | ১৯০ |
| ইতিমধ্যে | ২৩৫ |
| স্বপ্নের ফলন | ২৭৮ |


---

এই খণ্ডের রচনাকাল

১৯৩৪

দ্বিতীয় সংস্করণে এর কতক অংশ পরিত্যক্ত বা পরিবর্তিত হয়েছিল। তৃতীয় সংস্করণে প্রথম সংস্করণের পাঠ অনুসরণ করা হয়েছে। অল্প স্বল্প সংশোধন করা গেছে।

# চরিত্র পরিচিতি

| | | |
|---|---|---|
| বাদলচন্দ্র সেন | ... | এই উপন্যাসের নায়ক |
| সুধীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী | ... | বাদলের বন্ধু |
| উজ্জয়িনী | ... | বাদলের স্ত্রী |
| মহিমচন্দ্র সেন | ... | বাদলের পিতা |
| যোগানন্দ গুপ্ত | ... | উজ্জয়িনীর পিতা |
| সুজাতা গুপ্ত | ... | উজ্জয়িনীর মাতা |
| কুমারকৃষ্ণ দে সরকার | ... | সুধী বাদলের আলাপী |
| বিভূতিভূষণ নাগ | ... | সুধীর আলাপী |
| মাদাম দুপোঁ | ... | সুধীর ল্যাণ্ডলেডী |
| সুজেৎ | ... | মাদামের কন্যা |
| মার্সেল | ... | মাদামের পালিতা কন্যা |
| মিস মেলবোর্ণ-হোয়াইট | ... | সুধীর আণ্ট এলেনর |
| ডক্টর মেলবোর্ণ-হোয়াইট | ... | সুধীর আঙ্কল আর্থার |
| লিলি চ্যাটার্জি | ... | উজ্জয়িনীর বড় দিদি |
| ডলি মিত্র | ... | উজ্জয়িনীর ছোট দিদি |
| অমিয় চ্যাটার্জি | ... | লিলির স্বামী |
| মন্মথ মিত্র | ... | ডলির স্বামী |
| অশোকা তালুকদার | ... | সুধীর 'মনের খুশি' |
| সুশীলাবতী | ... | প্রসিদ্ধা গায়িকা |
| ত্রিভঙ্গ মুরারি | ... | হিন্দী কবি |
| বনমালী গোস্বামী | ... | বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব |

—আরো অনেকে—

শ্রীহরিশ্চন্দ্র বড়ালকে

# সত্যাসত্য

প্রথম খণ্ড

**যার যেথা দেশ**

দ্বিতীয় খণ্ড

**অজ্ঞাতবাস**

তৃতীয় খণ্ড

**কলঙ্কবতী**

চতুর্থ খণ্ড

**দুঃখমোচন**

পঞ্চম খণ্ড

**মর্ত্যের স্বর্গ**

ষষ্ঠ খণ্ড

**অপসরণ**

# কলঙ্কবতী

# গৃহত্যাগের পূর্বে

বেলুচিস্থান যাবার পথে পাটনায় ক্যাপ্টেন ও মিসেস গুপ্ত এক দিনের জন্যে থামলেন।

থামলেন মানে ক্যাপ্টেন উঠলেন রায় বাহাদুর মহিমচন্দ্রের বাসায়, আর মিসেস উঠলেন তস্য মোটরে, ড্রাইভারকে হুকুম করলেন, "[illegible] পি. কে সরকারকা কোঠি যাও।"

সেই যে তিনি সকাল বেলা কিছু মুখে না দিয়ে বেড়াতে [illegible] তারপর আহারের যতগুলা প্রহর সব একে একে উত্তীর্ণ [illegible] রায় বাহাদুর প্রত্যেক বার প্রতীক্ষা করলেন, যোগানন্দ [illegible] স্মিত হাসলেন, উজ্জয়িনী প্রত্যেকবার স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল। [illegible] ফিরলেন না। পাটনায় তাঁর "আপনার লোক" কিছু-না-হোক [illegible] ঘর ইংরেজ ও ইঙ্গবঙ্গ। এঁদের কারুর সঙ্গে করমর্দন, কারুর [illegible] কোলাকুলি, কারুর সশ্রদ্ধ নমস্কার ও কারুকে সস্নেহ তিরস্কার করতে করতে তাঁর সময় গেল কেটে। ব্লাড প্রেসার হয়ে অবধি [illegible] ছেড়েছেন, তবু আহারের প্রহরে যার বাড়ী যান সে-ই জোর করে খাওয়ায়। খাবার জন্য মানুষকে কত পীড়াপীড়ি করতে হয় [illegible] দেখলে কাঙালরা হতবাক হত। খাওয়া জিনিসটা এতই আপত্তি[illegible]

সারাদিনের ভিতর হিসাব করে সাড়ে [illegible] ছটাক খাদ্য খেয়ে সন্ধ্যার পর মিসেস গুপ্ত বাসায় ফিরলেন। হাঁপাতে হাঁপাতে একখানা গদিমোড়া চেয়ারে গা ঢেলে দিয়ে তিনি দুমিনিট চোখ বুজে ধ্যান করলেন—ভগবানকে নয়, বাগ্দেবীকে। তার পরে রায়বাহাদুরের দিকে [illegible] মাথা দুলিয়ে বললেন, "You [illegible] changing Hindus?"

উজ্জয়িনী ছিল না সে ঘরে, রায়বাহাদুর ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে হাঁ করলেন।

গুপ্তরা আসবেন খবর পেয়ে বেচারা সতের দিন ধরে কি প্রচণ্ড লণ্ডভণ্ড বাধিয়েছেন। পি. ডব্লিউ. ডি-র কণ্ট্রাক্টর, নেজারতের পিয়ন, ইলেকট্রিক মিস্ত্রী, মিউনিসিপ্যালিটির ইনস্পেক্টার, কলকাতার কন-ফেকশনার, দানাপুরের বেকার, কেলনারের বাবুর্চি, কমিশনারের খানসামা, জেলা জজের মশালচি, কালেক্টারের পানিওয়ালা, সিবিল সার্জনের মেথর, পুলিশ সাহেবের পার্শ্বরক্ষী, ইউরোপীয় ক্লাবের বরফ-ওয়ালা ও সোরাবজীর সরাবওয়ালা খাটতে খাটতে খিটখিটে হয়ে গেছে। শুধু বিরাট বখশিশের লোভে খোশমেজাজে সেলাম ঠুকে বেড়াচ্ছে।

তবু শুনতে হল, "You unchanging Hindus!" রায় বাহাদুর হাঙরের মতো হাঁ করলেন।

হায়! এই সতের দিনে সারকিট হাউস থেকে এসেছে আসবাব, র‍্যাঙ্কিনের বাড়ী থেকে এসেছে ডিনার জ্যাকেট, চুল ছেঁটেছে চীফ সেক্রেটারীর নাপিত, পোশাক ধোলাই করেছে খোদ লাট সাহেবের ধোপা, জুতা পালিশ করেছে ক্যাণ্টনমেণ্টের মুচি। চাকরদের গায়ে উঠেছে তকতকে লিভারী, গাড়ীর গায়ে ঝকঝকে বনাৎ, বাড়ীর গায়ে টকটকে রং, দরজায় দরজায় নয়া পর্দ্দা, টেবিল চেয়ারে নব আবরণী।

"You unchanging Hindus?"

রায় বাহাদুর যোগানন্দের দিকে তাকিয়ে হাঁ করে থাকলেন। যোগানন্দ রইলেন পেগ টানতে টানতে কান পেতে।

যোগানন্দজায়া গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলেন। কতকটা বিরক্তির সুরে বললেন, "সার পি. কে. সরকারের বাড়ী নিয়ে যাননি, সার,

হর্স ফিল্ড হাণ্টারের বাড়ী নিয়ে যাননি, সার মহম্মদ ফিরোজুদ্দিনের বাড়ী নিয়ে যাননি, নিয়ে যাননি মিস্টার সি. সি. গুহার বাড়ী, কর্নেল ওয়াটসন-স্মিথের বাড়ী, রাজা রাবণেশ্বর প্রসাদ সিং-এর বাড়ী, নবাব ওয়ারিশ আলী খাঁর বাড়ী—কত নাম করব। এমন কি, একবার গভর্ণমেণ্ট হাউসে নিয়ে গিয়ে গেটবুকে নাম লিখিয়ে আসেননি।" বলতে বলতে মিসেস গুপ্তের কণ্ঠরোধ হবার উপক্রম।

মহিমচন্দ্রের জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করছিল, "কাকে," কিন্তু তাঁরও কণ্ঠরোধ না হোক মুখদ্বার এতটা মুক্ত যে, সে পথ দিয়ে বাক্য চলাফেরা করতে ভয় পায়।

"এঁরা হলেন আমাদের আপনার লোক," মিসেস গুপ্ত অতিথি-জনোচিত মোলায়েম স্বরে বললেন, "অথচ আমার মেয়ে যে এই স্টেশনে এতদিন এসেছে তার সামান্য নিদর্শন—একখানা কার্ড—পর্যন্ত পাননি। তার মুখ দেখতে পাননি এঁরা। তাকে আপনি এমন কড়া পাহারায় রেখেছেন, বানিয়ে তুলেছেন আপনার স্ত্রীর মতো পর্দানশীন।"

রায় বাহাদুরের হাঁ আর বুজল না, উত্তরোত্তর বড় হতে লাগল। যেন বকাসুরের হাঁ।

"তুমি," মুখ থেকে পেগ নামিয়ে রেখে যোগানন্দ আরম্ভ করলেন, "তুমি ভুল করছ, বিবি। সারাদিন পরের বাড়ী বেড়ালে, যদি দেখতে খুকীর বাড়ীর অন্দর, যদি দেখতে খুকীর নিজের ঘর, তবে—হা হা হা হা—!"

যোগানন্দজায়া কৌতূহলী হলেন। মহিমচন্দ্রও হাঁ রুদ্ধ করলেন।

"দেয়ালে দেয়ালে কৃষ্ণ, রাধা, অষ্টসখী, পঞ্চতত্ত্ব, বস্ত্রহরণ, কালিয়-দমন, রাসলীলা, অবিশ্বাসীদের জন্যে নরককুণ্ড, ভোগীদের জন্যে কঙ্কাল, সংসারীদের জন্যে শ্মশান।"

যোগানন্দজায়া শিউরে উঠলেন। মহিমচন্দ্র মাথা নেড়ে তাল দিতে থাকলেন।

"মেজের উপর ফুলচন্দন, ধূপধুনা, শঙ্খচামর, কোশাকুশি, মাটির টবে তুলসীগাছ—হা হা হা হা—টবের মধ্যে তুলসীগাছ—"

যোগানন্দজায়া বললেন, "হ্যাঁ"। মহিমচন্দ্র ভরসা পেয়ে বললেন, "সত্যি।" কিন্তু ফল হল বিপরীত।

"Oh, you Hindus !"—মিসেস গুপ্ত এমন নাচারভাবে বললেন, যেন এই পৌত্তলিক জাতিটার সংশোধনের কোনো আশা নেই। কিছুতেই এরা সভ্য হবে না। অপরকেও এরা অসভ্য করে তুলবে।

"আমার মেয়ে একটু কেমনতর ছিল তা মানছি। কিন্তু এমনতর ছিল না নিশ্চয়। মাটির টবে তুলসীগাছ।"

"মাটির টবে তুলসীগাছ, মাটির প্রদীপে ঘিয়ের বাতি, কাঁসার বাসনে ভিজে মুগ আর ঝোলাগুড়, আরো কত সামগ্রী"—যোগানন্দ শেষ করতে পারলেন না।

গুপ্ত জায়া হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি দেখব।" তারপর সৌজন্যের সুরে, "আমি দেখতে পারি কি ?"

"অবশ্য, অবশ্য।" মহিমচন্দ্র থতমত খেলেন, শশব্যস্ততায় হোঁচট খাবেন এমন আভাস দিলেন। "এই দিকে, এই দিকে, আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক।"

২

কতকাল পরে বাবার সঙ্গে দেখা। কয়েকটা মাস নয় তো যেন বছর। যে ঘাটে বাবাকে রেখে এসেছিল ফিরে চাইলে সে ঘাট কি

আর চোখে পড়ে! কী বিপুল ব্যবধান! দৃষ্টি পরাস্ত হয়, স্মৃতি হয় ব্যাকুল ও দিশাহারা। সেই মানুষ আজ দৈবযোগে কাছে এসেছেন! কী আশ্চর্য্য। কী আনন্দ। তাঁকে চিনতে পারা যায় তো? না, তিনি কোন অচেনা মানুষ?

উজ্জয়িনী তার বাবার দিকে চেয়েই রইল, ভুলে গেল কথা কইতে। চুল বড় বেশি পেকেছে, চোখের কোলে বৃহৎ বিবর, ঠোঁট দেখে মনে হয় একটা বিশেষ পানীয় অতি মাত্রায় সেবন হয়েছে, চিবুক পড়েছে ঝুলে। এই তার বাবা। উজ্জয়িনীর মনটা বিষাদে ভরে গেল। তবু কোথা হতে এল এক উল্লাসের জোয়ার। বাবা এসেছেন তার ঘরে। তাকে দেখতে। বাবা তার অতিথি হয়েছেন। সেই এ বাড়ীর কর্ত্রী।

উজ্জয়িনীর ডাকতে সাধ যাচ্ছিল, 'বাবা', 'বাবলু', 'বাবু'. 'বাবুন', 'বব', 'ববি' 'বর্ম ভোলানাথ', আরো কত কী। কোন্ ডাকে ডাকবে স্থির করতে পারার আগে শুনতে পেল বাবা বলছেন, "কি রে, চিনতে পারছিস নে?"

লজ্জায় রাঙা হয়ে বাবার উপর থেকে চাউনি নামিয়ে নিয়ে উজ্জয়িনী করল কী—না ছুটে গিয়ে বাবার বুকে মুখ লুকিয়ে একটুখানি চোখের জল ঝরাল। সুখে নয়, দুঃখে নয়, এমনি। একটু মেয়েলি উচ্ছ্বাস। একফোঁটা মেয়েলিত্ব।

তারপরেই প্রশ্নের উপর প্রশ্ন—"সেই চিলগুলো কি তেমনি করে ওড়ে?" 'সেই যে রেল স্টেশনের মাঠে দাঁড়কাকদের সভা বসত, সে কি এখনো বসে?" "আর নদীতে আজকাল কত জল, ডুব-সাঁতার দেওয়া চলে?" "ওখানে কি এখনও সেই সাহেবটা আছে যে কুত্তা লেলিয়ে খেঁকশিয়ালি শিকার করত? ওঃ কী নৃশংস!" "আর সেই বুড়ী মিস যিনি একবার যাকে পাকড়াও করতেন

তাকে রাজ্যের কথা দশ ঘণ্টা ধরে শোনাতেন, একটা কথা ফুরালে পাছে সে যাবার জন্যে পা বাড়ায় সেইজন্যে একটা শেষ না হতে আর একটা শুরু করতেন ?"

যোগানান্দ ভাবলেন সেই খুকীই আছে। বয়সে কিছু বেড়েছে, ভারিক্কি হয়েছে, চেহারা থেকে আন্দাজ হয়, ভালো করে খায় না, অথচ শরীরে সঞ্চয় এত নেই যে না খেয়েও মোটা থাকবে। মস্ত ভুল করেছি তার বিয়ে দিয়ে। ছেলেমানুষ, ছেলেমানুষের মতো নির্ভাবনায় পুষ্টিলাভ করবে, কান্তিলাভ করবে। তা না, শ্বশুরগৃহের দায়িত্ব তাকে আড়ষ্ট করে তুলছে। তাই সে আমাকে দেখে তার স্বাভাবিক উল্লাস রটনা করতে পারল না, একবার 'বাবা' বলে ডাক দিল না।

উজ্জয়িনী বলল, "বাবা, তুমি কি কিছু খাবে, না আগে স্নান করবে ?"

যোগানন্দ বললেন, "কোনোটাই না। আমার মেয়ের সঙ্গে হিসাবনিকাশ করব।"

একথা শুনে উজ্জয়িনী মনে মনে শঙ্কিত হল। হাসতে হাসতে ঢলে পড়ে বলল, "সর্ব্বনাশ! কী বিষয়ী লোক হয়েছ তুমি, বাবা!"

সৌভাগ্যক্রমে মহিমচন্দ্র অদূরেই ছিলেন। তিনি যোগানন্দকে টেনে নিয়ে গেলেন কী একটা কথা বলতে। উজ্জয়িনী পালিয়ে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে খিল দিল। শ্রীকৃষ্ণের পটের সামনে দাঁড়িয়ে দুটা কথা কয়ে নিল। "শুনেছ কানু, কী মজা হয়েছে! এসেছেন একজন মহা নাস্তিক, আমার বাবা। তাঁর কাছে যদি তোমার কথা বলি তবে তিনি বোধ করি সটান কোয়েটা চলে যাবেন, এক মিনিট দাঁড়াবেন না। কী করি বল তো। তোমাকে যে চিনেছে

সে কি তোমার ছাড়া অন্য কারুর কথা, অন্য কোনো কথা, আলোচনা করতে পারে! তাই আমার কথা কইতে ভয় করে, পাছে সংসারের দশটা কথা নিয়ে আলাপ করতে করতে কখন আবিষ্কার করি যে এতক্ষণ তোমার কথাই হচ্ছে। আবার চুপ করে থাকতেও ভরসা হয় না। তোমার গরবে গরবিনী আমি, রূপসী তোমার রূপে। আমার সেই গরব, সেই রূপ কি লুকিয়ে রাখা যায় গো! সে কি প্রচার না করে পারি! রসনা যে নাম বিরহে বিরস হবে সখা। না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো, বদন ছাড়িতে নাহি পারে।"

উজ্জয়িনী গুনগুনিয়ে উঠল। তারপর বলল, "শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম!" নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, "নাঃ, ছাড়তে পারা যায় না দম থাকতে।" আবার গুনগুনিয়ে উঠল।

"জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো।
কেমনে পাইব সই তারে ॥"

এর পরের পংক্তি, "নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো, অঙ্গের পরশে কিবা হয়।"। এটি যেই মনে পড়ল, অমনি উজ্জয়িনী জিভ কেটে বলল, অসভ্য।" তার ব্রাহ্ম-সংস্কার বিদ্রোহী হয়ে তার বৈষ্ণব রসাস্বাদনে বাধা দিল। তখন সে মনকে চোখ ঠারল। ভাবল, ওসব অবশ্য রূপক। অঙ্গের পরশ নিশ্চয় আধ্যাত্মিক অর্থে।

তারপর বলল, "যাই দেখি বাবা কী করছেন।" শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কটাক্ষপাত করে বলল, "আসি। কেমন। শ্রীরাধা রইলেন পাহারা।"

এই বলে কীর্তনের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে বাইরে চলল। "যেতে না দিব। চিরদিন পরে পাইয়াছি লাগ যেতে না দিব। হে

পরানপিয়া যেতে না দিব। তোমায় আমায় একই পরান যেতে না দিব। হিয়ার হইতে বাহির করিয়ে যেতে না দিব।”

দেখল ইতিমধ্যে পাড়ার মোড়লরা এসে হাজির হয়েছেন। যোগানন্দ তাঁদেরকে নিয়ে ব্যাপৃত। উজ্জয়িনী একবার উঁকি মেরে কৌতূহল মেটাল, কান পেতে শুনল আলাপটা কোন প্রসঙ্গে। তার মনে হল ওঁরা মিছিমিছি বাবার নাওয়া-খাওয়ার দেরি করিয়ে দিচ্ছেন। সে নাথুনিকে ডেকে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে হুকুম করল, “সাবকা গোসল লগাও।”

এর পর ভিড় কমে গেল। নিতান্ত নাছোড়বান্দা জনকয়েক উমেদার—কেউ চান ছেলেদের জন্যে সুপারিশপত্র, কেউ চান জামাইয়ের জন্য বেলুচিস্থানে লুচির সংস্থান—ইঙ্গিতটাতে কর্ণপাত করলেন না। তখন উজ্জয়িনী আর একজনকে ডাক দিয়ে বলল, “শত্রুঘন্ সিং, সাবকো সলাম দো।”

“বাবা, তোমার স্নানের জল যে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা জলে স্নান করেই বুঝি এমন রোগা হয়ে গেছ। তোমার আদরের বেয়ারা খস্রু বক্স্‌কে চাবকে ঠাণ্ডা না করলে দেখছি চলবে না। এবার একটা কাবুলী বেয়ারা রেখো, বাবা। আচ্ছা বাবা তোমাকে ওরা আবার পেশাওয়ারে পাঠায় না। তা হলে আমিও একবার জন্মস্থানটা দেখে আসতুম।”

যোগানন্দ মেয়ের সব কথা কানে তুললেন কি না বোঝা গেল না। একদৃষ্টে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসতে থাকলেন। তাঁর খুকী বেশ মুখরা হয়েছে। হাজার হোক, একটা বাড়ীর ছোট গিন্নী। পদমর্যাদায় মাটিতে পা পড়বার কথা নয়। তবু যে পড়ছে এই আশ্চর্য।

বললেন, “জুনিয়র মিসেস সেন, তারপর—”

উজ্জয়িনী বাধা দিয়ে বলল, "যাও!" রেগে বলল, "সত্যি তুমি রোগা হয়েছ, বাবা। কেউ তোমার স্নানের জল থার্মোমিটার ডুবিয়ে পরীক্ষা করে না। এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। দেখব একটু পরে তোমার খাওয়ার ধরন। মাংস ঠিকমত খাচ্ছ তো!"

"কেন, তুই নিজে না নিরামিষাশী?"

"আমার কথা আলাদা। আমি তো আর রোগা হয়ে যাচ্ছি নে।" হেসে, "বরং মোটা হচ্ছি দিন দিন।"

৩

পিতা-পুত্রীতে সারাদিন এমনি কত কথাবার্ত্তা হল। কথাবার্ত্তার ফাঁকে ফাঁকে উজ্জয়িনী ছুটি না নিয়ে ছুটে গিয়ে তার শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পেয়ে আসে। গুনগুন করে গায়, "কি কহব রে সখি আনন্দ ওর, চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।"

"বাবা," উজ্জয়িনী হেলেদুলে ছেলেমানুষী ফলিয়ে বলল, "বাবা, আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল তো অর্দ্ধেক পথ যাই।"

যোগানন্দ না বুঝতে পেরে বললেন, "অর্দ্ধেক পথ! কোথায় নামতে চাস?"

"আগ্রায়।" উজ্জয়িনী প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিল, নেহাৎ মিথ্যাও বলল না।

যোগানন্দ ভাবলেন, আগ্রা হচ্ছে বিরহী-বিরহিনীদের তীর্থক্ষেত্র। আহা, মেয়ে আমার কী বিরহবিধুরা। আগ্রা গিয়ে বিরহী সম্রাটকবির সৃষ্টি দেখতে চায়। তাঁর মনে পড়ল, তাজমহলের সেই মৌন মর্ম্মরীভূত মর্ম্মাশ্রু।

"আগ্রা!" যোগানন্দ চিন্তিত হয়ে বললেন, "এখন সুবিধা হবে না, খুকী।"

"দূর, আমি কি সত্যি যেতে চাইছি?" উজ্জয়িনী তাঁকে আশ্বস্ত করল।

ঠিক এই রকম সময়ে এল মাতাজী। উজ্জয়িনীর পাতানো মাসিমা। বীণাদের বাড়ীতে তার সঙ্গে উজ্জয়িনীর আলাপ। বয়স বছর চল্লিশ হবে।

"রাধেকৃষ্ণ," মাতাজী খিড়কি দিয়ে ঢুকে সন্তর্পণে বলল, "রাধে!" সে জানে যে কর্তাটি জগাই-মাধাইয়ের বংশধর কিম্বা অংশধর। চাকরমহলে তার বিশেষ খাতির। কতক তার নিজ গুণে—সে সুরসিকা। প্রধানত সে উজ্জয়িনীর প্রিয় বলে।

"কৃষ্ণ!" মাতাজী এদিক ওদিক উঁকি মেরে বলল, "কই গো, কেউ সাড়া দিচ্ছ না কেন গো?"

রায় বাহাদুর বাসায় থাকলে সাড়ার বদলে তাড়া দিতেন। তিনি আপিসে। চাকরদের মহলে আজ ভারি হল্লা, পরদেশী ভৃত্যদের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময় চলেছে। মাতাজী মাসিকে তারা নজরে আনল না। কে এক ভুটিয়া না ভাটিয়া ভৃত্য দাঁত খিঁচিয়ে বলল, "ভোগ, ভাগ! কুছ্ মিলব না।"

মাতাজী রেগে বলল, "আমি কি ভিক্ষা নিতে এসেছি! আমি এসেছি আমার মেয়েকে দেখতে। এ আমার মেয়ের বাড়ী। দেখ তোরা, আমি পারি কি না ঢুকতে।" এই না বলে মাতাজী চলল সটান বৈঠকখানার দিকে, যত্ন গত্ন জ্ঞান হারিয়ে। এমনো হতে পারে সে উজ্জয়িনীর গলা শুনতে পেয়েছিল।

বারান্দায় একটা 'হাঁ হাঁ না না' রব শুনে উজ্জয়িনী বেরিয়ে

এসে দেখল মাসিমা। মাসিমা জয়োল্লাসে হাঁকল, "একবার প্রেমসে বোলো রাধারানী কী জে।" উজ্জয়িনী আতঙ্কে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। তা দেখে মাতাজী গেল তার দিকে কয়েক পা এগিয়ে। হাঁক শুনে যোগানন্দ উঠে এলেন। মাতাজী তাঁকে দেখে ভারী ঘোমটা টেনে দিয়ে লজ্জায় মুখ ফেবাল। উজ্জয়িনী যেন ধরা পড়ে গেল—এইরূপ ভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

ঘরে ফিরে গিয়ে যোগানন্দ পায়চারি করতে লাগলেন। উজ্জয়িনী যে বৈষ্ণবভাবাপন্ন হয়েছে তা তিনি জানতেন। কিন্তু সে যে এই সব ইতর শ্রেণীব লোককে প্রশ্রয় দিচ্ছে তা কি তিনি কল্পনা করেছেন। তাঁর মনে হতে লাগল, এটা একটা ব্যাধি—একটা অস্বাস্থ্যকব ব্যাপার। এর রীতিমতো চিকিৎসা দরকার।

উজ্জযিনীকে ঘরে ফিরতে দেখে যোগানন্দ বললে৽ "ও আপদটি কে?"

"মাসিমা।" উজ্জয়িনী মাতাজীর উপর বিরক্ত হয়ে রয়েছিল, সেই বিরক্তি বাবার উপর ঝাড়বার সূত্র পেয়ে তরুণবয়সীদের স্বাভাবিক নির্দয়তার সহিত বলল, "বৈষ্ণবী মাসিমা, ওর কাছে আমার তত্ত্বশিক্ষার হাতেখড়ি। ওর কাছে যা পেয়েছি, কোনো বইতে তা পাইনি। কথা আছে, ও আমাকে দ৷ক্ষাগুরু সন্ধান করে দেবে।"

যোগানন্দের বাক্‌স্ফূর্তি হল না।

উজ্জয়িনী তা লক্ষ্য করে আরো নির্দয় হয়ে বলল, "তুমি দেখবে, বাবা, আমার কৃষ্ণ? এস, তোমায় দেখাই আমার রাধামুরলীমনোহর।" এই বলে তাঁকে উত্তর দেবার অবসর না দিয়ে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেল উপরতলায়।

আয়োজন পর্যবেক্ষণ করে যোগানন্দ স্মরণ করতে থাকলেন তাঁর বৈদ্যশাস্ত্র। কোন্ ব্যাধির নিদান এসব। মাত্র কয়েক মাস আগে বহরমপুরে তো এ ব্যাধির লক্ষণলেশ ছিল না। গ্যালপিং ইনস্যানিটি।

উজ্জয়িনীর অনুতাপ হতে সময় লাগল না। আহা বেচারা বাবা! তিনি তো কেবল অপৌত্তলিক নন, তিনি নিরীশ্বরবাদী। তিনি তো কেবল নাস্তিক নন, তিনি জড়বাদী। যতদিন না তাঁর প্রতি ঐশ করুণা হয় ততদিন এসব তাঁর পক্ষে যন্ত্রণা।

বাবাকে খুশি করবার জন্য বলল, "বাবা," আব্দারের সুরে, "তুমি তো আমাকে বললে না কী একটা নতুন গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে।"

যোগানন্দ এতক্ষণে ধরে ফেলেছিলেন মেয়ের চাতুরী। বিকৃত স্বরে বললেন, "গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে বটে, কিন্তু আকাশে নয়, আমার জীবনে।"

উজ্জয়িনী অপদস্থ হয়ে চুপ করল।

যোগানন্দ ভাবতে লাগলেন, আমারি মেয়ে, আমার সাক্ষাতে এর জন্ম, এর শৈশব, এর দিনে দিনে মাসে মাসে বর্ষে বর্ষে বৃদ্ধি। আমার বিশ্বাস ছিল এর দেহের রক্তের মতো এর মনের চিন্তাও আমি চিনি। কিন্তু কী দেখলুম। দেখলুম আমার মেয়ে অম্লানবদনে আমাকে ভোলাচ্ছে, আমার চোখে ধূলা দিচ্ছে। অবশেষে ঘটনাচক্রে বৈষ্ণবীর পরিচয়-প্রসঙ্গে অনাবৃত করছে তার আধুনিক স্বরূপ।

৪

"হা হা হা হা," বললেন যোগানন্দ, "কী দেখে এলে, বিবি?"

মিসেস গুপ্ত উত্তর দিলেন না। মহিমচন্দ্র তাঁর হয়ে বললেন, "শকিং।"

"তোমাকেও খুব ঠকিয়েছে, না হে।"

"আমি আজ এই প্রথম জানলুম, যোগী। নইলে আমার বাড়ীতে পৌত্তলিকতা। তুমি তো জান, আমি গোঁড়া হিন্দু নই। বাদলের বিয়ে ত আমি তোমাদেরই মতে দিয়েছি বললে চলে। এসব—বুঝলে কি-না—ঐ পাশের বাড়ীর বিধবার কারসাজি। ভদ্রলোকের মা না হলে আমি এতদিনে শিক্ষা দিতুম পুতুলপূজা কাকে বলে। হেঁ হেঁ।"

যোগানন্দ কিন্তু কাউকে দোষ দিলেন না, উজ্জয়িনীকে ছাড়া। ভাবলেন ওর মাথায় কোনো গোলমাল আছে। কিন্তু কী চাতুরী! লিলি ডলির স্বভাব উজ্জয়িনীতে এল কেমন করে? বায়োলজিতে এর কী ব্যাখ্যা?

"চল, চল, আমরা আজ রাত্রেই চলে যাই," বললেন মিসেস গুপ্ত। "শকিং তো নয়, রিভোল্‌টিং। খুকীকেও নিয়ে যেতে পারলে কাজ হত। যদি ইনি রাজী হন।"

মহিম একথা শুনে আবার হাঁ করলেন। তবে বিবেচনা করে দেখলে তাঁর 'না' করবারও কারণ ছিল না। ও মেয়েকে তিনি সামলাতে পারছিলেন না। সেদিন অনুমতি না নিয়ে চলে গেল মিস্টার দাসের বাড়ী কীর্তন শুনতে। সেখানে নাকি কীর্তনীয়াকে হারছড়াটা উৎসর্গ করে এল। ওয়াই গুপ্তের কন্যা না হয়ে সাধারণ লোকের মেয়ে হলে মহিমচন্দ্র তাকেও কিছু শিক্ষা দিতেন। হেঁ হেঁ।

তবে তাকে ছেড়েও দেওয়া যায় না। দু দিন পরে ডিস্ট্রিক্ট পাবার আশা আছে। তখন কত পার্টি দিতে হবে। উজ্জয়িনী

যোগ না দিক, ভার না নিক, তার নামটা তো ব্যবহারে লাগবে। নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ তো তার নামে হবে। না, না, উজ্জয়িনীকে ছেড়ে দেওয়া চলে না।

"আমার আবার রাজী হওয়া!" রায় বাহাদুর বাঁকা হাসি হাসলেন। "আপনার মেয়ে আপনি নিতে চান সে তো অনুগ্রহ। এখানে কি আর তেমন সুখ স্বাচ্ছন্দ্য হচ্ছে? আমার কি তেমন সঙ্গতি আছে? তবে সে আছে বলে বাড়ীটা জমজমাট। সে গেলে খাঁ খাঁ করবে। আর কদিন আছি, আমার পরে একটু দয়া করতে হয়।"

"বাদলের খবর কী?" মিসেস গুপ্তের এতক্ষণে মনে পড়ল।

"ভীষণ পড়াশুনা করছে। সামনের বারে আই. সি. এস. দেবে। দিলেই নির্ঘাত পাশ।"

গুপ্তজায়া বিশ্বাস করলেন না। পাশ করা না করা কি ছাত্রের হাতে! পাশ করবে, তবে মানুষ হবে। কী জানি কত কাল পরে! ততদিন তার স্ত্রী এই পৌত্তলিক আবহাওয়ার নিশ্বাস নিয়ে পুরাদস্তুর সেকেলে বৌ বনে যাবে। তার মা ঠাকুরমার মতো। ছি ছি, সে যে ব্যাক টু বারবারিস্‌ম্। গোড়াতেই তিনি এ বিয়েতে অমত করেছিলেন। তাঁর দূরদৃষ্টির সাহায্যে তিনি এই দুরদৃষ্ট প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করেছিলেন। (যতটা করেছিলেন তার বেশি করেছিলেন বলে এখন তাঁর বিশ্বাস)।

"না, ও এইখানেই থাক। ওকে সঙ্গে নিয়ে কোনো ফল হবে না।" যোগানন্দ কঠিন কণ্ঠে রায় দিলেন, এতক্ষণ ধরে গলা ভিজিয়েও।

উজ্জয়িনী সেখানে ছিল না, ছিল খাবার ঘরে, খানার তত্ত্বাবধান করতে। তার মা ও শ্বশুর কখন তার কুঞ্জে গিয়ে তার মুরলীমনোহর দর্শন করে এসেছেন সে খবর রাখত না। হঠাৎ বাবার গলার আওয়া

আওয়াজ কানে যেতেই সে চমকে উঠল। ধীরে ধীরে বসবার ঘরের দিকে পা বাড়াল। শুনল মা বলেছেন, "এতক্ষণে বুঝলুম মিসেস স্যামুয়েল্‌স্‌ কেন কাজ ছেড়ে দিলেন।"

মহিমচন্দ্র বড় দুঃখে টিপ্পনী কাটছেন, "তিনি কি আপনি ছেড়ে দিলেন, না কেউ তাঁকে অপমান করে ছাড়িয়ে দিয়েছে!"

যোগানন্দ বলেন, "কোয়াইট লাইক্‌লি।"

শুনে উজ্জয়িনীর পায়ের নীচে মাটি সরে যেতে লাগল। সে হয়তো মূর্চ্ছা যেত, দুই হাতে দেয়াল ধরে দাঁড়াল। তার একটিও মিত্র নেই, সবাই শত্রু, তার বাবাও।

"ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে।"

ওদিকে তার মা বলছেন, "কিন্তু সব জিনিসের একটা কারণ আছে। আমগাছে জাম ফলে না। আমার মেয়ে কেন পুতুল পূজা করে, কার শিক্ষায়?"

মহিমচন্দ্র অন্তরে প্রমাদ গণছেন। যোগানন্দ বলছেন, "ওর কে এক মাতাজী মাসি আছে, ইতর-শ্রেণীর মেয়েমানুষ। আজ এসে গোলযোগ করছিল।"

মহিম বলছেন, "হোয়াট, হোয়াট, হোয়াট! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।" তাঁর কথা থেকে কে যে ঘোগ তা স্পষ্ট হল না। মাতাজী, না উজ্জয়িনী?

যোগানন্দজায়া মাথায় হাত দিয়ে উচ্চারণ করছেন, "ওহ্, আই নেভার।"

"তুমি বিশ্বাস করছ না মহিম," যোগানন্দ অট্টহাস্য করে বললেন। "এ রিয়াল লাইভ ঘোগ তোমার বাড়ীতে আসা-যাওয়া করে। মাই পুওর বোয়! তুমি তো থাক রাজ্যের বাড়ীর খবর নিতে ব্যস্ত।"

"বাট রায় বাহাদুর, ইউ অট টু ডু সামথিং। ইউ আর য়ান য়াডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট।" বললেন যোগানন্দজায়া।

"টু টেল ইউ দি ট্রুথ, ভয় ঐসব মাতাজীকে পিতাজীকে নয়, ভয় আপনার কন্যাকে। দেখেশুনে আশঙ্কা হয়, ওকে রাঁচি পাঠানো দরকার হয়ে পড়বে।"

"ইউ আর এ ডক্টর, হোয়াই ডোণ্ট এগজামিন ইওর ডটার?" বললেন স্বামীকে।

"আহ, ইট ইজ এভার সো আনপ্লেসাণ্ট।"

যোগানন্দজায়া উত্তেজিত হয়ে বলে ফেললেন, "সেই জন্যে তুমি এখনো ক্যাপ্টেন থেকে গেছ, তোমার সমবয়সীরা হয়েছেন কেউ লেফট্‌নেণ্ট কর্ণেল, কেউ মেজর। ইট ইজ এভার সো আনপ্লেজাণ্ট টু বি এ ডক্টর, চিরকাল এই হল তোমার ধুয়া।"

মহিম স্বামী স্ত্রীর কলহে মধ্যস্থ হওয়ায় মহা সুযোগ পেয়ে ভারি খুশি হয়ে গদগদ ভাবে দার্শনিক বচন আওড়ালেন।

এমন সময় উজ্জয়িনীর প্রবেশ।

"বাবা," উজ্জয়িনী সমাহিত স্বরে বলল, "আমি তোমাদের মেয়ে বলেই যে তোমরা আমার মনের প্রকৃতি কোনো দিন জানতে চেষ্টা না করেও তার উপর বিকৃতি আরোপ করবে এ আমার বিবেচনায় অন্যায়, এ তোমাদের অনধিকারচর্চা। এর জন্য তোমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত।"

সকলে স্তম্ভিত।

"আমার কি এইটুকু নৈসর্গিক স্বাধীনতা নেই যে আমি যা ভালো মনে করি তা বিশ্বাস করব, যাকে বিশ্বাস করি তাকে মাসিমার মতো মনে করব? ছোটলোক বড়লোকের তফাৎ যদি আমি না মানি তবে কার কী ক্ষতি! এদিক থেকে দেখলে তোমরা বড়লোকেরা কি কম ছোটলোক! নিজেদেরকে বড় মনে করাটা যে ছোটতা।"

যোগানন্দ অধোবদন হয়ে চিন্তা করলেন। জায়াও বিষম অপমান বোধ করলেন মেয়ের বাড়ীতে মেয়ের তিরস্কারে। কেবল মহিমচন্দ্র রায় বাহাদুরী করে উজ্জয়িনীকে বললেন, "প্রত্যাহার কর, ক্ষমা চাও। ওরা কত বড় লোক।" যোগানন্দজায়াকে বললেন, "ওর যে মাথা খারাপ এই তার হাতে হাতে প্রমাণ।"

৫

পর দিন যোগানন্দরা বিদায় নিলেন। অভাগিনী উজ্জয়িনী কল্পনাও করল না যে এই শেষ বিদায়। সে মুখ ভার করে রইল। যোগানন্দও ভালো করে তার সঙ্গে কথা কইলেন না। তার মা তো তাকে গ্রাহ্যই করলেন না।

উজ্জয়িনী মনে করেছিল তার শ্বশুর এবার আর রক্ষা রাখবেন না, তাকে কঠোর সাজা দেবেন। কিন্তু দেখা গেল, তিনি এ নিয়ে একদম মাথা ঘামান না। সেক্রেটারিয়াটে দোড়াদৌড়ি করতে করতে তাঁর যতটা ঘাম যায়, তদ্বির করতে গিয়ে তিনি যতটা ঘামেন, সেই ঘর্মস্রাবই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট।

এত সাধনা ব্যর্থ যায় না। একদিন তিনি উদ্বাহু হয়ে মোটর থেকে নেমে কীর্ত্তনিয়ার মতো নাচলেন। হঠাৎ তিনি গৌরভক্ত হলেন নাকি! তাঁর মুখে শুধু একটি নাম, "মুঙ্গের।" নাথুনিকে দেখে

বললেন, "মুঙ্গের।" শত্রুঘন্ সিংকে ডেকে বললেন, "মুঙ্গের।" কাকে যেন টেলিফোন করলেন, "মুঙ্গের।" উজ্জয়িনীর সঙ্গে দেখা হবামাত্র ভুরু নাচিয়ে বললেন, "মুঙ্গের।"

"মুঙ্গের কী বাবা?"

"মুঙ্গের।"

"মুঙ্গের কী বলছেন?"

"দেরি করছ কেন, তৈরি হয়ে নাও, বাক্স গুছাও, বিছানা বাঁধ, মুঙ্গের।"

"বদলি হয়েছেন বাবা? কী? কলেক্টব?"

"হাঁ গো হাঁ? কলেক্টর নয় তো পেয়াদা? সারাজীবন পেয়াদাগিরি করলুম, এতদিনে ভগবান আছেন বলে বোঝা গেল। তোমারই মুরলী মনোহরের কৃপা। নাও, নাও, এই পঞ্চাশ টাকার নোট, বৈষ্ণব খাওয়াও। মুঙ্গের।"

তারপর কয়েকদিন রাত্রি দুটোর সময় তাঁর ঘর থেকে শোনা গেল তিনি স্বপ্নে চেঁচিয়ে বলছেন, "মুঙ্গের।"

তাঁর থাডমায়ারারগণ তাঁকে ভোজ দিলেন, চাঁদার আশায় দু-একটা প্রতিষ্ঠান থেকে দিল মানপত্র, তাঁর সঙ্গে দু-তিন শ কেরাণী পিয়ন ও উকিল মোক্তার অফিসার মিলে এক অতিকায় গ্রুপ ফোটো তোলা হল। তিনি কতরকম উপহার পেলেন স্মারকরূপে। এই সব নিবন্ধন তিনি যারপরনাই ব্যস্ত রইলেন। কাজেই পাটনার বাড়ী ভেঙে মুঙ্গেরে তুলে নিয়ে যাওয়ার ভার পড়ল উজ্জয়িনীর উপর।

উজ্জয়িনীর সাহায্য করতে এল বীণা, তার মুখে হাসি, চোখে জল। বীণার সঙ্গে এল তার বন্ধু করুণা, সেই যার স্বামী নিতান্ত নির্বিকার নিঃসোহাগ নিঃসময়। অবোলা অবলা, আছে দুখানি সেবা-

তৎপর হাত। তারপর এল মাতাজী। কৃত্রিম রাগ করে গোছানো জিনিস ছড়িয়ে বলে, "তোর যাওয়া হবে না, বদলি রদ হবে দেখিস, কেন খেটে মরছিস!" পরিশেষে বীণার শাশুড়ী। বলেন, "যেখানে থাক, কৃষ্ণে মতি রাখ।"

সবাই এক জায়গায় বসে কাজ করে। সে ভারি সুখ। সকলের এক চিন্তা—আর হয়তো উজ্জয়িনীর সঙ্গে দেখা হবে না। আর ফিরবে না এই দিনগুলি। চির-অদর্শনের গুরু বেদনা প্রত্যেকের অন্তর আলোড়িত করে। ইচ্ছা করে কাঁদতে, কিন্তু লজ্জাও করে। সবাই জানে সবাইকার দশা। তাই বাক্য দিয়ে বোঝাতে হয় না। বাক্য দিয়ে বোঝানো যায়ও না। বেদনা যেখানে সত্যকার, বাক্য সেখানে ব্যঙ্গের মত শোনায়।

"দাও তো ভাই ওটা এদিকে," বলে উজ্জয়িনী, "এই সুটকেসে ভরতে হবে কি-না।"

বীণা তৎক্ষণাৎ সেটা বাড়িয়ে দেয়, যেন সেটাকে ওই সুটকেসে ভরতে না দিয়ে মহা অপরাধ করেছে, ভারি অপ্রতিভ হয়।

"বেশ ভাই বীণা, বহু ধন্যবাদ।"

বীণা কৃতার্থ হয়ে যায়, করুণার দিকে চেয়ে মুচকি হাসে।

কাজ করতে করতে উজ্জয়িনীর একবার মনে পড়ে শ্রীকৃষ্ণকে, একবার বাবাকে। এই দুই প্রিয়জনের মধ্যে কেন এ বিরোধ? কেন ইনি বাবাকে সুবুদ্ধি দেন না, কেন বাবা এঁর প্রতি অশ্রদ্ধা? বাবার উপরেই তার অভিমান হয় বেশি। বাবার সব ভালো, কেবল ঐ যে অহমিকা—তিনি যা শেখাবেন তাঁর মেয়েকে তাই শিখতে হবে, সে যেন কুকুর কি ঘোড়া, তাকে একটা বিশেষ পদ্ধতিতে তালিম করা দরকার। তার উপর দিয়ে হবে একটা বায়োলজিক এক্সপেরি-

মেণ্ট। তার বিবাহও যেন ইউজেনিক্সের পরীক্ষা। উঃ, এত জানলে সে কি মরতে বিয়ে করত! চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। বাবার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে উজ্জয়িনী ক্রমে ক্রমে বাবার মৎলব টের পাচ্ছে। তবু বাবাকে না ভালবেসে পারছে কই। বাবারা অমন হয়েই থাকে। সে যদি বাবার এলাকায় না থাকত তবে পড়ত গিয়ে মায়ের পাল্লায়, ব'নত তার দিদিদের নকল। উঃ সে কি বিশ্রী হত! তার চেয়ে এই ভালো। বাস্তবিক সন্তানমাত্রেরই উভয়সঙ্কট। সবচেয়ে ভালো আদৌ না জন্মানো। সাধকেরা যে মোক্ষ চান, জন্মান্তর থেকে নিস্তার চান, তার অর্থ আছে। চমৎকার হয়েছে যে উজ্জয়িনীকে মা হতে হল না। ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যে।

ভগবান যে তাকে এতটা কৃপা করেছেন সে কি তার চরম শ্রেয়ের, তার মুক্তির, ইঙ্গিত নয়? তার জীবন যে এত সহজ হয়ে গেল সে কি নয় ভাগবত সেবায় জীবনকে উৎসর্গ করে দেবার সংকেত? এত যে যাত্রার আয়োজন এ কি যাবার জন্যে মুঙ্গের? কে আছে তার সেখানে, কার আহ্বানে সেখানে যাওয়া? যাঁর খাতিরে সেখানে চলেছে কে হন তিনি তার? কেউ না, কেউ না, পরেরও পর। তার অনাত্মীয় বাদল, বাদলের প্রত্যাখ্যাত তিনি। তার প্রতি তাঁর মমতা নেই, আছে মালিকী স্বত্ব। সেও এমনি অনাথ যে দু বেলা চারটি খাবার জন্যে একজনের আশ্রয়নির্ভর। দু বেলাও সে খায় না আজকাল। সামান্য তার প্রয়োজন, তবু সেইজন্যে সে পড়ে আছে পরের বাড়ীর মাটি কামড়ে, জোঁকের মতো।

বৃন্দাবন নয়, মুঙ্গের। সেখানে যাবার জন্য এত উদ্যোগ। এখনো তার সাংসারিক মর্যাদার মোহ আছে, মুঙ্গেরে সে হবে কলেক্টরের

বৌমা, বড় কর্ত্তার বাড়ীর কর্ত্রী। তার অভাবে সংসার অচল। সে দুর্ব্বল। তার দুর্ব্বলতা ক্ষমা কর, সখা। তোমার বৃন্দাবন তো তার মতো সংসারকীটের তরে নয়। বৃথাই সে শ্রীমদ্‌ভাগবত পড়েছে, গোপীদের সর্ব্বস্বত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখেছে, আপনাকে গোপীরূপে কল্পনা করে পরম ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়েছে। বৃন্দাবনের সে অযোগ্য।

"এই দেখ তো উজ্জয়িনী। এই রকম হবে?"

উজ্জয়িনী বীণার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, "হবে, হবে ভাই বীণা।"

ভাবল, বীণার দুর্ব্বলতার মার্জ্জনা আছে। কেননা, তার চেয়েও দুর্ব্বল একটি মানুষ তার উপর নির্ভর। কমল তো একেবারে কমল, কমলের মতো কোমল। মা গো, এমন স্বামী মেয়েমানুষের হয়! স্বামী না হয়ে ছেলে হলে মানাত। হাঁ, বীণার বৃন্দাবন না যাওয়ার মার্জ্জনা আছে। কিন্তু উজ্জয়িনীর নেই। কোন মুখে সে বলবে, "আমাকে ক্ষমা কর, সখা।"

## ৬

মুঙ্গেরে যাবার সময় পাটনার বাড়ী ছাড়তে উজ্জয়িনীর পা অবশ বোধ হল, তার মনটা করে উঠল, হায় হায়। এ বাড়ীর আবহাওয়ায় ছিল বাদল, বাদলের অশরীরী অবস্থিতি। বাদল এ বাড়ীতে থেকে একে বাদলময় করে দিয়ে গেছে। বাদল না হয় দেশকে, দেশের সামিল এই বাড়ীকে, ভুলেছে। কিন্তু দেশ কি পারে বাদলকে ভুলতে? এ বাড়ী যে এখনো বাদলাকে ধেয়ায়। আহা, বাড়ীগুলোর প্রতি আমাদের একটু দয়ামায়া নেই। আমাদের যখন সুবিধা তখন ছেড়ে যাই, বেচে ফেলি, ভাড়া দিই।

বাড়ী বলে, যেতে নাহি দেব। উজ্জয়িনী বলে আমি পরাধীন। যেতে বাধ্য।

বাড়ী আর কী করে, শূন্যহৃদয়ে দাঁড়িয়ে দেখল উজ্জয়িনীদের যাত্রার যাত্রা। দেখবার মত যাত্রা। রায় বাহাদুরের দলবল তাঁকে ঘিরে তাঁকে মালা পরিয়ে তাঁর করমর্দ্দন ও চরণবন্দন করে তাঁকে অবিলম্বে পাটনার কলেক্টররূপে দেখবার আশা জানিয়ে তাঁর বৌমাকে অচিরে আই সি. এসের পত্নী হবার নিশ্চয়তা নিবেদন করে তাঁদের সঙ্গে স্টেশন পর্য্যন্ত চলল। বাস্তবিক রায়বাহাদুর একজন পপুলার অফিসার। অনেকের অনেক খুচরা উপকার করেছেন। কর্ত্তব্যের খাতিরে কড়া, কিন্তু ভিতরে নরম। কেউ এক আধ রতি খোসামোদ করলেই তিনি হুকুম বাহাল রেখেও প্রকারান্তরে লাঘব করেন। এমনো শোনা গেছে যে, তিনি অপরাধীকে সাজা দিয়ে তার উকীলকে ডেকে আপীলের খরচা দিয়েছেন। কোনো কোনো স্থলে জরিমানার টাকাও তিনি বেনামীতে দাখিল করেছেন। কানে কানে বলেছেন, "কী করব, সাজা দেখাতে না পারলে রাজা খুশি হন না। তাই আমার শতকরা নিরানব্বুইটি কনভিকসন। কিন্তু দুর্ভোগটা আমারি সব থেকে বেশি হে। ঘর থেকে প্রায়ই সাজার খেসারৎ দিতে হয়। নইলে পরকালের রাজাকে খুশি করা যায় না।"

উজ্জয়িনীর তুলসী মহারানীকে নিয়ে মুশকিল বাধল। তাঁকে সে মাল-গাড়ীতে কিম্বা ব্রেকে দেবে না, তিনি তো গাছ নন যে গাছের মধ্যে গণ্য হবেন, গাছের মতো ব্যবহার পাবেন। উজ্জয়িনী তাঁকে ফার্স্ট ক্লাসে করে নিয়ে চলল, তাঁর শ্রীঅঙ্গে জল ঢেলে কামরাটাকে বিশ্রী করে তুলল।

মহিম বললেন' "ও আপদটাকে সঙ্গে না এনে কমলের মা'র মতো পাটনায় রেখে এলে পারতে, বৌমা।"

উজ্জয়িনী মর্ম্মাহত হল।

মহিম আরো বললেন, "এনে ফেলেছ যখন তখন সরাও ওটাকে বাথরুমে, এ ঘরটা নোংরা করতে পাবে না।"

উজ্জয়িনী টবটিকে দুই হাতে তুলে জানালা দিয়ে বাইরে ছেড়ে দিল আলগোছে। তারপর দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল।

মহিম ভ্রূক্ষেপ করলেন না। মুঙ্গেরে গিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিতে হবে, শুনতে পেয়েছেন সেখানে বকেয়া কাজ অনেক, ইনস্পেকশন অর্দ্ধেক বাকী, বছর শেষ হয়ে এল, ৩১শে মার্চ্চ রয়েছে সামনে। খাটতে খাটতে জীবনটারও ৩১শে মার্চ্চ আগতপ্রায়। তবু ছুটি নেই। তাঁর উপর একটা জেলার সুশাসনের দায়িত্ব। তিনি তো দায়িত্বহীন সাধু সন্ন্যাসী বা স্ত্রীলোক নন। এমনি কঠোর দায়িত্ব বহন করতে হবে তাঁর পুত্রকেও, সেই উদ্দেশ্যে তাকে বিলেত পাঠানো। জীবনে তিনি টাকার কাঙাল হননি, তাঁর যত্র আয় তত্র ব্যয়, টাকার কুমীর হতে চাইলে ডেপুটী না হয়ে মুন্সেফ হতেন। টাকার চেয়ে বড় হচ্ছে দায়িত্ব, সুশাসনের দায়িত্ব, প্রজাহিতের। এতদিন পরে সেই দায়িত্ব তাঁর স্কন্ধে পতিত হয়েছে।

"মুঙ্গের," রায় বাহাদুর ভাবলেন, "মুঙ্গের কি একটা ভৌগোলিক অভিধা? মুঙ্গের মানে মূক মানবযূথ, ডাম মিলিয়ন্‌স্। আমি তাদের বিধিনির্দ্দিষ্ট রাখাল।"

মুঙ্গের যতই নিকটবর্ত্তী হল, রায় বাহাদুরের মুখভাব হল ততই কঠিন। তাঁকে অভ্যর্থনা করতে যে সব কর্ম্মচারী আসবে তাদের চোখে প্রথমদর্শনে যেন তাঁকে মনে হয় বাঘা হাকিম, সুন্দরবন থেকে আমদানি। সাহেবদের কটা চামড়া তাদেরকে ভয়াবহ করেছে, তাই তারা দেশী লোকদের কাছ থেকে কাজ পায় বিনা

ধমকে। রায় বাহাদুর উপাধিটা তাঁর প্রেষ্টিজ নষ্ট করে রেখেছে, নইলে তিনি সেন সাহেব বলে নিজেকে জাহির করে সাহেবী প্রেষ্টিজের অর্দ্ধেক পেতেন। উপায়ান্তর নাস্তি। বাঘা হাকিম বলে পরিচয় দিলে যদি কিছু বাধ্যতা আদায় করতে পারা যায়।

রায় বাহাদুরের করাল চক্ষু ও বিকট কৃত্রিম স্বর তাঁর অভ্যর্থকদের সত্যিই ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দিল। তিনি ভুলেও হিন্দী কিম্বা বাংলা বললেন না। চোস্ত ফেরঙ্গ ইংরেজী। একটা সিগার বার করে তাতে য্যায়সা টান দিলেন যে সিগারের পো পলকে ভস্মসাৎ। কী করা যায়। শাসন করতে হলে ত্রাসোৎপাদন করতে হয়। তবে হয় কাজ হাসিল। লোকে যদি নিজেদের স্বার্থ বুঝত তবে কেন রাজা বা রাজপুরুষের প্রয়োজন হত?

উজ্জয়িনী শ্বশুরের স্বরপরিবর্ত্তনে শিউরে উঠল, চোখ দেখে চোখ তুলতে, পারল না। মহিমচন্দ্র তাকেও খাতির করলেন না। তার মনের উপর বাঘের থাবা বসিয়ে দিলেন। তাতে তার মন ক্ষতবিক্ষত হল কি না কেয়ার করলেন না। আহেল বিলিতী সাহেবের মতো ইংরেজীতে তাকে বললেন, "নাও মাই চাইল্ড, দিস ইজ সমুগির। ডোণ্ট মেক এ ফুল অফ ইওরসেল্ফ হিয়ার।"

রায় বাহাদুর চার্জ্জ নিতে, ট্রেজারীতে টাকা গুণতে, আমলাদেরকে ইণ্টারভিউ দান করতে, সম্পদস্থদের বাড়ীতে কল্ করতে, ক্লাবের মেম্বর হতে, জেল পরিদর্শন করতে—ইত্যাদি ইত্যাদিতে—এমন ব্যস্ত রইলেন্ যে উজ্জয়িনীর দিকে নজরই দিলেন না, সে তার ধর্মকর্মে ব্যাঘাত পেল না। তবে তারও এক আপদ জুটল। অনেকে এলেন তার সঙ্গে মোলাকাৎ করতে। তাকে অনুরোধ করলেন এখানে পুরস্কার বিতরণ করতে, ওখানে দ্বারোদ্ঘাটন

করতে। সে অস্বীকার করলে তাঁরা কানে তোলেন না। তা কি হয়? কলেক্টর সাহেবের বৌমা থাকতে অন্য কেউ কি এসব কাজ পারে? লোক জমবে কেন অন্যে এসব করলে? অর্থাৎ উজ্জয়িনীই অনুষ্ঠানের আকর্ষিকা শক্তি।

শ্বশুরের সঙ্গে তার দেখা ক্বচিৎ হয়। তখন তিনি ইংরেজীতে বলেন—বাঘের মতো গর্জ্জন করে—"জজের ওখানে আলাপ করে এসেছ তো? পুলিশম্যানের ওখানে? সিবিল সার্জ্জন অবশ্য স্ত্রীকে হোমে পাঠিয়ে দিয়েছেন। একদিন এদের সবাইকে ডিনারে ডাক, তুমিই হস্টেস, তোমার নামে ইনভিটেশন যাবে।"

প্রথমে মাসখানেক তার মন্দ লাগল না অতিথিচর্চ্চা গল্পগুজব সভাসমিতি খেলাধূলা। তার এক বিশিষ্ট বন্ধু হলেন মীরা ব্যানার্জি, জামালপুরের কোনো রেলওয়ে অফিসারের স্ত্রী। প্রায়ই দেখা করতে আসেন, ধরে নিয়ে যান। বয়সে তার চেয়ে কিছু বড়। মোটাসোটা গোলগাল হাসিখুশি মানুষটি, চোখে চশমা, জোড়া ভুরু, বাঁকা সিঁথি, আর কপালে তিল—এই তাঁকে চিনে রাখার চিহ্ন। প্রথমে ছিলেন মিসেস ব্যানার্জি, তারপর হলেন মীরাদি ভাই। তা হলে কি হয় উজ্জয়িনী তার জীবনের একটা দিক তাঁর কাছে গোপন রাখল অতি সন্তর্পণে—তার ধর্মকর্ম। সে যে প্রকৃত কী তা সে-ই জানে আর জানে তার সখা। তার বন্ধুজনেরও সে ক্ষেত্রে প্রবেশ মানা—যদি না বীণার মতো তারা হরিভক্ত হন।

মাসখানেক পরে রায় বাহাদুরের যখন কিছু ফুরসৎ হল তখন একদিন তিনি বললেন, "লুক হ্যাট মীরা ব্যানার্জি, আন্‌কমন্‌লি গ্রেসফুল, আইডিয়াল হিণ্ডু লেডি। তাঁর তো এ সমস্ত ছেলেমানুষী

বা বুড়মানুষী নেই। চমৎকার বাজাতে পারেন বিলিতী পিয়ানো তথা দিশী সেতার। রাঁধেন দুই দেশেরই অমৃত। নিখুঁত ইংরেজী বলেন অথচ সংস্কৃততে অনার্স। ওঃ এমন মেয়ে লাখে এক মেলে।"

এ কথা শুনে ও এই উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করে উজ্জয়িনী বিবর্ণ হয়ে গেল। এ যে প্রকারান্তরে তারই নিন্দা। অন্য কথায় বলা হল যে বাদলের সঙ্গে মীরার মতো মেয়ের বিয়ে হলেই মানাত, মীরাই মহিমচন্দ্রের আদর্শ বৌমা।

"তবে," উজ্জয়িনীর ইচ্ছা করল কিন্তু সাহস হল না জিজ্ঞাসা করতে, "তবে আমাকে বৌমা করবার দরকারটা কী ছিল? ভুল করে আমার ইহকালটা তো গ্রাস করলেন, পরকালেরও পথ বন্ধ করবেন!"

এর পর মীরার উপর উজ্জয়িনী বিনা দোষে বিরূপ হল, মেয়েলী হিংসায়। মীরা বেচারী টের পেল না হেতু কিন্তু বোধ করল ব্যবহারবৈষম্য। ভাবল, কলেক্টরের পুত্রবধূ ও আই এম এসের দুহিতা, তাদের ধরনই আলাদা, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ। তাদের সঙ্গে আমাদের সামঞ্জস্য হবে কেন!

মীরা আর আসে না, উজ্জয়িনীও আর তাকে ডাকে না। কুঞ্জের দ্বার রুদ্ধ করে উজ্জয়িনী অতিরিক্ত আগ্রহে ভজন সাধন জুড়ে দিল। ভাবল, এই একটি মাস বিফলে গেছে। ওরা সামাজিক জীব, ভালো বৌবো স্বামীটি গৃহটি মাসের শেষে মাইনেটি, মাইনের হিসাবে সামাজিকতা, ওদের সঙ্গে আমার সামঞ্জস্য হবে কেন? আমার সেই মাতাজী মাসিকে আনতে পাঠাব।

"শ্যাম," উজ্জয়িনী আকুলকণ্ঠে বলে, "তুমি যে আমার প্রাণ।

দেহ মন আদি তোমাতে সঁপেছি কুলশীল জাতি মান। কানু, ওরা আমাকে বুঝতে পারবে কেন! ওরা ভাবে আমি ছেলেমানুষী করছি, আমি করছি বুড়মানুষী। যদি যেমন তেমন করে পিয়ানো বাজাতুম, রাঁধতে জানতুম কারী বা কাটলেট বা পাই, যেটুকু ইংরেজী জানি সেটুকু জাহির করতুম, তা হলে আমিও হতুম আন্‌কমন্‌লি গ্রেসফুল।"

মীরাদির উদ্দেশে বলে, "তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি যার মনে যেবা লয়। ভাবিয়া দেখিলাম শ্যাম বন্ধু বিনে আর কেহ মোর নয়। ঘরে গুরুজন বলে কুবচন সে মোর চন্দন চুয়া। শ্যাম-অনুরাগে এ তনু বেচিনু তিল তুলসী দিয়া।"

সে যে একেবারে অন্যরকম, মীরার মতন নয়, কারুর মতন নয়—সে যে সংসারের নয়, সমাজের নয় হয়তো এ পৃথিবীরই নয়—মহিমচন্দ্রের উক্তির সে এই উত্তর মনে মনে দিল। শ্বশুরের মুখের উপর উত্তর দিতে পারলে তার জ্বালার উপশম হত, কিন্তু তখন তখন উত্তর যোগায়নি। সে এতই বিস্ময়বিমূঢ় হয়েছিল যে উপরন্তু অপ্রতিভ হয়েছিল।

"কানু," সে অনুযোগের স্বরে বলে, "আমি কি এই কয়েদখানায় কায়েম হব, তোমার কি খালাসের হুকুম আসবে না? কে চায় আমাকে এখানে—কে আমাকে চায় শুদ্ধ আমার খাতিরে? শ্বশুরের চাহিদা তাঁর বৌমাকে, বৌমার থেকে স্বতন্ত্র করে যে আমি, তাকে তো তাঁর মনে ধরে না, কানু। কেন আমি এ বাড়ীর জায়গা জুড়ে থাকব। তাঁর ইচ্ছা হয় তিনি মীরা ব্যানার্জির বোন টোন থাকলে তাকেই বৌমা করতে পারেন।" এই বলে সে ফিক করে হেসে যোগ করল, "অবশ্য ইংলণ্ডে নিয়ে গিয়ে।"

"কানু, সত্যি কি আমার উপায় নেই? আমাকে পড়ে থাকতেই

হবে এই কারাগারে! আমার এখানকার কাজ কী জান? সাহেব-মেমদের খানার খবরদারি করা। তাতেই আমার গুরুত্ব। সে ভারি মজা। ওরা তো খায় না, কাঁটাছুরি চালিয়ে জীবজন্তুদের সাথে লড়াই করে। আহা, কী তাদের কথাবার্ত্তার বিষয়! ততক্ষণ হরি নাম শুনলে কর্ণরসায়ন হত। আমি আবার যাচ্ছি কীর্ত্তনে। যা বলবেন বলুন কলেক্টর সাহেব। না হয় গ্রেপ্তার করে আর এক কারাগারে দেবেন, যে কারাগারে কংস দিয়েছিল তোমার মাকে।"

ওদিকে মল্লিকা হালদার মীরা ব্যানার্জিকে বলছে, "বড়মানুষের মেয়ে হলেই হয় না। কিছু বিদ্যে থাকা চাই। সামান্য ইংরেজী বলতে পারে না, তবু কী অহঙ্কার! আমি ও মেয়ের চেহারা দেখেই চিনেছি। তাই সেধে আলাপ করতে যাইনি।"

"আমি বুঝি সেধে আলাপ করতে গেছলুম?" মীরা বলছে। "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম। উনি হুকুম করলেন, যাও, একলাটি কষ্ট হচ্ছে, একবার খবর নিয়ে এস। তখন তো বেশ ভদ্রতাই কবল, বোধ হয় নতুন পৌঁছে অন্য কোনো আলাপী পায়নি বলে। এতদিনে নিশ্চয়ই অনেক হিতৈষী জুটেছে, দিয়েছে মাথাটি গরম করে, আমরা আমল পাব কেন?"

"আমরা তো ওর শ্বশুরের সেরিস্তাদারের পরিবার নই, কিম্বা ওর শ্বশুরের ডেপুটি দলের।"

"যা বলেছ ভাই। আমরা তো ওকে দুই হাতে সেলাম করতে জানিনে। আমাদের প্রার্থনাও কিছু নেই।"

"আচ্ছা, ওকে বয়কট করা যায় না? শুনতে পাই পাটনাতেও ওরা ওকে বয়কট করেছিল।"

"তাই নাকি? করা উচিত। তা বলে আমি লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়ে বয়কট প্রচার করতে পারব না ভাই।"

"সে ভার আমিই নিলুম। দেখি, কোন্ বাঙালীর মেয়ে ওর বাড়ী পা দেয়—ওব শ্বশুরের তাঁবেদার পরিবার ছাড়া।"

"ওই সব পাত্রমিত্র নিয়ে ও রাজত্ব করুক। আমরা ওর দরবারে কুর্নিশ করতে যাচ্ছি নে।"

"তবে মুশকিল কী জান। ওকেই সবাই ডাকবে পুরস্কার বিতরণ করতে, দ্বারোদ্ঘাটন করতে। ও শুধু কলেক্টরের বৌমা নয়, এক্স গুপ্তব নাতনী, ওয়াই গুপ্তর মেয়ে। আমাদের এই পুরুষগুলি কেমনতর স্ববিশ।"

"যা বলেছ। শুধু পুমানরা নয়, মেয়ে স্কুলের বৃদ্ধা কুমারীরাও ওকে—ওই একরত্তি মেয়েকে—দিয়ে পুরস্কার বিতরণ করাতে পারলে ধন্য হয়ে যায়।

"তার কারণ আছে। কারণ বিনা কার্য হয় না। ওকে না ডাকলে সরকারী গ্রাণ্ট বন্ধ হয়ে যাবে যে। শুধু সরকারী নয়, জমিদারী। রাজা মহীপতিনারায়ণ সিং সেদিন ওকে কী রকম তোয়াজটা করছিলেন। ওর শ্বশুর ইচ্ছা করলে খাজনা দেবার সময় বাড়িয়ে দিতে পারেন, মহাল নীলাম দেরিতে করতে পারেন।"

"যা বলেছ ভাই। ওর শ্বশুরের হাতে অসুরের ক্ষমতা।"

এদিকে উজ্জয়িনী সেই শ্বশুরের নামে নালিশ জানাচ্ছে।

বলছে, "কংস। কংস বললেই ওঁর যথার্থ নাম বলা হয়। সেদিন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ এসে আমার কাছে কত কান্নাকাটি করল। তার নামে নাকি সার্টিফিকেট বেরিয়েছে—আচ্ছা, কানু, সার্টিফিকেট তো সুপারিশপত্র বলেই জানতুম। তাতে কান্নার কী আছে—তা সার্টিফিকেট তো বেরিয়েছে বেচারা ব্রাহ্মণের নামে, তার সম্পত্তি বিক্রী হয়ে যায়। আমি বললুম কংসরাজকে, ব্রাহ্মণকে কি মাপ দেওয়া অসম্ভব? কংস

কী বললেন, শুনবে কানু? গভর্ণমেণ্ট ইজ নট্ এ চ্যারিটেবল্ ইনষ্টিটিউশন। তোমার যদি এত দয়া তবে তুমিই বামুনের দেয়টা মিটিয়ে দাও।"

ইতিমধ্যেই রায় বাহুরের এক ডজন মোসাহেব জুটেছিল। তাদের একজন হলেন সদর এস. ডি. ও. হরিবংশ সহায়। আর একজন ক্যাপ্টেন নবেন্দু চাকলাদার, সাবডেপুটি। দুই ডালকুত্তার মতো এঁরা এঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীদেরকে কাবু করে ভাগিয়ে দিয়েছিলেন। এঁরা রায় বাহাদুরের দক্ষিণ ও বাম হস্ত। প্রত্যেক শাসনকর্ত্তাকে শাসিতদের নাড়ীর খবর রাখতে হয়, সে খবর সরবরাহ করেন হরিবংশ সহায়। কে হাসল, কে কাশল, কে হাঁচল, কে নাচল—এই সব জরুরি সংবাদ। কে কী স্বভাবের লোক, কার সঙ্গে কেমন চাল চালতে হবে, কার কোন্‌খানে দুর্ব্বলতা—এই সব গরীয়ান বৃত্তান্ত হরিবংশবাবুর নখদর্পণে। আর ক্যাপ্টেন চাকলদার করেন গৃহস্থালীর তত্ত্বাবধান, যেদিন পার্টি থাকে সেদিন স্বয়ং বাজার থেকে মাল খরিদ করে আনেন, আসবাব সাজান, বাবুর্চিকে তাড়া দেন, ঝাড়ুদারের হাত থেকে ঝাঁটা কেড়ে নিয়ে নিজে মেজে সাফ করেন, বেহারার হাত থেকে ছিনিয়ে নেন ঝাড়ন। তাঁকে ক্যাপ্টেন না বলে জেনারল বলা যেতে পারে, অবশ্য সামরিক অর্থে নয়।

কিন্তু সামরিক অর্থেও কি তিনি ক্যাপ্টেন? হরি, হরি। রায় বাহাদুর তো জানেন না, কয় জনই বা জানে যে তিনি প্রকৃতপক্ষে হাবিলদার অবধি উঠতে পেরেছিলেন, তাও লড়াই না করে, শুধুমাত্র কুচকাওয়াজের ফলাফলে। চাকলাদার জখম হয়েছিলেন সে কথা সবাইকে বলে থাকেন ও তার চিহ্ন দেখিয়ে থাকেন। কিন্তু তিনি যে রটান স্ক্যাণ্ডার্সে এবং হানদের দ্বারা সেটা হাসিল

মিথ্যা। আসলে সেটা মেসপটেমিয়াতে ও তাঁর অধীনস্থ একজন বাঙালী সিপাহীর দ্বারা। তাঁদের আদৌ তুর্কীর সঙ্গে লড়তেই হয়নি। নিজেদের মধ্যে মারামারি করে তাঁরা বাগদাদ থেকে দেশে ফেরেন। অমল গোঁসাই যখন রিভলবার চালায় তিনি তখন ঘুমিয়ে। প্রাণসংশয় হয়েছিল, খুব বেঁচে গেলেন। দেশে ফিরে জখম দেখিয়ে পেয়ে গেলেন সাবডেপুটির চাকরি। বিদেশে গিয়ে তিনি একটা জিনিস মন দিয়ে শিখেছিলেন, সেটা মিলিটারী ইংরেজী ও পোশাকের পারিপাট্য। রায় বাহাদুর তাইতে মহা তুষ্ট। দেখেও দেখেন না চাকলাদার মামলা মোকদ্দমার কী ভাবে নিষ্পত্তি করছেন। প্রতিদিন সকালবেলা রায় বাহাদুর শুনতে পান, "সার, ক্যান আই বি অফ এনি ইউস টু-ডে ?" রায় বাহাদুর আপ্যায়িত হয়ে উত্তর দেন, "নো, থ্যাঙ্ক ইউ। হ্যাভ এ স্মোক, ক্যাপটেন।"

হরিবংশ ও চাকলাদার উজ্জয়িনীর অনুগ্রহ পাবার জন্যে লালায়িত ছিলেন। কিন্তু তাকে বাইরে দেখতে পেতেন না। তবে চাকরের মারফৎ তার অভিমত জিজ্ঞাসা করে পাঠাতেন চাকলাদার। হরিবংশের তেমন কোনো উপলক্ষ ঘটত না। তাঁর আশঙ্কা হত চাকলাদার তাঁর চেয়ে রায় বাহাদুরের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছেন, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাচ্ছেন। হরিবংশ ধূর্ত্ত লোক, তা তিনি হতে দেবেন কেন ? তিনি চাকলাদারের উপর কড়া নজর রাখলেন।

চাকলাদারের সৌজন্যে প্রীত হয়ে উজ্জয়িনী একদিন তাঁকে বলল, "আচ্ছা, ক্যাপ্টেন সাহেব, এখানে কীর্ত্তন গাইতে জানে এমন লোক পাওয়া যায় না ?"

"নিশ্চয় পাওয়া যায়, বাই জোভ, কীর্ত্তন গাইবার লোক পাওয়া

যাবে না! এখানে না পাওয়া গেলে মালদা থেকে আনিয়ে দেব, মিসেস সেন। লীভ ইট টু ইওর ওবিডিয়েণ্ট সার্ভেণ্ট।"

দীনহীন দাস বৈরাগী চারদিনের দিন এসে উপস্থিত। বাড়ী মালদহ জেলার কোন গ্রামে, আখড়া ভাগলপুর জেলায়। সঙ্গে পোঁটলা পুঁটলি এনেছেন। কিছুদিন থেকে যাবেন। উজ্জয়িনী তো হাতে স্বর্গ পেল। এই সে চায়। স্বগৃহে মহাজনসেবা। মাধো সিং রাজার পাটরাণীর মতো তারও—

"মনে হৈল এই যে পরমানন্দ সার
একেলা যে আস্বাদিতে নহে চমৎকার
বৈষ্ণব সহিত রস আস্বাদিতে সুখ
নতুবা অন্তরে গুমরিয়া হয় দুখ।"

বৈরাগীর মুণ্ডিত মস্তক, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মুখ, তাতে কয়েকটা বসন্তের দাগ আছে। বয়স চল্লিশের ওপারে। কণ্ঠস্বর মধুর, পরিষ্কার ও উচ্চ। একটা মুদ্রাদোষ—কথা বলবার সময় ডান হাতের বুড় আঙুল ও মধ্যম আঙুল জুড়ে উৎক্ষেপ ও নিক্ষেপ।

বৈরাগী বললেন, "বড়ই আনন্দিত হলুম। গৌর যে কাকে কখন করুণা করেন, রাজরাণীকেও দাসী করেন। আহা! মা আমার এই বয়সে এমন ভক্তিমতী! শোন মা, দীনহীনের একটা আকিঞ্চন আছে। তুমি আমাকে তোমার প্রসাদ সেবা করতে দিও।"

তার মানে আমি তোমার উচ্ছিষ্ট খাব।

উজ্জয়িনী কানে আঙুল দিল। জিভ কাটল। তখন বৈরাগী বললেন,

"বিশেষতঃ বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট পাদোদক
পরম পদার্থ সেই কহিব কি তক।

তাহার মহিমা কিছু কহা নাহি যায়
যাতে চতুর্ব্বর্গ মিলে কৃষ্ণভক্তি হয়।"

উজ্জয়িনীর মনে পড়ল কোথায় তা আছে। তবু তার সংস্কার বিদ্রোহী হয়ে উঠল। ধিক্কার বোধ হল। সে সবলে মাথা নেড়ে বলল, "আমি বৈষ্ণব নামের যোগ্য নই, আমি দাসানুদাসী। সে কিছুতেই হতে পারে না।"

রফা হল, বৈরাগী প্রসাদ পাবেন, তবে উজ্জয়িনীর না, উজ্জয়িনীর রাধামুরলীমনোহরের।

তারপর বইল কীর্ত্তনের স্রোত। মহিমচন্দ্র সুবিধা করে দিলেন সফরে বেরিয়ে।

"ব্রেজে যাব, ফিরে আসব না ভাই, কাঙ্গালী হব।
আমি ব্রেজে গিয়ে এই করিব হে।
আমি মাধুকরী মেঙ্গে খাব। কাঙ্গালী হব।
কোথায় রাধাকুণ্ড হে আমি নয়নে হেরিব।
কোথায় কালিন্দী যমুনার জল হে আমি কর পূরে খাব।
কোথায় তাল বন ও তমাল বন হে নয়নে হেরিব।
কোথায় বংশীবট শীতল ছায়া হে আমি তাপিত প্রাণ জুড়াব।
কোথায় রাধাকৃষ্ণের নিত্য লীলা হে আমি নয়নে হেরিব।"

উজ্জয়িনী হাঁটু পেতে ডান দিকে হেলে ডান হাতে ভর দিয়ে, বাঁ হাত রাখে উরুর উপর। সেই হাত দিয়ে বার বার চোখ মোছে তবু তপ্ত জলের বেগ রোধ করা যায় না। আঁচল যেন বালুর বাঁধ। বৈরাগীরও চোখ ছল ছল করে, তার কণ্ঠে সত্যিকার আবেগ।

"বৃন্দাবনবিলাসিনী রাই আমাদের, রাই আমাদের
রাই আমাদের, রাই আমাদের, আমরা রাইয়ের, শ্যাম তোমাদের।"

উজ্জয়িনীও আবেশে হাত তুলে উরুর গায় তাল দেয়। বলে ওঠে,—"আহা!"

বৈরাগী তা শুনে গর্জ্জে ওঠে, "রাধে! রাধে! রাধে!"

"শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতেরই কালো
সারী বলে আমার রাধা রূপে করে আলো।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু
সারী বলে আমার রাধা বাঞ্ছা কল্পতরু।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ বাঁশি করে গান
সারী বলে ঐ বাঁশিতে বলে রাধার নাম।"

উজ্জয়িনী মুগ্ধ গদগদস্বরে কি যে বলে তার অর্থ হয় না। ভাবাবেশে বিহ্বল।

বৈরাগী চেঁচিয়ে ওঠে, "রাধে! রাধে! রাধে!"

———

# গৃহত্যাগ

## ১

সফর থেকে ফিরে রায় বাহাদুর হরিবংশের মুখে শুনলেন, "লোকের মতিচ্ছন্ন হয়েছে।"

রায় বাহাদুর বুঝতে পারলেন না, জিজ্ঞাসা করলেন, "কী ব্যাপার?"

"আজ্ঞে, এই শহরের লোকের কথা বলছি। এদের মতো বিচ্ছু আমি আর কোনো শহরে দেখিনি।"

"খুলে বলুন বাবুজী? কী? কী হয়েছে?"

"না, হবে আর কী। হয়েছে এদের মতিচ্ছন্ন। যা বলা উচিত নয় তাই এরা বলছে। বেয়াদবদের শায়েস্তা করতে পারি যদি ইঙ্গিত করেন।"

"কী—কী বলছে—আমার নামে কিছু নয় তো?"

"সে কী! আপনার নামে ভালো কথা ছাড়া আর কী বলতে পারে? এমন সব্যসাচী হাকিম পেয়েছে ওরা কখনো? টাইলার সাহেব ছিল গরীবের মা-বাপ, কিন্তু কাজকর্ম কিছুই বুঝত না। আমিই সব করে-কর্মে দিতুম। সার কি আমার করবার কিছু রেখেছেন? সারের কল্যাণে আমি ইদানী বেকার।"

"কিন্তু গরীবের মা-বাপের কথা বললে যে, টাইলার হাজার হোক বিদেশী, সে কি আমার চেয়ে—"

"না, না, রাম, রাম, সিয়ারাম। আপনার চেয়ে গরীবের প্রতি দরদ টাইলারের! আপনি যে পকেট থেকে গরীবের জরিমানার টাকা দেন সেকথা ভূ ভারতে কে না জানে?"

"তবে আপনি কি শুনেছেন ও কার নামে ?"

"অভয় দেন তো বলি, কলেক্টরের কুঠিতে হরিসংকীর্ত্তন এ যাবৎ ওরা শোনে নি। বলছে সার নাকি সাহেব নন, দেশোয়ালী—"

"কী! কী! আমার বাংলোতে হরিসংকীর্ত্তন! কবে! কখন! কার দ্বারা!" রায় বাহাদুর টেবিলের উপর মুষ্ট্যাঘাত করে হরিবংশের পিলে চমকিয়ে দিলেন। হাঁক ছাড়লেন, "কোই হ্যায়—"

"হুজৌর।" জমাদার ইমদাদ আলী হুড়মুড় করে এসে পড়ল।

"কৌন্ গানা করতা রহা হমারা কোঠিমে ?"

"হুজৌর।"

"ক্যা, সমঝতা নেহি ? আই য়্যাম য়্যাফরেড দিস ফেলো ডাস নট আণ্ডারস্ট্যাণ্ড হিজ ওন ল্যাংওয়েজ।"

হরিবংশ সমঝিয়ে দিলেন, "এক আদমি ইহা ভজন করতা হৈ কি নেহি ?"

"জী, করতা হৈ।"

"ডিসমিস হিম। হোয়াই ডাস ।হ য়্যালাও ত্যাট বেগার টু কাম ইন্টু মাই প্রেমিসেস ?"

হরিবংশ তর্জমা করে বললেন, "উসকো আনে দিয়া কৌন ?"

"কপ্তান সাব উসকো মেমসাবকা বাস্তে কাঁহাসে লা দিয়া।"

হরিবংশ মুচকি হাসলেন, কার্য্যসিদ্ধির হাসি।

রায় বাহাদুর তাজ্জব বোধ করলেন। জেরার দ্বারা জানলেন যে বৈরাগীটা এই বাড়ীতে আছে ও উজ্জয়িনীর মহলে অতিথি হয়েছে। অগ্নিশর্ম্মা হয়ে তিনি আদেশ করলেন, ওই ভণ্ড প্রতারককে, ওই ছদ্মবেশী ডাকাতকে, গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসতে।

এল বৈরাগী দীনহীন দাস। ভয়ে তার আত্মারাম ত্রেজে চলে গেছে।

রায় বাহাদুর শুধালেন, "ভণ্ডামিকা ভেক কব লিয়া হৈ ?"

"আজ্ঞে—"

"কোথায় তোমার দেশ ?"

"কর্ত্তা, মালদহ জেলায়। কর্ত্তা, আমাদের আখড়া ভাগলপুর চম্পানগরে।"

"আমার এলাকার বাইরের লোক তুমি কী করতে আমার এলাকায় এসেছ ? আই ডোণ্ট লাইক ফরেন ডিষ্ট্রিক্ট মেন।"

"কর্ত্তা, শ্রীচরণ গোস্বামী আমার গুরু। তাঁকে পৃথিবীর লোক জানে, কর্ত্তা। আমি দস্যু তস্কর নই।" লোকটা পায়ে পড়বার উপক্রম করল।

এমন সময় উজ্জয়িনী সোর শুনে উপস্থিত। "কী হয়েছে, কী হয়েছে, বাবা ?"

"হুঁউউউ—" রায় বাহাদুর বাঘের অংশ অভিনয় করলেন। হুঙ্কার শুনে যে যেখানে ছিল সেখান থেকে দু পা পেছিয়ে গেল।

"ইম্পার্টিনেন্স মাস্ট হ্যাভ এ লিমিট।" বললেন রায় বাহাদুর। "সাহেববাড়ীতে কীর্ত্তন গায়, এত বড় ধৃষ্ট !"

"কিন্তু, বাবা, আমিই ওঁকে আনিয়েছি, আমারি অনুরোধে উনি কীর্ত্তন করেন, ওঁর কী দোষ ?"

বৈরাগীর এতক্ষণে মুখ ফুটল। "কর্ত্তা, আমার কী দোষ ? হাসে দেখুন—"

"চোপ।" রায় বাহাদুরের ইসারায় ইমদাদ গর্জ্জে উঠল।

"ইউ আর টরচারিং মি, ইউ আর রুইনিং মাই রেপুটেশন।" রায় বাহাদুর স্বকীয় আনুনাসিক স্বরে নাচারভাবে বললেন। তারপর হাত হেলিয়ে ইসারা করলেন বৈরাগীকে বাইরে নিয়ে যেতে।

"হরিবংশবাবু, ক্যাপ্টেনকে আমি ক্ষমা করতে পারিনে, আপনি যতই তার হয়ে বলুন না কেন।"

"সার, এইবারটি তাকে মাফ করুন। আমি তাকে খুব শাসিয়ে দিচ্ছি। সে তো আমারি অধীন।" হরিবংশ মনে মনে জুড়ে দিলেন, যদিও সে কথা তার খেয়াল থাকে না।

উজ্জয়িনী যেমন অপ্রস্তুত, তেমনি অপমানিত বোধ করছিল। তার জন্যে বৈরাগীর এ দশা, ক্যাপ্টেনের কী হবে কে জানে। আর সে নিজে নাকি তার শ্বশুরকে যন্ত্রণা ও তাঁর সুনামকে ধ্বংস করছে। এমন কি অপরাধের কাজ সে করেছে একটু কীর্ত্তনের আয়োজন করে? "সাহেববাড়ী"তে—হাঁ, সাহেববাড়ী বটে। উজ্জয়িনীর হাসি পেল, সে বাইরে গেল বৈরাগীর অবস্থা দেখতে।

"থ্যাঙ্ক ইউ হরিবংশবাবু।" রায় বাহাদুর একটু অন্তরঙ্গ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "আর কেউ কিছু বলছে না কি—এই, জজ, এস. পি., সিবিল সার্জ্জন।"

"না, না।" হরিবংশ চুপি চুপি বললেন, "এদের চাপরাশীরা এখনো অমন কোনো কথা শুনতে পায় নি। ওদেরকে আড়ি পাততে পরামর্শ দিয়েছি।"

"ধন্য ধন্য হরিবংশবাবু।" ইংরেজীতেই। "আপনি পাকা লোক, আপনার প্রমোশন ঠেকায় কে? আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি, আপনি এখনো রায় সাহেব হননি।"

"তার কারণ," হরিবংশ ল্যাজ নাড়তে নাড়তে বললেন, "সারের মতো সার পাইনি।"

২

বৈরাগীকে ইমদাদ বাইরে বসিয়ে হিতোপদেশ দিচ্ছিল। "এ বড় জবরদস্ত হাকিম আছে। ইনকা বেটা গেছে বিলায়ৎ, সাহেব হোয়ে ফিরবে। এ মেমসাব তখন কীর্ত্তন শুনবে না রে দাদা, কীর্ত্তন শুনবে না। কিলাবমে গিয়ে দূসরা মরদকা সাথ নাচবে।"

বৈরাগী হাঁ করে বলছিল, "য়্যা।" কানে আঙুল দিয়ে বলল, "কী শুনলাম!"

"তুমি বিশোয়াস লগছে না, হমি কী করব। কভি নাচ দেখা নেহি সাবলোগোঁকা। যাও, যাও, দেশ চলা যাও।" হঠাৎ উজ্জয়িনীকে লক্ষ্য করে, "কিলটর সাবকা হুকুম, ক্যা করেঁ?"

উজ্জয়িনীকে দেখে বৈরাগী ব্যাকুলভাবে বলল, "মা রে, চলি।"

"কে তোমাকে যেতে বলেছে, কাকা?"

"চলি।" বৈরাগী সজল কণ্ঠে বলল, "বাঁধা হয়ে জেলখানায় যেতে পারব না, মা। চোর নই, ডাকু নই—" এই বলে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উজ্জয়িনীর পা জড়িয়ে ধরল। উজ্জয়িনী অসহায়ভাবে চেয়ে রইল।

"রাধামুরলীমনোহর তোর মঙ্গল করুন। তোর স্বামীকে খুব বড় পাস করিয়ে খুব বড় চাকরি দিয়ে নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনুন। তোর সদা কৃষ্ণে মতি থাক।" রুদ্ধস্বরে, "তোর সন্তানদের যেন কৃষ্ণে মতি থাকে।" তারপর, "চলি।"

উজ্জয়িনী বলল, "এক মিনিট দাঁড়াও।" দৌড় দিয়ে কিছু ফুল তুলসী, ফল মূল ও একটি সোনার হার এনে বৈরাগীর দুই হাতে ভরে দিল।

সোনা দেখে বৈরাগী লাফ দিয়ে হাত ঝাড়তে লাগল, দশ বার করে। আতঙ্কে কালো হয়ে গেল তার মুখ। যেন সোনা নয়, সাপ!

বলল, "এক্ষুনি আম্যাকে চোর বলে পুলিশে দেবে। আমার কী হবে গো।" এই বলে আর এক দফা কান্না। "বলবে আমি বামাল সমেত ধরা পড়ে গেছি। ওরে মা রে, এমন নির্দ্দয় হোস নে।"

উজ্জয়িনী বিরক্ত হয়ে ভাবল লোকটার মাথা খারাপ। সে তো জানে না সংসারের নীতি।

ইমদাদ হার ছড়াটা তুলে নিয়ে উজ্জয়িনীর হাতের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "ও জো বোলতা হৈ মেমসাব সাচ হৈ, য়্যায়সা হি ছুনিয়া।"

উজ্জয়িনী হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, "ও আমি ফিরিয়ে নিতে পার্বি নে। তুমিই ওটা নাও, নিয়ে ওকে ওর রেলভাড়াটা দিয়ে দাও।"

ইমদাদ এক এক করে একুশটা সেলাম করল। খোদা যাকে দিতে চান তাকে ছপ্পর ফাড়কে দেন। কম করে ধরলে ছশ টাকা দাম উঠবে, বৈরাগী যদি ফার্স্ট ক্লাসেও চড়ে তবু যা বাঁচে সেই টাকায় আর একটা বিয়ে করা যায়। ইমদাদ কুর্নিশ করে কয়েক বার সামনে ও পিছনে হাঁটল। তারপর বৈরাগীকে মিষ্ট স্বরে ডাকল, "আইয়ে সাধুবাবা, মেহেরবানি কিজিয়ে।"

"মা রে, তবে আসি।" বৈরাগী দ্বিধার সঙ্গে চলতে উদ্যত হল।

"আচ্ছা।" উজ্জয়িনী অসহায় স্বরে বলল। তার কত সাধ ছিল। কীর্ত্তন শিখবে, কথাগুলি লিখে নেবে। সে ইতিমধ্যে মাতাজী মাসিকে আসতে লিখেছে। আরো বৈষ্ণব সংগ্রহ করবার জন্যে ক্যাপ্টেনকে বলেছে। সবাইকে নিয়ে একটা সংঘ করবার অভিলাষ তার ছিল—ব্রজবিরহী-সংঘ। আজ কি-না গোড়ায় গোলযোগ।

সাহেববাড়ীতে কীর্ত্তন নিষেধ। বাইরেও যে কীর্ত্তন শুনতে যাবে তার জো নেই, তাও মানা। সে তবে করবে কী? মীরা ব্যানার্জির সঙ্গে গল্পগুজব? পার্টি দেওয়া, পার্টিতে যাওয়া? এখানে দ্বারোদ্ঘাটন, ওখানে পুরস্কার বিতরণ? অন্তহীন, ক্লান্তিকর সামাজিকতা।

হরিবংশ বিদায় নিলে রায় বাহাদুরের অনুতাপ হল।

কে জানে লোকটা হয়তো সত্যিকার সাধু, অভিশাপ দিলে না জানি কী অনর্থপাত হবে। হরিবংশটার সামনে সাহেবীয়ানা জাহির করবার জন্যে অতটা রূঢ়তা রাজনীতি হতে পারে, কিন্তু হিন্দু সন্তানের পক্ষে ধর্ম্মনীতি নয়। ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ স্বার্থ সংরক্ষণ করা আবশ্যক। হিন্দুর বাচ্চা তো আর সাহেবদের সঙ্গে ডে অফ জজমেণ্ট পর্যন্ত কবরে পড়ে রইবে না। পরজন্মে হয়তো সেই বেটা সাধুর পোষা বেড়াল হতে হবে।

রায় বাহাদুর জানালা দিয়ে দেখলেন বৈরাগী যাবার উদ্যোগ করছে। ইসারায় ডাকলেন।

বৈরাগী ভাবল, এই রে, মরেছি রে। ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে ঘণ্টায় পোয়া মাইল হারে এগতে লাগল। অগত্যা রায় বাহাদুরই তার দিকে পা বাড়ালেন। একবার এদিকে একবার ওদিকে চেয়ে দেখলেন হরিবংশ নেই। নীচু গলায় বললেন, "কিছু মনে কোরো না, বাবাজী। আমি কি আর সত্যি তোমার উপর রাগ করে ছিলুম? লোকশিক্ষার জন্য হাকিমকে অমন রাগ দেখাতে হয়। বুঝলে কি না, আমার মতো লোকের উপর পাঁচ জনের ভয় থাকাটা দরকার।"

"অবশ্য! অবশ্য!" বৈরাগী প্রাণ ফিরে পেয়ে উল্লাসাধিক্যে বলল, "তা কি এ অধম বোঝেনি। হুজুরের কলম তেজ থাকুক, হুজুর লাট সাহেব হোন।"

"না, না, এত নয়, এত আশা করি নে। কমিশনার যাতে হতে পারি সেই আশীর্ব্বাদ কর।" এই বলে পকেট থেকে একখানা দশ টাকার নোট বার করে তার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। বৈরাগী নোটখানা মাথায় ঠেকিয়ে বলল, "আমি প্রতিদিন আমার আখড়ার রাধাননীচোরাকে জানাব হুজুর যেন শীগ্রি কমিশন সাহেব হন।"

মহিম ফিরছিলেন, বৈরাগী পিছু ডাকল, "হুজুর।"

"কী?"

"হুজুর কমিনশন হোন।"

"তা তো একবার বললে।"

"হুজুর বাহাদুর, হারছড়াটা তো আমারই পাবার কথা!"

"কী আবোল তাবোল বকছ? যাও।"

"এজ্ঞে এই যে যাচ্ছি।" বৈরাগী শশব্যস্তে বলল, "পেরণাম হুজুর বাহাদুর। তা হলে হারছড়াটা চাপরাসীই পেল।"

মহিমচন্দ্র অবগত হলেন উজ্জয়িনী একছড়া হার বিলিয়ে দিয়েছে। ইমদাদকে ডাকলেন। হারটা তার কম্পমান ও অনিচ্ছুক হস্ত থেকে তুলে নিয়ে পরখ করে দেখলেন, তারপর কী ভেবে দুজনকেই বললেন, "কর টাগ অভ ওয়ার। যে জিতবে সেই পাবে।"

দেখা গেল বৈষ্ণব ও মুসলমান দু-ই সমান মহারথী। হার ভেঙে দুভাগ হয়ে গেল।

## ৩

রায় বাহাদুর উজ্জয়িনীর মুখ দর্শন করলেন না। তাতে উজ্জয়িনীর কী আসে যায়? সে নিজের ঘরে খিল দিল। ভাবল, কী

পারেন উনি? কৃষ্ণ আমার সহায়। তিনি আমাকে সতত রক্ষা করবেন। আমি মুঙ্গেরের ম্যাজিস্ট্রেটের প্রজা নই, আমি প্রজা বৃন্দাবনেশ্বরী রাধারানীর। নিজের জন্যে নেই আমার ভয়, আমার আক্ষেপ কেবল এই যে, আমাকে যারা ভালোবাসে, আমার যারা আত্মীয়, তাদের সঙ্গে মিলে আমাদের সকলের যিনি প্রিয়তম তাঁর লীলাপ্রসঙ্গ আলোচনা করব। আহা! প্রিয়তমের বিষয় শতমুখে শ্রবণ করলে শতগুণ মধুর লাগে, পরমুখে শ্রবণ করলে পরম মধুর লাগে—আবার আক্ষেপ কেবল এই যে, তেমন সুযোগ পেলুম না।

তার কানে বাজতে থাকল, 'ব্রেজে যাব ফিরে আসব না ভাই, কাঙালী হব। মাধুকরী মেঙ্গে খাব, কাঙ্গালী হব।'

সে মীরার—মীরা ব্যানার্জির না—মীরা বাঈয়ের বৃত্তান্ত পড়েছিল। "বৃন্দাবনে গিয়া বাঈ আনন্দে মগন। বাঞ্ছা হৈল শ্রীরূপ গোস্বামী দরশন।" রূপ গোস্বামীকে সংবাদ দিলেন। রূপ বললেন, "নাহি করি স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষ।" এ কথা শুনে মীরা বলে পাঠালেন, "এতদিন শুনি নাই শ্রীল বৃন্দাবনে। আর কেহ পুরুষ আছয়ে কৃষ্ণ বিনে।" শ্রীরূপ লজ্জিত হলেন। তখন দুজনের দেখা হল। "পরমা সুন্দরী বাঈ অলপ বয়েস। গোপী উদ্দীপনে রূপের হৈল প্রেমাবেশ। দুইজন পরস্পর কৃষ্ণ কথা রসে। মগন হইল প্রেম আনন্দ উল্লাসে।"

সেও মীরা বাঈয়ের মত ব্রজে গিয়ে কৃষ্ণকথা রসে মগ্ন হবে তথাকার গোস্বামীদের সঙ্গে। তাঁহারা তো পুরুষ নন, তাঁরাও গোপী। একমাত্র কৃষ্ণই পুরুষ আর কেউ পুরুষ নয়। আর সকলেই নারী। আহা, শ্রীবৃন্দাবন! নারীরাজ্য! নারীজাতির এমন গৌরব অন্য কোথাও নেই। সর্ব্বত্র নারীর বন্দিনী দশা, অধীন অবস্থা। কিন্তু

শ্রীল শ্রীবৃন্দাবনে পুরুষরাও নারী বলে গণ্য, কে নারীকে শাসন করবে? যিনি সেখানকার একশ্চন্দ্র তিনি তো কাউকে বাঁধেন না, মারেন না, খাটান না, খোঁটা দেন না, তিনি যে প্রেমিক, তিনি যে রসিক।

"ব্রেজে যাব ফিরে আসব না রে ভাই, কাঙালী হব।"

উজ্জয়িনী তার পটস্থ কৃষ্ণের দিকে চেয়ে বললে, "কাঙালী হব তাও সই, কিন্তু এই কান্তারে পড়ে থাকতে পারিনে, কানু। মানুষ ত নয়, বাঘ। দিন দিন ব্যাঘ্রাকার হচ্ছেন। মাধো সিং রাজার রাণী বাঘকেও নাম জপ করিয়েছিলেন। তথাহি শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থে—

কৃষ্ণসেবা পূজা রাণী করিতেছে বসি।
সেইকালে ব্যাঘ্র তথা দাণ্ডাইল আসি।
রাণী দেখি স্নেহ করি তাহারে ডাকিল।
আইস আইস বাপু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।
পুলক হইয়া ব্যাঘ্র অষ্টাঙ্গ হইল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি উঠি নাচিতে লাগিল।

বাঘও কৃষ্ণনাম নিয়ে নাচে, কিন্তু আমার এমনি শ্বশুরভাগ্য, তিনি বাঘা হাকিম হয়েও বাঘের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবেন না। যদি অন্য কেউ নাচে—যেমন বৈরাগী—তবে সে বেচারাকে ভাগলপুরে ভাগিয়ে দেবেন। কানু, তুমি আমাকে ডাক দাও, আমি যাব।"

একবার যাবার কথা উঠলে আর কি কিছু ভাল লাগে। উজ্জয়িনী অনবরত তাই ভাবতে থাকল। তার পূজোতেও মন লাগল না। ত্রুটি ঘটছে বুঝতে পেরে ইষ্ট দেবতাকে বলল, "কানু, যেখানে তোমার বসতি, যেখানে তুমি ভাবসম্মিলনে শ্রীমতীর সঙ্গে

সঙ্গতা, যেখানে তোমার বাঁশরী শত কর্মের অন্তরালে ব্রজসুন্দরী-গণকে উতলা করছে, সেইখানে আমাকে নিয়ে চল। এখানে আমার কক্ষকে তোমার কুঞ্জ করেছি বটে, কিন্তু এ তো বৃন্দাবন নয়, এ মুঙ্গের, এ কংসের মথুরা। এখানে আমি একাকিনী, বড় একাকিনী। আমাকে নিয়ে চল সেইখানে যেখানে আমি হব অসংখ্য গোপীর মধ্যে একতমা। যেখানে আমার অন্য পরিচয় নেই, আমি অনামিকা। যেখানে নেই অপ্রিয় সংসর্গ, বিষয়চিন্তা, সাংসারিক উন্নতির ধ্যান। আমি সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ চাই—থাকবে না আমার তিলমাত্র বংশমর্য্যাদা, পদগৌরব, বসনভূষণ লোভ, আহারলালসা, মান-অভিমান ক্রোধ, বোধ করব না আমি লাজ অপমান, আমার ইচ্ছা তোমার ইচ্ছা এক হয়ে যাবে। না গো না, তোমার ইচ্ছার আমার ইচ্ছা সত্তা হারাবে, প্রভু আমার।”—এই বলে উজ্জয়িনী গুনগুন করে উঠল,

“তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিব প্রেমের ফাঁসি
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হৈলাম দাসী।”

এক ভাবে ঘরে বন্ধ থাকা তো চলে না। তার উপর কত জনের কত দাবি। কত আবেদন-নিবেদন আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ সাক্ষাৎ প্রার্থনা আলাপের ছল। ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ীর একমাত্র নারী সে, তার দুর্ভাগ্য কি সহজে খণ্ডন হবার

এবার এসেছেন ত্রিভঙ্গমুরারি মিশ্র, একজন উচ্চাভিলাষী কবি।

“নমস্কার,” ত্রিভঙ্গবাবু অভিনয়ের ভঙ্গীতে জোড়াহাত চিবুকে

ঠেকালেন। "আমি তিনবার এসে ফিরে গেছি, মিসেস সেন। আজও আশা ছিল না যে আপনার দর্শন পাব। আমি ধন্য।"

"বসুন।"

ত্রিভঙ্গবাবু ত্রিভঙ্গভাবে না হোক, বিশেষ ভঙ্গীসহকারে আসন গ্রহণ করলেন, তা নইলে আর্টিস্ট কিসের? বড় বড় কোঁকড়ান চুল। স্বভাবত কোঁকড়া নয়, চেষ্টার দ্বারা তথাকৃত। কচ্ছপের খোলার চশমা, আয়তনে কচ্ছপেরই মত। কপালে রক্তচন্দন বিন্দু, বিন্দু হলেও বৃহদাকার। নিরেট ভরাট মুখ। বলিষ্ঠ গড়ন।

"আমি বাঙালী নই, কিন্তু বাংলাতেও লিখে থাকি। আমার গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ।" ত্রিভঙ্গবাবু স্বরটাকে বেমালুম বাঙালীর মতো করে বললেন। "আমি ভারতবর্ষের প্রায় সবাইকে চিনি, অর্থাৎ বড় বড় লোককে। তাই আমার মনে হল আমি মুঙ্গেরে থাকি অথচ আপনাকে চিনি না এ কেমনতর, পাঁচজনকে আমি এর কী কারণ দেব?"

উজ্জয়িনী যে আত্মবিলোপ করেনি তা দেখা গেল। সে অন্তরে পুলকিত হয়ে বাইরে আরক্ত হল। তীক্ষ্নদৃষ্টি ত্রিভঙ্গ তা চশমার আড়াল থেকে লক্ষ করল। তার চশমাটা একটা সাজ। তা না থাকলে কবি কিসের?

"আপনার কথা," ত্রিভঙ্গ বলল, 'আমি এত শুনেছি যে প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। সেদিন পুরস্কার বিতরণী সভায় যেতে পারিনি বলে আফসোস হয়। ঠিক সেইদিন আমাকে বেনারসে মালবীয়জীর সঙ্গে মোলাকাৎ করতে হয়েছিল। শুনলুম, আপনার মতো প্রেসফুল মহিলা না কি মুঙ্গেরে নেই। তাই আমার মত কবির আকাঙ্ক্ষা জন্মাল একবার চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করতে।"

উজ্জয়িনী বিশ্বাস করল। মাথা নেড়ে 'না না বলতে চাইল বটে কিন্তু সেটা আন্তরিক নয়। কী মনে করে বলে বসল, "মীরা ব্যানার্জিকে চেনেন? জামালপুরের?"

ত্রিভঙ্গ কাকে না চেনে? তার কাজই হল তাই। যত বড় বড় লোক, তাঁরা যে বিষয়েই বড হোন—টাকায়, পদে বা নামে—সকলেই সপরিবারে ত্রিভঙ্গের চেনা। মিথ্যা নয়। বাস্তবিক ত্রিভঙ্গ তাঁদের বাড়ী এক বার যায়, দু বার যায়, তিন বার যায়, এঁর কাছে ওঁর নাম করে, ওঁর কাছে এঁর নাম করে, অবশেষে পাত্তা পায়। তারপর মাঝে মাঝে গিয়ে কিছু একটা উপহার রেখে আসে। কোনো মৎলব নেই কিছু চাইবার, সে শুধু দর্শনপ্রার্থী। কাজেই কোনো বডলোক তাকে নিরাশ করেন না। সে যে কবি। সে যে কবিতায় তাঁদের গুণগান করবে বলে ভরসা হয়। ত্রিভঙ্গের আলাপ জমাবার কৌশলও অসামান্য। প্রথমে সে খোঁজ নেয় বাড়ীতে ছেলেমেয়ে আছে কি না। খোকাখুকুকে সে যে কী মন্ত্রে ভোলায় তা সে-ই জানে। তাদের সঙ্গে যেন তার কতকালের আলাপ। "কী ভাই, তোমার সেই লাট্টু দেখছি নে কেন!" প্রথম সাক্ষাতে এই। "ওঃ, তোমার লাট্টু নেই একেবারে? কী দুঃখ! কাল তোমার জন্য একটা লাট্টু আনছি, রোসো।"

"মীরা ব্যানার্জিকে চিনিনে?" ত্রিভঙ্গ রহস্যময় হাসি হাসল। "আপনার কাছে মীরা ব্যানার্জি। আমার কাছে সেই ছাপরার মীরা চ্যাটার্জি। বিয়ের আগের।"

"আমার শ্বশুর বলেন আন্‌কমন্‌লি গ্রেসফুল।"

"কে? মীরা ব্যানার্জি!" ত্রিভঙ্গ নিশ্চিত হয়ে বলল, "হাসালেন

"কেন?"

"আপনারা তো কবি নন। আমাদের কবিদৃষ্টিতে মীরাকে দেখায় যেন একটি বড় রসগোল্লার উপর একটি ছোট রসগোল্লা।" উজ্জয়িনীকে হাসি চাপতে দেখে ত্রিভঙ্গ বলল, "মাফ করবেন।"

উজ্জয়িনীও পরের মুখে পরিচিতার নিন্দা শোনাটা সুরুচি বলে মনে করল না। নিজের উপর রাগ করল। রাগ করল ত্রিভঙ্গের 'পরেও। গম্ভীর ভাবে বলল, "আচ্ছা, ত্রিভঙ্গবাবু, আর কোনো কাজ আছে ?"

## ৪

ত্রিভঙ্গের যা কাজ তার নাম দশ জনকে বলতে পারা যে অমুক বড়লোক আমার বন্ধু, অমুকের সঙ্গে মিশেছি। সে কার্য সাধিত হয়েছিল। সে ভাবগ্রাহী। বুঝতে পারল আজ আর বেশি অন্তরঙ্গতা হবে না। চটপট উঠে দাঁড়াল। একখানা কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "অবসর সময়ে যদি দয়া করে পড়েন।" তারপর বিদায় নিল।

বাংলা কবিতা, রীতিমত মল্লযুদ্ধ। "কবিতীর্থ উজ্জয়িনী।"

সবচিন্ কবি ত্রিভঙ্গমুরারি মিশ্র, তিনিও সত্যের খাতিরে জানিয়ে গেলেন, স্বার্থের খাতিরে নয়—যে, উজ্জয়িনীর চেয়ে গ্রেসফুল মহিলা মুঙ্গেরে নেই, এ কথা নাকি সকলে বলছে। অথচ বাড়ীতে শ্বশুরের মুখে অন্য কথা। কংস। তাঁর সৌন্দর্য্যবোধ থাকলে কি তিনি ডবল রসগোল্লাকে ভাবতেন আন্‌কমন্‌লি গ্রেসফুল! হা হা হা হা। ঐ ডবল রসগোল্লা কংসের বধূমাতা হলে আহ্লাদে বোধ করি ট্রিপ্‌ল রসগোল্লা হতেন।

কবিতাটি পড়ে উজ্জয়িনী সম্মোহিত হল। আহা, কবি বটে ত্রিভঙ্গমুরারি। লিখেছেন কালিদাসের উজ্জয়িনীর বর্ণনা, কিন্তু বর্ণে বর্ণে এই উজ্জয়িনীর ব্যঞ্জনা। শার্দ্দূল বিক্রীড়িত ছন্দ। বাংলা কবিতায় যে ওজসের অভাব ছিল, যা আনবার জন্যে পণ্ডিচেরীর কবিরা

কোমর বেঁধেছেন, সেই অপূর্ব্ব পদার্থ আছে ত্রিভঙ্গের সৃষ্টিতে। সৃষ্টি যদি কৃষ্টি না হল তবে আর কী হল! ওজসের আধার নয় তো ললিতলবঙ্গলতা!

একখানা চিঠি লিখে উজ্জয়িনী ত্রিভঙ্গকে ধন্যবাদ নিবেদন করল। ঠিকানা জানা ছিল না। চিঠিখানা তুলে রাখল, পরে পাঠাবে।

অনেকদিন যাবৎ সে আয়নায় মুখ দেখেনি, মানে, ভালো করে দেখেনি। সভাসমিতির জন্যে কাপড় বদলাবার সময় ওটুকু দেখা ধর্ত্তব্য নয়।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে উজ্জয়িনী আপনাকে অবলোকন করল। সে যেন অলক্ষিতে তার দিদিদের মতো হয়ে উঠেছে। তার চাউনিতে চটুল ভঙ্গী, তার চেহারায় চতুর ভাব। সে যেন দেহরহস্য সম্পূর্ণ বোঝে। সে কি সেই সরল অবোধ বালিকা আছে? সে নব-যৌবনী বালা। তনু তার কৃশতা পেয়েছে, তা বলে কঙ্কালসার নয়। তার রক্ত মলয়হিল্লোলের মতো তপ্ত। তার মাংস কিশলয়ের মতো কমনীয়। তার চরণপাত শিষ দিয়ে যাওয়া ছোট পাখীর হাওয়ার সঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে নামা-ওঠার মতো। এক কথায়, তার জীবনে নব বসন্ত অবতীর্ণ। সে গ্রেসফুল, অসামান্য গ্রেসফুল। তার এই রূপ যৌবন তার প্রিয়তমকে অর্পণ করার মতো।

"জনম কৃতারথ সুপুরুষ সঙ্গ
সেহে দিবস জোঁ নহি মন ভঙ্গ।"

উজ্জয়িনী গুনগুন করতে থাকে। ফুল্ল হয়ে বলে, "কানু, জগতে এসেছে বসন্ত, জীবনেও আমার তাই। বাইরে মাধব মাস, কুঞ্জেও মাধব।"

আমি সুন্দর, আমি অপরের চেয়ে সুন্দর। আমার এ

সৌন্দর্য আমার প্রিয়তমকে আনন্দ দেবে। তাঁর নয়নাভিরাম হবে। তাঁর রুচিকে পীড়ন করবে না, তাঁর বাহুতে ক্লেশ জাগাবে না। আমাকে গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে হবে না দুর্গ্রহ, আমাকে গ্রহণ করে তিনি গ্লানি বোধ করবেন না। আমি নই কুব্জা। আমি ব্রজগোপী।

ত্রিভঙ্গকে মনে মনে সে বহু সাধুবাদ দিল। ত্রিভঙ্গবাবু তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেলেন তার কর্ত্তব্য। সে আর প্রসাধন অবহেলা করবে না, সে তার রূপলাবণ্যের যত্ন নেবে। সে তো শুধু হাতে তার প্রেমিকের সম্মুখে দাঁড়াবে না। সে করবে দানের মত দান। সে যে অসামান্য প্রেসফুল। দেহ সম্বন্ধে তার যে লজ্জার সংস্কার, অশ্লীলতার সংস্কার, কেমন করে তা অন্তর্হিত হল। এ তো তার ভোগায়তন নয়, এ কৃষ্ণসুখাধার। এ তার নয়, এ তার সখার। তার কোনো কামনা নেই, সে নিষ্কাম। সে তার সখার কামনার উপচার।

বৈষ্ণব সজ্জন-সংসর্গ সে কিছু দিনের মতো ভুলল। পড়ে রইল তার নিজের প্রসাধনসাধনা নিয়ে। হল তার মুকুরবিম্বিত রূপানুরাগী। এক অননুভূতভূর্ব্ব পুলকে আকুল হল, উতলা হল। যাঁর তরে তার এ বাসকসজ্জা তিনি কেন পট থেকে পাটে আসেন না, পাশে বসেন না?

লজ্জা করে। ওঃ কী লজ্জা করে! লজ্জায় উজ্জয়িনী কারুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে না। ভাগবত খুলে পড়ে।

"শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎসরসিজোদরশ্রীমুষা দৃশা।

সুরতনাথ তেঽশুল্কদাসিকা বরদ নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ॥"

হে সুরতনাথ! হে বরদ! শরৎকালীন পদ্মের অভ্যন্তরের

শোভাহরণকারী তোমার চক্ষু। তোমার চক্ষু দিয়ে তুমি আমাদেরকে —তোমার বিনামূল্যের দাসীদেরকে—হত্যা করছ। সে কি বধ নয়?

পড়তে পড়তে উজ্জয়িনী স্থানকাল বিস্মৃত হয়। সে যেন দ্বাপর যুগের ব্রজপুরে বাস করছে। তার চতুর্দ্দিকে কুসুমিত বনরাজি, মত্ত ভৃঙ্গ ও বিহঙ্গকুল, সরোবর সরিৎ ও শৈল। গোপীগণের মধ্যে সেও অন্যতমা, তাদেরই মতো সেও রাত্রে বেণুর আহ্বানে গৃহত্যাগিনী হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হওয়ায় সেও তাঁর অন্বেষণ করে ব্যর্থ হয়ে তাঁর আগমন প্রার্থনা করছে।

"মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ।
বিধিকরীরিমা বীর মুহ্যতীরধরসীধুনাপ্যায়স্ব নঃ॥"

হে পদ্মনেত্র! হে বীর! তোমার জ্ঞানীজনের মনোজ্ঞ প্রিয় বাক্য ও মধুর ভাষণ আমাদেরকে মুগ্ধ করেছে। তোমার অধরসুধা দিয়ে আমাদেরকে আপ্যায়িত কর।

উজ্জয়িনী লজ্জায় বিব্রত বোধ করে। তবু সে কী আনন্দের লজ্জা! গোপীরা হয়তো তাদের স্বামীদের অধরসুধা পান করে ও বস্তুর মর্ম্ম জেনেছে। কিন্তু উজ্জয়িনীর এই প্রথম। তাই তার কামনা তীব্রতর। তেমনি তীব্রতর তার লজ্জা। গোপীদের লজ্জার তো আভাস পাওয়া যায় না। ওটা বোধ হয় ওরা স্বামীদের শয্যায় বর্জন করে এসেছে। আবার শেষরাত্রে ফিরে গিয়ে পরিধান করবে।

"সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্।"

হে বীর! তোমার সুরতবর্দ্ধন শোকনাশন অধরসুধা আমাদেরকে দাও। সে সুধাকে বাদিত বেণু সুন্দররূপে চুম্বন করে থাকে। সে সুধা মানুষকে অন্য কামনা ভুলিয়ে দেয়।

উজ্জয়িনীর আর কোনো সাধ নেই। সেই সুধাই তার কাম্য। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতে কি সহজে তার মুখ চায়! সে যদি একা হত তবে মুখ ফুটে স্বীকার করত না। সে এখন গোপীদের একজন। সকলে মিলে কথাটা বলছে। তাই ওটা কথনীয় হয়েছে। নইলে কী লজ্জা!

আরো কতক্ষণ ভাগবতপাঠের পর উজ্জয়িনীর প্রত্যয় হল যে সে মুঙ্গেরে নেই। আছে বৃন্দাবনে। সে কখন ঘুমিয়ে পড়ল ও স্বপ্ন দেখল যা তার মন চায়।

## ৫

নাকে ও কপালে তিলক, বাঁ কাঁধে প্রকাণ্ড পোঁটলা ও বাঁ হাতে ঝুলন্ত ঘটি, ডান হাতে মালাঝুলি, পরনে থান কাপড়ের উপর নামাবলী, ঘন কেশ চূড়ার মতো করে সামনের দিকে বাঁধা। ইনিই বৃন্দা দাসী, উজ্জয়িনীর মাতাজী মাসি। আখড়া বিশেষ কোনোখানে নয়, সর্ব্বত্র পাতানো বোনঝি ভাইঝি আছে, দু মাস কলকাতায়, এক মাস পাটনায়, পনের দিন নদীয়ায়, সাত দিন কালনায়—এমনি করে বছর ঘুরে যায়। কেউ জানে না ওর আপন দেশ কোথায়, আপনার লোক কেউ আছে কি না। জিজ্ঞাসা করলে বলে, দেশ বৃন্দাবন, আত্মীয় যুগলকিশোর।

মাতাজী কোনো বাড়ীর সদর দরজার দিকে ঘেঁষে না, খিড়কি খুঁজে বার করে। হাতার ভিতর এক কোণ দিয়ে ঢুকে দেখল গোয়ালার ছেলে গাই চরাচ্ছে। রায় বাহাদুরের সঙ্গে স্থানীয় গোয়ালার এই বন্দোবস্ত হয়েছে যে গোরু খাবে বিনা

পয়সায় রায় বহাদুরের ঘাস আর রায় বাহাদুর খাবেন সস্তাদামে গোরুর দুধ। গোয়ালার ক্ষুদ্রকায় বাছুরটিকে মাতাজী হাতছানি দিয়ে ডাকল, "বাছা!"

সে কি সামান্য লোক। বড় হাকিমেব প্রিয় গোরুর রাখাল। "তু কৌন্ হায় বে?" বলে তাড়া করে গেল।

"ওমা! মারবে নাকি!" মাতাজী কৃত্রিম ভয়ের ভাব দেখিয়ে ব্যঙ্গের ভঙ্গীতে বলল, 'মিন্সের তেজ দেখ। তোব মতো কত মরদ দেখেছি। ঠোনা মেরে তুলো ধোনা করে দেব।" কৌতুকের চোখে মঙ্গলুর দিকে তাকিয়ে সুধাল, "তোর নাম কী?"

"এ মামু। মামু হো!" ছোঁড়া গলা ফাটিয়ে হাঁক ছাড়ল, উত্তর দিল না।

"ওমা কী আপদ। চিল্লাচ্ছিস কেন। হাম বাঘ নেই, ভালুক নেই, কুত্তা নেই। মামুকো ডাকতা কেন?" ফিস ফিস করে বলল, "খাজা খাবি?"

ছেলেটা অবুঝের মতো দ্বিগুণ চিৎকার ছাড়ল, "হো মামু!" ওদিক থেকে মামুও রাগত ভাবে জবাব দিল, "আরে ক্যা ভইল রে মঙ্গলুআ?"

"ছোট সাপের বড় বিষ।" মাতাজী কিছুতেই ছোঁড়াকে হাত না করতে পেরে বুদ্ধি খাটিয়ে বলল, "শোন মঙ্গলচাঁদ," একটা গাইকে দেখিয়ে, "ও কয় সের দুধ দেতা।"

ফল হল। রাখাল দিব্য আলাপ জুড়ে দিল। কিন্তু অত বড় আওয়াজ ব্যর্থ যায় না। মামু এসে পৌঁছে গেলেন।

সমবয়সীদের কাছে মাতাজীর অন্য চাল। হাবভাবে কিছু 'ইটু' সঞ্চার হয়। তখন তাকে দেখে কে বুঝবে যে তার বয়স

চল্লিশের উর্দ্ধে। "গয়লার পো," মাতাজী মাথার কাপড়টা টেনে দিয়ে নিজেকে দুষ্প্রাপ্য করে মিহি স্বরে বলল, "গয়লার পো, আমার বেহাই বাড়ী আছেন কি না বলতে পার?"

গোপনন্দন গোঁফে হাত বুলিয়ে গম্ভীর ঘোষে বলল, "কৌন বেহাই হৈ?"

মাতাজি কাপডটা মুখের উপর টেনে কটাক্ষপাত করে বলল, "গয়লার পো, তাও জান না? হাকিমের ছেলে যে আমার মেয়েকে বিয়ে করেছে।"

"ই পাগলী হৈ।" মামু ভাতিজাকে বলল, "তু পাহারাবালা বোলাও।"

মঙ্গলু দৌড় দিল। মাতাজী বলল, "দূর হাবা! সত্যি কি আমার বেহাই? মেয়ে আমাকে মাসি বলে ডাকে। পাটনায় ছিল যখন," ভ্রূভঙ্গী পূর্ব্বক, "তখন থেকে। আমি পাটনা থেকে আসছি কি না।"

অলগু গোয়ালা খুব বেশী অবিশ্বাস করল না। সে শুনেছিল হাকিমের বহু বৈষ্ণব বৈষ্ণবীদের আস্কারা দেয়। দীনু বৈরাগীকেও বহুজী আনিয়েছিলেন বলেও সে শুনেছিল। কে জানে বাবা বড় লোকদের রীতি! হাকিম ত মুরগীও খান।

"ক্যা জানে তুম ক্যা লগতা হৈ—মাসি কি পিসি। যাও, উদিকে যাবেন। বহুজী অন্দর রহতী! ওহি দরবাজাসে যাবেন।"

পাহারওয়ালা আসতে আসতে মাতাজী অন্দরে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

"রাধে!" মৃদু স্বরে, বেহাই পাছে শুনতে পান।

"কৃষ্ণ।" আর একটু উচ্চ স্বরে।

উজ্জয়িনীর খাস দাসী পারবতীয়া কাচা কাপড় শুকাতে দিচ্ছিল। মাতাজীর গলা শুনে চিনতে পারল। উঁকি মেরে দেখল আর কেউ

নয়। এ সেই পাটনার মাতাজী। পারবতীয়া হর্ষধ্বনি করে উঠল। ছুটে এসে পা ছুঁয়ে একটা প্রণাম ঠুকে দিয়ে একটুখানি কাঁদল। নীরব কান্না নয়, নীরব কান্না কি ওর শ্রেণীর মেয়েরা জানে ?

"কি হয়েছে রে পার্ব্বতী ?" উজ্জয়িনী ত্রস্ত হয়ে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু করতে না করতেই দেখতে পেল সাক্ষাৎ মাতাজী মাসি। কাজেই উত্তরের অপেক্ষা না করে এগিয়ে গিয়ে মাসির আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ল।

"অ পোড়ার মুখি পারবতীয়া, খোল দেখি আমার পোঁটলা। আমার মেয়ের জন্য প্রসাদ এনেছি, গোবিন্দজীর প্রসাদ, গোপালজীর প্রসাদ, শাঁওলধারীলালের প্রসাদ—"

পারবতীয়া আর এক দফা হর্ষধ্বনি করে উঠল। সে আর কেউ নয় নাথুনীর বিধবা বোন, বয়স বছর ত্রিশ, পরিমাণে অতিরিক্ত হাসে ও কাঁদে। নাথুনী যেমন ভারিক্কি, যেমন দায়িত্বভার-পীড়িত উচ্চাঙ্গের ভৃত্য, পারবতীয়া তেমনি হালকা, তেমনি মুরুব্বিয়ানাবর্জ্জিত নিরীহ পরিচারিকা। বহরমপুর থেকে যে দাসীটি সঙ্গে এসেছিল তার দেশের জন্য মন কেমন করায় সে স্বেচ্ছায় বিদায় নিল। সেই সময় থেকে পারবতীয়াকে ঘষে মেজে পালিশ করে তার স্থলে উন্নীত করা হয়েছে। আসল কথা বহরমপুরের দাসীটি ছিল খ্রীস্টান। তার পোষাল না, যদিও উজ্জয়িনী তার উপর অন্যায় দাবী করেনি।

"ও মা," মাতাজী উজ্জয়িনীর রূপাবলোকন করে পুলকিত হয়ে বলল, "কী সুন্দর হয়ে উঠেছিস তুই ! দেখে দু চোখ জুড়িয়ে যায় !"

উজ্জয়িনী লজ্জায় দু চোখ বুজল। চোখ বুজলে কি হয়, তার মুখের পর যে মাসিমার ও পারবতীয়ার দৃষ্টি খেলা করছিল তা সে বেশ বুঝতে পারছিল। যাতে তাকে সুন্দর দেখায় সে জন্যে তার

প্রকৃতি ছিল সক্রিয়। তার প্রকৃতির এই প্রয়াসে তার চেতনার ছিল প্রশ্রয়। তাই সে উঠছিল রক্তিম হয়ে।

"এই নে, সেবন কর। এ হল গোবিন্দজীর, আর এ হল শাঁওলিয়ার। বীণারা তোকে এক টুকরা চিঠি লিখে দিয়েছিল, কোথায় রেখেছি, খুঁজি। বীণার নাকি হবে।" এ কথা বলে মাসি একটি বিশেষ অর্থসূচক চাহনির অনুপান দিল।

"তাই নাকি? হবে!" উজ্জয়িনীও উৎসাহ প্রকাশ করল। কৌতুকের হাসি ঠিকরে পড়ছিল তার অধর থেকে। "শেষকালে বীণারও?"

পারবতীয়াকে ঐ প্রসঙ্গে যোগ দিতে দেখা গেল। অমন প্রসঙ্গের আলোচনায় মেয়েদের মধ্যে উচ্চ-নীচ নেই। ও যে তাদের সাধারণ ভাগ্য, সাধারণ ভাবনা।

"বীণার শাশুড়ী বলেছেন তোর জন্যে তাঁর ভারি মন কেমন করে। তুই তাঁকে চিঠি লিখিস না কেন? আর সেই যে নবীনের মা, সেও তোর কথা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করত। মনোরমাও জানতে চায় তোর বিষয়। আরো কত লোক তোকে মনে রেখেছে, জয়ি। পাটনায় যে তোকে এত লোক ভালবাসত আমিই কি তা আগে জানতুম!"

উজ্জয়িনীও কি আজো জানে! সে তো কোথাও যেত না, কারুর সাথে সেধে আলাপও করত না। তবে প্রতিবেশিনীদের মধ্যে যারা তাকে দেখতে আসত তাদের সবাইকে সে বসতে বলত, ধৈর্য ধরে তাদের জেরার জবাব দিত ও হিতোপদেশ শুনত। শুধুমাত্র এই গুণে তাদের প্রিয় হবার ভরসা ছিল না তার। তারা যে তাকে স্মরণ রেখেছে এই আশ্চর্য।

"কই, রাধামুরলীমনোহর কোথায়। যাই, প্রণাম করে আসি। ওরে পার্ব্বতী, এক ঘটি জল এনে দিতে পারিস? হাত, পা ধুতে হবে।"

উজ্জয়িনী মাসির পায়ে পড়ে বলল, "ভুলে গেছলুম তোমাকে প্রণাম করতে।"

"রাধেকৃষ্ণ, রাধেকৃষ্ণ।" মাতাজী কৃত্রিম ব্যস্ততাভরে বলল, "আমাকে কেন? আমি ক্ষুদ্র জীব। থাক, থাক। হয়েছে। হয়েছে। হা হা হা হা। পাগলী। কৃষ্ণে মতি থাকুক, কৃষ্ণে রতি জন্মাক।"

মাতাজি মাসির পোঁটলার আকর্ষণ উজ্জয়িনীকে কতক পরিমাণে বিমনা করেছিল। সেটা যেন কাবুলিওয়ালার থলে আর সে যেন ছোট্ট মেয়ে মিনি।

যেই মাসি অদর্শন হয়েছে অমনি বোনঝি সেই পোঁটলা খুলে তন্ন তন্ন করল। পাওয়া গেল তার ভিতরে ঠাকুর দেবতার প্রসাদী ফুল তুলসী, যমুনা পুলিনের রজ, শ্রীগুরুর চরণামৃত, গৌর নিতাইয়ের পট,—কোনোটা কৌটায় কোনোটা শিশিতে কোনোটা কাগজে মোড়া। অলকা তিলকার সরঞ্জাম, আয়না চিরুণি, মাথা ঘসা, পান জর্দ্দা, হোমিওপ্যাথীর ওষুধ, চশমা। থানকয়েক কাচা কাপড় ও গামছা ছিল আর ছিল একখানা আসন ও একটা সতরঞ্জি; দুখানা বই দেখে উজ্জয়িনী ক্ষুধার্ত্ত পশুর মত বিনা দ্বিধায় আত্মসাৎ করল।

"ওমা, তুই ওখানে! খুলেছিস!" মাতাজী গালে হাত রেখে বিস্ময়বিমূঢ় হল। তারপর হেসে উঠল। "কী দেখছিস? গরীব মাসির দেখবার মতো কী আছে ধন রতন? ঐ যে শিশিতে শ্রীগুরুর চরণামৃত রয়েছে ঐ আমার ইহকালের সম্বল। এক গেলাস জলে এক ফোঁটা মিশিয়ে খাই। খাবি তুই এক ফোঁটা?"

উজ্জয়িনী জুগুপ্সায় কণ্টকিত হল। বিবমিষা দমন করে বলল,

"সে হবে পরে। এস মামি তোমাকে বাগানে নিয়ে যাই। মালা গাঁথতে হবে সেবার যেমন করে গেঁথেছিলে ঠিক তেমনি করে।"

মালা গাঁথার শিল্প মাতাজী জানে ভালো। উজ্জয়িনী কিছুতেই অমন পারে না। তার একটা আফসোস এই যে তার দেবতাকে সে মনের মতো মালা গেঁথে পরাতে পারে না। তাদের মালীটা অপদার্থ! মালী, অথচ মালা গাঁথতে শেখেনি। শিখেছে গাছের পাতা ছাঁটতে, আগাছা কাটতে, জল দিতে, ক্ষেত তৈরি করতে।

এমনি করে গুরুজীর পদামৃত সেবনের সঙ্কট তখনকার মতো এড়ানো গেল। কিন্তু মাতাজি কী ছাড়ে! ওই হল তার মৌতাত। মৌতাতের সময় এলে লোকে সাথী খোঁজে। মাতাজী ডেকে বলল, "জয়ি, খাবি বলছিলি, আয়। জয় জয় শ্রীগুরু প্রেম কল্পতরু।"

কে জানে কার পা ধোয়া জল। ময়লা পা। ওই পা দিয়ে কত রাজ্যের বিষ্ঠা ও নিষ্ঠীবন মাড়িয়েছে। ওয়াক! কে জানে কী রোগের বীজাণু ওতে রক্ষিত ও বর্দ্ধিত। এক ফোঁটা খেলেই অমনি থাইসিস কি হুকওয়ার্ম কি কলেরা কি ক্যানসার। উঃ! কত রকম রোগ আছে। নামগুলা কী বিদ্‌ঘুটে। নামই যখন এত বিদঘুটে রূপ না জানি কত। উজ্জয়িনী কাঁপতে কাঁপতে বলল, "না, মাসিমা, আমি খাব না।"

"খাবি না!" মাতাজী বিরক্ত হয়ে বলল, "খাবি না কী রকম! তখন যে বললি খাবি। কেন খাবি না শুনি? শ্রীগুরু। শ্রীগুরু। গুরুই কৃষ্ণ। কৃষ্ণই গুরু। ভিন্ন জ্ঞান করলে নরকেও ঠাঁই হবে না। আবার ফিরে আসতে হবে ভব সংসারে। আবার মায়ের পেটে দশ মাস ঘোর যন্ত্রণা। না থাকবে চোখ না থাকবে কান না পারবি একটা কথা বলতে। সেই অন্ধকারে আঁকুপাঁকু করতে থাকবি। উঃ,

কী কষ্ট!" মাতাজী বার বার মাথা নাড়ল। "আমি তো আর ফিরে আসছি না।"

উজ্জয়িনীও ভয় পেয়ে গেছল। তবে কি-না সে নেহাৎ যোগানন্দের দুহিতা। জিজ্ঞাসা করল, "তা হলে ভগবান কেন এতবার অবতার হয়ে কষ্ট পান?"

মাতাজি একফোঁটা চরণামৃত টুপ করে ঢেলে শিশিতে ছিপি এঁটে দিল। গ্লাসটাকে ঝাঁকিয়ে মুখে তুলে চোখ বুজল। আগে ধ্যান করল গুরুকে, তারপর ঢক ঢক ঢক।

"কী বলছিলি?" স্মরণ করে, "হাঁ। অবতার হয়ে কেন কষ্ট পান? কে বলল কষ্ট পান? কোন গ্রন্থে লিখেছে কষ্ট পান? না, ভগবানের আবার কষ্ট কী? তিনি ইচ্ছাময়। কষ্ট জীবের। ওঃ, সে কী কষ্ট। আমি আর জন্মাতে চাইনে। জন্মালেই মরতে হয়। সে তো আরো কষ্ট। ভেবে দেখ্, তোর সোনার শরীর আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তোর এমন রূপ—আহা চোখ জুড়িয়ে যায়— সেই রূপ গিয়ে ঠেকবে খান কয় হাড়ে।"

উজ্জয়িনীর কান্না পেতে লাগল।

"নে, এটুকু শেষ করে ফেল। পরকালের সম্বল।"

এবার উজ্জয়িনী আর আপত্তি করল না। খেলেই বা কী আর না খেলেই বা কী! পরিণাম তো এক রাশ ছাই আর খান কয় হাড়। যা নিয়ে শেয়াল কুকুর টানাটানি করবে।

চোখের জলের সঙ্গে মিশিয়ে কোন এক অচেনা মানুষের পা ধোয়া জল, তাও মাতাজী মাসির উচ্ছিষ্ট, ক্যাপ্টেন ওয়াই গুপ্তের কন্যা গলাধঃকরণ করল। করেই হঠাৎ উঠে দৌড় দিল। সমস্তটা উদ্গীরণ করেও তার বোধ হতে লাগল সে মরে যাবে। নিশ্চয় তার পেটে

ব্যাসিলি ঢুকেছে। ইতিমধ্যে রক্তের সামিল হয়ে গেছে। এই তাদের ক্রিয়া আরম্ভ হল বুঝি। এই যে, মাথা ভার মালুম হচ্ছে। এই যে গা শির শির করছে।

উজ্জয়িনী তার শ্রীকৃষ্ণের সুমুখে দাঁড়িয়ে হাত যোড় করল। জল ঝরছিল তার চোখ থেকে। মনে মনে বলল, "আমি মরতে চাইনে কানু। আমি চাই বাঁচতে। আমি চাই এই জীবনে তোমাকে পেতে। আমি চাই এই রূপ যৌবন নিয়ে তোমার ভোগে লাগতে। কানু, আমি বাঁচব তো? নীরোগ হব তো? কানু, ও কানু, তুমি শুনতে পাচ্ছ তো?"

দুর্জ্জয় বিবমিষা সেরাত্রে উজ্জয়িনীকে জাগিয়ে রাখল। সে যে কত বার বমি করল তার আর সংখ্যা হয় না। তার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে মাতাজী কতবার তাকে ডাকল। সে সাড়া দিল না। মাতাজি যে কী খাবে কোথায় শোবে অতিথির প্রতি যে একটা কর্ত্তব্য আছে উজ্জয়িনী আদপেই তো ভাবল না। আগে প্রাণে বাঁচুক নিজে।

স্বপ্ন দেখল স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাকে বলছেন, সে যে আমার চরণোদক নয় তাই বা কেমন করে তুমি জানলে! যদি আমিই হয়ে থাকি বৃন্দা দাসীর গুরু তবে কি তোমার এই ব্যবহার সঙ্গত? তোমার বাহির এত সুন্দর তোমার ভিতর কেন এত ভীরু? মরণ যদি ও জিনিস খেলে হত তবে বৃন্দা দাসী কি বেঁচে থাকত?

[illegible] উজ্জয়িনীর ঘুম ভাঙল। গুরু আর কৃষ্ণ কদাচ ভিন্ন নয়। এ কথা সে বার বার পড়েছে। তবু তার সংস্কার মানে না। গুরুর চরণবারি কি বিষ্ণুপদপ্রক্ষালনকারিণী জাহ্নবী নয়? বিশ্বাস যারা করে না, যারা নাস্তিক, তারা তো গঙ্গার জলকেও ফুটিয়ে ফিল্টার

করে খায়। সেই সব মূঢ়ও কি মরে না? মরে তারাও, উপরন্তু নরকে যায়।

উজ্জয়িনী মাসির প্রতি অতিরিক্ত অভিনিবেশ দ্বারা গতরাত্রের ক্ষতিপূরণ করল। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলল, "মাসি, তোমার সেই চরণামৃত আর আছে? দিতে পার একটু?"

মাসির রাগটা জুড়িয়ে জল হয়ে গেল, পা ধোওয়া জল।

উজ্জয়িনী এমন উৎসাহের সঙ্গে খেল যে তার ভাব দেখে মাতাজীরও উৎসাহ জাত হল। বলল, "এ কি সহজে পাবার জো আছে রে, মা! আমার যিনি গুরু তিনি বছরে একটি দিন দেখা দেন। সারা বছর তীর্থে তীর্থে বেড়ান, কেবল দোলের দিন শ্রীবৃন্দাবনে আবির্ভাব হন। এ বার তো যাওয়া হল না আমার। এ হচ্ছে ও বছরের। একটা বড় বোতল এনেছিলুম। তার থেকে মোটে এইটুকু বাকি। তোকে আমার মেয়ের মতো ভালোবাসি বলে দিলুম। নইলে এ অমূল্য নিধি কি প্রাণ ধরে কাউকে দিতে পারি, বাছা!"

৬

উজ্জয়িনীর মন চলে গেছল শ্রীবৃন্দাবনে।

আহা! এ জীবনে কি হবে সেখানে যাওয়া! সে কি এত পুণ্য করেছে! সে যেন সেই সকল গোপবধূর এক জন যারা স্বামী-আদিজনের বাধা পেয়ে রাসনৃত্যে মিলিত হতে পারল না বলে শরীর ত্যাগ করল, মিলিত হল তার পরে।

"আচ্ছা মাসি! যারা আমার মত অভাগিনী, যারা বৃন্দাবন যেতে

পারবে না, তাদের কি কোনো আশা নেই? তারা কি এ জন্মে শ্রীকৃষ্ণকে পাবে না, পুনশ্চ জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য হবে?"

"না, না।" মাতাজী ভরসা দিয়ে বলল, "তা কেন! কোন গ্রন্থে লিখেছে অমন কথা? মনে করলে এই তো বৃন্দাবন। এইখানেই তো নিত্য লীলা। এক মনে চিন্তা করলে এই ঘরেই তুই ব্রজপুর প্রত্যক্ষ করতে পাবি। তুলসী-পরিক্রমা কর, সেই হবে তোর ব্রজ-পরিক্রমা। বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তা তো শাস্তরেই বলেছে। তিনি যদি দূরে থাকতেন তবে কি বৃন্দাবনে গিয়েও কেউ তাঁকে দেখতে পেত? দূর হচ্ছে সবখান থেকে দূব। নিকট হচ্ছে সবখান থেকে নিকট।" উজ্জয়িনী বিশ্বাস করছে না অনুমান কবে মাতাজী জুড়ে দিল, "আমার গুরুদেব স্বয়ং একথা বলেছেন, বিশ্বাস কর আর নাই কর।"

উজ্জয়িনী মুখ ফুটে বলল, "কবি।"

"তা যদি না হত, "মাতাজি মিষ্ট হেসে বলল, "তবে গুরুদেব কেন বছরের বেশির ভাগ বৃন্দাবনের বাইরে কাটান? আসল কথা কি জানিস?" ভ্রূভঙ্গীপূর্ব্বক, "ভক্তি।"

"যা বলেছ।" উজ্জয়িনী আশ্বস্ত হয়ে বলল।

"ভক্তের ভগবান। যে তাঁকে যে ভাবে ডাকে, যে খানে ডাকে, যে রূপে ডাকে তাকে তিনি অবিকল সেই রূপে সেই ভাবে সেই খানে দেখা দেন। সেই যে গজহস্তী তাঁকে ডেকে বিপদ থেকে উদ্ধার হয়েছিল—"

উজ্জয়িনীর অস্পষ্ট মনে পড়ছিল কোথায় পড়েছে। বলল, "যথার্থ।"

"মনটাকে শক্ত কর জযি। মেয়েমানুষের অশেষ বন্ধন। স্বামীপুত্র ফেলে ক'জন পারে বৃন্দাবন যেতে? আর কেনই বা যাবে?

নারীর বন্ধনই তো বৃন্দাবন।" উজ্জয়িনীর চোখে অবিশ্বাসের আভাস লক্ষ্য করে, "এসব আমার গুরুজীর বচন।"

"তবে," উজ্জয়িনী সাহস ভরে বলে ফেলল, "তুমি কেন—"

মাতাজী সুবিজ্ঞ জন। বিজ্ঞ জনের পক্ষে একটা ইঙ্গিতই যথেষ্ট। মাতাজী গম্ভীরভাবে কী ভাবল। কিছু একটা বলবে, তারই উদ্যোগ। উজ্জয়িনী মাসির জপমালা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকল। তারও একটি জপমালা চাই। কিন্তু কী মন্ত্র জপতে হবে তাই স্থির হোক আগে। গুরু লাভ হোক।

"তুই মনে করেছিস," মাতাজী গাম্ভীর্য রক্ষা করে বলল, "আমি স্বেচ্ছায় বন্ধন কাটিয়েছি?" মাথা নেড়ে, "তা নয়। আমাকে ডাক দিয়েছে। দিন রাত, দিন রাত।" তার চোখে জল এল। "আমার সর্বনাশ করল।" তার গলা ধরে এল।

উজ্জয়িনী বিশ্বাস করতে পারছিল না চেষ্টা সত্ত্বেও। মাসি তা আন্দাজ করে বলল, "কে বিশ্বাস করবে, গুরু ছাড়া? তিনিই একমাত্র মানুষ," জিভ কেটে, "মানুষ তো নন দেবতা! তিনি বিশ্বাস করলেন। সেই জন্যে তো তিনি আমার গুরু, আমি তাঁর দাসী।"

"আমিও বিশ্বাস করি," উজ্জয়িনী বলল গায়ের জোরে।

তখন মাতাজী ধীরে ধীরে বিবৃত করল তার জীবনের ইতিহাস। উজ্জয়িনী ধীরে ধীরে মালা গড়াতে থাকল কলের মতো।

তার ঠাকুরমার ছিল মদনমোহন বিগ্রহ। কুমারীবয়সে তার নিত্য কাজ ছিল মদনমোহনের জন্যে ফুল তোলা, মালা গাঁথা। সমস্ত মন দিয়ে সে মদনমোহনের সেবা করত দেখে ঠাকুরমা বলতেন "আমি আর ক'দিন! যাবার সময় মদনমোহনকে তোরই হাতে

ফিরে যাব।" সে একথা শুনে ভাবত মদনমোহন একদিন তার সম্পত্তি হবে। তাই সম্পত্তির মতো তাঁকে পাহারা দিত, সহজে চোখের আড়াল করত না। তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে কত কল্পনা ছিল তার মনে। তার যাবতীয় ভাবনা ছিল ঐ দুর্লভ সম্পত্তিকে ঘিরে। যদি চোরে নিয়ে যায়, যদি আগুনে যায় পুড়ে! তার সমবয়সীদেরকে সে কি কম সন্দেহ করত! ঠাওরাত তারা সবাই সুযোগ খুঁজছে মদনমোহনকে সরাবার।

ঠাকুরমা মরবার নাম করে না, যদিও বয়স হয়েছে মরণের। ওদিকে তারও হল বিয়ের বয়স! যম তবু দুদিন সবুর করে, প্রজাপতি তাও করে না। ভালো বর পাওয়া গেল, তবে তাদের নিবাস বেশ কিছু দূরে। মদনমোহনকে ফেলে যেতে হল, নিরুপায়। কিন্তু ফেলে যাবার দরুন তার মনের শান্তি গেল হারিয়ে। শঙ্কায় তার ঘুম হয় না। ঠাকুরমার দৃক্‌শক্তি ক্ষীণ। কখন কে হাতসাফাই দেখিয়ে দেবে। তারপর সেই প্রাণের ঠাকুরকে তল্লাস করে উদ্ধার করা যাবে না।

স্বামীটি বড় ভালো। স্ত্রীলোকের যেন অমনি স্বামীই হয়। সে তাঁকে ভক্তি করত অন্তরের সহিত। আর তিনিও করতেন তাকে একান্ত স্নেহ। জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি অত বিমর্ষ কেন? বল আমাকে খুলে। কোনো অসুবিধা হচ্ছে?" সে খুলে বলল। তিনি হেসে বললেন, "এই কথা! কিসের তৈরি মদনমোহন তোমার ঠাকুরমার কাছে পাবে?"—অষ্ট ধাতুর।

তিনি কয়েকদিন পরে আনিয়ে দিলেন সোনার মদনমোহন। কিন্তু তাতে কী হবে? সে তো ওই মদনমোহন নয়। ওর চেয়ে দামী হলে কি ওই জিনিস হয়? পরের ছেলে যতই গুণের হোক পেটের

ছেলের সাথে তুলনা? হরি, হরি! পুরুষ মানুষের কবে বুদ্ধিশুদ্ধি হবে!

স্বামীর সন্তোষের জন্যে নকল মদনমোহনের সেবা পরিপাটিরূপে করল। কিন্তু ভাবনা একরত্তিও কমল না। সারারাত দুঃস্বপ্ন।

"তোমাকে এখনো বিমনা দেখি যে? আমাকে সত্য করে বল তোমার কী দুঃখ।"

"ওই মদনমোহনকে চাই।"

স্বামী একদিন গেলেন শ্বশুরবাড়ী, একাকী। ঠাকুরমাকে অনুরোধ করলেন তাঁর বাড়ীতে এসে থাকতে, বিগ্রহ সমেত। বুড়ী বলল, "মরতে হয় শ্বশুরের ভিটাতেই মরব। আমাকে এই বয়সে আর নড়তে বলিসনে।"

তখন স্বামী ফিরে এসে বললেন, "তুমিই তা'হলে ওখানে গিয়ে থাক।"

সে লজ্জিত হয়ে বলল, "তা কি হয়। ছি!" স্বামীকে ছাড়তে কি কেউ চায়? তারপর শ্বশুর-শাশুড়ীই বা যেতে দেবেন কেন?

কয়েকমাস পরে তার একটি খোকা হল। খোকাকে পেয়ে বছরখানেক সে মদনমোহনকে এক রকম ভুলেই ছিল। মাঝে মাঝে মনটা কেমন করে উঠত। কিন্তু সময় কোথায় দুদণ্ড আনমনা হবার? খোকন কি মাকে এক মুহূর্ত্ত ছুটি দিতে চায়? বড় কড়া হাকিম। এই যেমন উজ্জয়িনীর শ্বশুর।

খোকন যেই হাঁটতে শিখল অমনি স্বাধীনতা ঘোষণা করল। কে তাকে ধরে রাখতে পারে! বায়ুর মতো স্বেচ্ছাগতি। একদিন এই ছেলে বড় হয়ে উঠবে। তখন কি সে তার মা'কে আমল দেবে? ফিরে চাইবে তার মা'র দিকে? পাখীর ছানা, ডানা গজালে মানে মানা?

এখন আবার মদনমোহনের ভাবনা তার চিত্ত জুড়ল। সেই তো সম্পত্তি। ছেলেকে তো সম্পত্তি বলা যেতে পারে না। প্রাণ চায় সম্পত্তি।

স্বামী টের পেলেন। "কি গো, খোকনের মা! আবার যে তুমি বিরস? ছেলে পছন্দ হয় নি?"

সে এবার কি উত্তর দেবে? খুলে বলতে কি পারে ও কথা? বললে কি স্বামী বুঝবেন? পাগল বলে হেসে উড়িয়ে দেবেন না?

যাক, আর একটি খোকা হল। খুকী হলে বোধ হয় সে আরো খুশি হত। তাতে কী! সন্তানমাত্রেই প্রিয়। কোনটি কোনটির চেয়ে কম?

এবারও কিছুকাল গেল ছোট্কাকে কোলে বেঁধে। বড় সুন্দর ছেলেটি। সকলে বলল সুলক্ষণবন্ত। তার সমাদর লক্ষ্য করে তার দাদার সে কী অভিমান! কিন্তু সেও কি কম গুণবান! সকলে বলত সে বিদ্বান হবে। আমরা ব্যাপারী মানুষ। আমাদের বংশে বিদ্যার চর্চ্চা সামান্য।

তারপর ছোট ছেলেটির হল হাম। একটা দিনেই তার চাঁদের মতো মুখ রাহুর গ্রাসে বীভৎস হয়ে গেল। সেরে উঠল বই কি। হাম। বসন্ত নয়। দাগও মিলিয়ে গেল। তবে খুব দুর্ব্বল হয়ে গেছল, তাই নানারকম ছোট ছোট ব্যামোয় ভুগল কিছু দিন।

কিন্তু তার মায়ের প্রাণে যে আঁচড় লাগল তার দাগ তেমনি রইল। সে ভাবল, এই তো মানুষের রূপ। এর এত বিকৃতি! এত আকস্মিক এর রাহুগ্রস্ততা। রাহু এক বার ছেড়ে দিয়েছে, প্রতি বার কি ছাড়বে! এ ছেলে একদা অন্ধও হতে পারে, খঞ্জও হতে পারে, হতে পারে কুৎসিত কদাকার।

মদনমোহনের রূপ বহুগুণ হয়ে মনে পড়ল। আহা! কী রূপ! সে রূপ চিরকাল অক্ষয় অবিকৃত। সে রূপের উপর রাহুর ক্ষমতা খাটে না। তার নেই জরা, তার নেই বয়ঃ। সে হবে না রোগা কিম্বা মোটা, কানা কিম্বা খোঁড়া। তার চেহারা এখন যেমন আছে দশ বছর পরেও থাকবে ঠিক তেমনি। স্মৃতিকে বিকল করবে না। ব্যাকুল করবে না। কোনোদিন আফসোস করতে হবে না যে কী ছিল কী হয়েছে।

"তারপর ?" সুধাল উজ্জয়িনী।

"তারপর আর কী ?" পালটা সুধাল মাসি। "ওকথা কি স্বামীকে বলতে পারা যায় ? তুই পারিস তোর স্বামীকে বলতে ?"

উজ্জয়িনী লজ্জায় অভিমানে ও বিতৃষ্ণায় নীরব রইল। তার আবার স্বামী। কানু ছাড়া আর কারুর চিন্তা তার পক্ষে অস্বস্তিকর।

মাতাজী বলে যেতে লাগল, "আগে আমার ভাবনা ছিল মদনমোহনের কী হবে। এবার ভাবনা হল আমার কী হবে। মদনমোহন বিনা আমার বেঁচে সুখ নেই। কিন্তু বুড়ী কি মরতে চায় কিছুতে ? কত রকম রোগে ভুগল, আমার বাবাকে মাকে ভোগাল। আমি বার দুই তিন গেলুম তাকে মরণকালে দেখতে। কোনোবারেই মরে না। বেঁচে ওঠে। কতবার বললুম, মদনমোহনকে দে, নিয়ে যাই, যত্নে রাখব। উঁহুঁ। তা হবে না। মরবার সময় ওকে একবার চোখে দেখব, তবে গিয়ে চোখ বুজব। অথচ চোখে দেখতে পায় না।

এমনি করে বছর কয়েক গেল। তারপর বান এল আমার বাপের বাড়ীর দেশে। সব গেল ভেসে। মদনমোহনও তার মধ্যে।

মাসি দু হাতে মুখ ঢেকে আবেগে মাথা নাড়তে থাকল। অনেকক্ষণ অবধি কথা বলতে পারল না।

"কেউ প্রাণে মরেনি তো?" উজ্জয়িনী উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করল। যেন আজকের ঘটনা।

না, কেউ প্রাণে মরেনি, কিন্তু মরলে ক্ষতি ছিল না, প্রাণের অধিক যখন গেল।

"তারপর।"

"তারপর," মাসি আত্মসম্বরণ করে বলল, "তারপর আমাকে ডাক দিল। দিন রাত দিন রাত। এস, এস, আমি হারিয়ে গেছি, আমাকে খুঁজে বের কর। শয়নে স্বপনে জাগরণে সেই ডাক আমাকে বধির করল, আমি শিশুর কান্না স্বামীর বাক্য শুনতে পেলুম না। সকলে ধরে নিল আমি পাগল হয়ে গেছি। পাগল নয় তো কী। মাথা খারাপ না হলে কেউ স্বামী পুত্র পরিত্যাগী হয়। কিন্তু কী করি বল? আমার তো হাত ছিল না। যে আমাকে পথে টেনে বের করল সে-ই দায়ী।

খোঁজ করলুম অনেক। আমারও খোঁজ করল অনেকে। কোনো পক্ষ সফল হল না।

শেষে গুরুজীকে পেয়ে গেলুম। মনে হল তিনিই মদনমোহন। ঘর না ছাড়লে তাঁকে তো পেতুম না। তাঁকে পাবার পর আর কি পা ওঠে ঘরের পানে! ছেলে দুটোর জন্যে মন কেমন করত। কিন্তু আমি তাদের কী করতে পারি! তারাও কি আমাকে আবশ্যক মনে করে? নিশ্চয়ই তারা তাদের মা বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে বলে কাউকে মুখ দেখাতে পারছে না। আর তাদের বাপ হয়তো আবার বিয়ে করে কলঙ্ক চাপা দিয়েছেন।

আমার গুরুর মতো গুরু হয় না। জ্যোতির্ময় পুরুষ। আমাকে এমন মন্ত্র দিলেন যাতে দুশ্চিন্তা দূর করে, মায়ায় বদ্ধ হতে দেয় না।

তিনি চললেন তীর্থে তীর্থে। আমাকে বললেন, তোমার তীর্থ তোমাকে যারা ডেকে জায়গা দেয় সেই সব গৃহস্থ বাড়ীতে। তাদেরই দুঃখ বেশি, তারা যে মুক্ত নয়, তারা চায় মুক্ত মানুষের সঙ্গ।

কেবল বছরে দু বছরে একবার শ্রীবৃন্দাবন ঘুরে আসি। তাও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে বলে। তিনি প্রত্যেক বছর দোলের সময় আবির্ভাব হন। এবার যাওয়া হল না, গেলে আরো কিছু চরণামৃত আনতে পারতুম। ভাবছি জল মিশিয়ে এই শিশিটাকে বোতল করব, যাতে আসছে বারের দোল অবধি চলে। কী বলিস?"

উজ্জয়িনী কত কী চিন্তা করছিল। শুনতে পাচ্ছিল না শেষের দিকের প্রসঙ্গ। প্রশ্ন করল, "আচ্ছা মাসি, তোমার ভয় করল না বাড়ী থেকে পা বাড়াতে? কী খাব, কোথায় শোব, কেউ যদি গায়ে হাত দেয় কী করব, কাপড় ময়লা হলে কে কেচে দেবে, কাপড় ছিঁড়ে গেলে কে কিনে দেবে,—"

"বুঝেছি!" মাতাজী হেসে বলল, "অত ভাবলে কি আসতে পারা যেত! ঐ যে বললুম। হয়েছিলুম পাগল। ঝোঁকের মাথায় চলে এলুম। এসে দেখি ফেরবার পথ বন্ধ। অভিমন্যুর মতো মুশকিল। তা বেশ ভালোই। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে। নইলে গুরুর—"

"কিন্তু," উজ্জয়িনী বাধা দিলে বলল, "খাওয়া পরার কথা হচ্ছিল। কী খেলে, কী পরলে? এই সব।"

"তাই বল।" যেন তা বলেনি! "একবার বেরিয়ে পড়তে পারলে একটা না একটা উপায় হয়ে যায়। একটা মানুষের কতই বা খোরাক, কতটুকু ঠাঁই লাগে শুতে, দয়ালু লোক শ্রীহরি সবখানে মিলিয়ে দেন। আর তেজ যদি থাকে নিজের শরীরে তবে কার সাধ্য হাত ছোঁয়ায়! যারা মরে তারা মরে আপন পাপে। একবার কী হয়েছিল শুনবি?"

মাতাজী বলল তার এক বিপত্তির কাহিনী। একবার সে একা পথ চলছে, গ্রাম্য গোরুর গাড়ীর হালট। বেলা তখন দুপুর। আশঙ্কার কারণ নেই। গ্রাম্য রাস্তায় অপরিচিত পথিক দেখলে এমনি দু-এক কথা বলতে হয়। পথ যদিও তার জানা ছিল তবু একটি লোক গোরুর গাড়ী হাঁকিয়ে আসছে দেখে সে বলল, "ভালোমানুষের পো, এ পথ বাগডোব যাবে?" ভালোমানুষের পো ভালোমানুষী করে বলল, "যাবে। উঠে এস না গাড়ীতে। আমিও ওইদিকে যাচ্ছি।" তখনো তার যৌবন শেষ হয়নি। যৌবনের আকর্ষণ রয়েছে। ভালমানুষের পো ফস করে সুধাল, "আমার নাম ভজহরি, তোমার নাম কী!" আলাপ না করলে কেমন দেখায়, করাও নিরাপদ নয়। লোকজন নেই ও পথে। হাজার সোরগোল করলেও কেউ শুনবে না। তার সুযোগ নিয়ে ভালমানুষের পো দিব্য রসালাপ শুরু করল। আপত্তিকর পরিহাস, কৌতূহল, ইঙ্গিত। ভদ্রলোকের মেয়ে না হলেও ছোটলোকও তো নয়। কেমন করে উলটা রসিকতা বা পালটা প্রশ্ন করবে, সমান নির্লজ্জ হবে? সে চেষ্টা করে কথার মোহনা ঘুরিয়ে দিতে। "ভালোমানুষের পো, তোর কটি ছেলে কটি মেয়ে? ক বিঘা জমি, কটা হাল?" ভবি কি ভোলে? যার যা স্বভাব। সে যেমন তেমন লোক নয়। কলকাতা শহর দেখে এসেছে। মেয়েলোকের চাতুরী সব জানে। "আমার সঙ্গে আসলে, ধনি, দিব চন্দ্রহার।" এই বলে সে ধরল এক যাত্রার গান।

তখন বাধ্য হয়ে বলতে হল, "এমন অপমান করবে জানলে আমি গাড়ীতে উঠতুম না।"

সে আরো রঙ্গ করল। সে সব বিবৃতির অযোগ্য।

অগত্যা মাতাজী বলল, "আমি নেমে যাব। রাখ গাড়ী।"

সে কি কান দেয়? বাউলের সুরে আর একটা গান ধরেছে। "ওরে সাধের বৈষ্ণবী, আমায় করলি দেশান্তর।"

ক্রমে এসে পড়ল জঙ্গল। দিনে দুপুরেও বেশ অন্ধকার। মাতাজীর ভয় করতে লাগল। সে নামবার জন্যে পীড়াপীড়ি করল না। লোকটা ভাবল সে পোষ মেনেছে। গাড়ীর উপর শুয়ে পড়ল। পথচেনা গোরু। তারা আপন মনে চলতে থাকল! লোকটার মাথা ঠেকল মাতাজীর পায়। মাতাজী পা সরিয়ে নিতে চাইল। সে জোর করে পায়ের উপর মাথা রাখল। তাতেও যথেষ্ট হল না। দুই হাত দিয়ে দুই হাত জড়িয়ে ধরল। তারপর যে প্রস্তাব করল তা অকথ্য হলেও অপ্রত্যাশিত নয়। মাতাজী এক মনে মদনমোহনকে ধ্যান করছিল। প্রভু, যে তোমার টানে স্বামী সন্তান ত্যাগ করল, তোমাকেই যে রূপ যৌবন উৎসর্গ করেছে, তুমি কি তোমার সেই ভোগ্যাকে এই বিকারশীল সামান্য জীবের দ্বারা ভ্রষ্ট হতে দেবে? হে চির-কিশোর, যে আনন্দ তুমিই আস্বাদন করাতে পার অন্য কেউ কি তা পারে? এমনি করে কি ভক্তের সর্ব্বনাশ করাতে আছে?

অবোলা প্রাণী ঐ গরু দুটি। ওরা বুঝি শুনল তার প্রার্থনা। কী মনে করে ওরা উর্দ্ধ শ্বাসে ছুটল। জঙ্গল পেরিয়ে হালট ছেড়ে মাঠের ভিতর দিয়ে উঁচু নীচু পোড়ো জমির উপর দিয়ে একবার ওঠে একবার নামে। "হ হ থাম থাম। দাঁড়া দাঁড়া। আরে আরে।" কিন্তু কে শোনে ওর হুকুম। মাতাজী মনে মনে বলছে, চল বাবা জোরে চল, বৈকুণ্ঠে চল। তোদের গোজন্ম খণ্ডে যাক।

যাক, লোকজন দেখা গেল। মাতাজী বাঁচল। যিনি দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করেছিলেন তিনিই তার ভ্রষ্টতা নিবারণ করলেন।

উজ্জয়িনী আতঙ্কে কম্পমান হচ্ছিল। ভারি আশ্বস্ত হল।

"তিনি তাঁর ভক্তকে সর্ব্বদা আবরণ করেছেন। তিনি থাকতে কাকে ভয়?" মাতাজী উজ্জয়িনীর মুখভাবে সমর্থন না পেয়ে জুড়ে দিল, "এটা আমার গুরুদেবের শ্রীমুখের উক্তি। তোরা একালের লেখাপড়া জানা মেয়ে। তোরা তো বিশ্বাস করবি না।"

উজ্জয়িনী কী মনে করে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা মাসি, ছেলেদের খবর পাও?"

"পাই বইকি।" রুদ্ধস্বরে, "উনি নেই। বড়টির বিয়ে হয়েছে, ছোটটি বিয়ে করবেই না বলে ক্ষেপেছে। সতীনের ছেলেরা লেখা-পড়া করছে। সতীনই এখন সংসারের মাথা। শ্বশুর-শাশুড়ীও চলে গেছেন।"

"তোমার ইচ্ছা করে না একবার দেখে আসতে?"

"ইচ্ছা করলে কী হবে?" কোন্ মুখ নিয়ে যাব? কে আমাকে বিশ্বাস করবে? রামের সীতাকে বিশ্বাস করেনি। আমি কি তাঁর চেয়ে সতী?"

৭

রায়বাহাদুর আতিরিক্ত দায়িত্বের সহিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করছিলেন। বাংলোতে কী হচ্ছে না হচ্ছে, কে এসেছে না এসেছে, এসব বিষয়ে তিনি নির্লিপ্ত নিশ্চেতন। কেবল মাঝে মাঝে উজ্জয়িনীকে সেলাম দেবার জন্যে বেয়ারাকে হুকুম করেন। উজ্জয়িনী উপস্থিত হলে বলেন, "ইফ্ ইউ হাভ্ নো অদার্ এন্‌গেজ্‌মেণ্ট, হোয়াই নট আস্ক্ দি হেণ্ডারসন্‌স্ টু ডিনার টুমরো? এহ্?"

ক্যাপ্টেন চাকলাদারকে অপদস্থ করার পর হরিবংশেরও তাগিদ

ছিল না সাহেববাড়ীর ব্যাপারে নাসিকা প্রবেশ করাবার। ক্যাপ্টেন ছুটি নিয়ে ছুটে বেঁচেছেন। হয়ত বদলি হবেন। তাঁর জায়গায় খবরদারি করবার জন্যে হরিবংশ ঠিকা ব্যবস্থা করেছেন, যাতে বিশেষ কোনো ব্যক্তি সর্ব্বময় মোসাহেব না হতে পায়।

কাজেই মাতাজী রায়বাহাদুরের নজর এড়িয়ে এ বাড়ীতে মাস খানেক কায়েম হল।

উজ্জয়িনী তাকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা, মাসি, তুমি প্রথম যে বার বৃন্দাবন গেলে, কোথায় উঠলে ?"

মাসি ঠাট্টা করে। "কেন বল্ দেখি ? তুই যাচ্ছিস নাকি ?"

বোনঝি আরক্ত হয়ে বলে, "না। এমনি।"

"চল, বেড়িয়ে আসি। যদি তোর শ্বশুরের অনুমতি হয়।"

"তুমিও যেমন !" উজ্জয়িনী ঠোঁট উলটিয়ে বলে, "অনুমতি দেবেন আমার—অসুর !"

মাতাজী আন্দাজ করেছিল শ্বশুরের সঙ্গে বৌমার মনোবিচ্ছেদ। উজ্জয়িনী কোনোদিন প্রকাশ করেনি বলে সেও অযথা কৌতূহলী হয়নি। অমন কত হয়ে থাকে। দু দিন পরে আপনি মিটে যায়। মানুষের মন—কখন ভাঙে, কখন জোড়া লাগে। যেন নদীর চর। তাই নিয়ে খুঁৎখুঁৎ করবে কোন্ মূর্খ ! কাঁদবে কোন্ নির্ব্বোধ ! নালিশ করবে কোন্ পাগল !

"বেশ তো, আমিও আছি, তুইও আছিস। ফিরুক আমার জামাই বিলেত থেকে। অনুমতি কে কাকে দেয় দেখে নেব। বলি কার সংসার ? এ সংসারের মালিক কে ? তিনি, না তুই ?"

"পুড়ে যাক সংসার।" উজ্জয়িনী জ্বলে উঠল।

...তাজী এমন বিস্ফোটন প্রত্যাশা করেনি। তলে তলে বারুদ জমা হয়েছে, য়্যাঁ!

"মা জয়ি।" সে যেন বাক্য দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। মা লক্ষ্মি। শ্বশুর এ সংসারে কার নেই? তা বলে সংসার কি শ্বশুরের যে তার উপর রাগ করতে হবে? শ্বশুর বল শাশুড়ী বল, তাঁরা কদিন বাঁচেন? ক দিন তাদের ভোগ!" মিহি সুরে, "ছি মা! শ্বশুর-শাশুড়ীর কথা গায়ে মাখতে নেই। ওঁরা যা বলেন ভালোর জন্যেই বলেন। আমাদের বোঝার ভুল।"

হায় মাতাজী বৃন্দা দাসী। তুমি তো জান না যে শ্বশুর আর শ্বশুর নয়, কারণ স্বামী আর স্বামী নয়। যার সম্বন্ধে তিনি শ্বশুর সেই যে পরম পর। তার প্রেম পেলে কি উজ্জয়িনী বুড়া শ্বশুরকে পদে পদে ক্ষমা করত না, প্রাণপণে খুশি করত না?

উজ্জয়িনী বিরক্ত হয়ে বলল, "ওসব ভুয়া উপদেশ কোনো কাজে লাগবে না, মাসি। যা বোঝ না তা নিয়ে অনধিকারচর্চ্চা কোরো না।"

'অনধিকারচর্চ্চা' মাতাজীর দুর্বোধ্য। তবু তার সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা সে ওর অর্থ বুঝল। চুপ করল।

আর একদিন উজ্জয়িনী জিজ্ঞাসা করল, "তুমি যখন বৃন্দাবনে ছিলে তখন নিত্য লীলা স্বচক্ষে দেখেছিলে?"

"তা দেখবার জন্যে বৃন্দাবনে যেতে হয় না জয়ি।"

"না, তুমি আমার কথার জবাব দাও।"

"ওখানে যাই শুধু গুরুকে দর্শন করতে। আর মদনমোহনকে দেখি ওখানে এখানে যখন যেখানে।"

"তবে বৃন্দাবনের এত মাহাত্ম্য কেন? সকলের তো গুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না ওখানে।"

"তা হয় না বটে। তবে সেখানে লীলা হয়েছিল সেই জন্যে আজো লোকে যায়। তারা কি আর লীলা দেখে! তারা দেখে মন্দির, কুঞ্জ, বিগ্রহ, কুণ্ড। তারা পায় সাধুসঙ্গ। তারা শোনে কীর্তন। লীলা কি কেউ দেখতে যায়?"

উজ্জয়িনী সন্তুষ্ট হল না। কেউ দেখতে যায় না এ কি কখনো হতে পারে। যায়, যেমন দীনহীন দাস যেতে চায়। আহা বেচারা! যেতে চায়, কিন্তু আখড়ার ওরা যেতে দিচ্ছে না। সকলে মিলে যাবে। কিন্তু একটা না একটা বন্ধনে একজন না একজন আটকা পড়ছে। 'রাধাকৃষ্ণের নিত্য লীলা হে নয়নে হেরিব।'

"তুমি কিচ্ছু জান না মাসি।" উজ্জয়িনী উঠে গেল।

এক বাড়ীতে কেন যে মাতাজীর বেশিদিন থাকা হয় না তার কারণ এই। "তুমি কিচ্ছু জান না।" বটে! আমি কিচ্ছু জানি না আর তুই আমার পেটের মেয়ের মতো, কতই বা তোর বয়স, তুই জানিস! আমার শ্রীগুরু শ্রীমুখে বলেছেন, তিনি জানেন না, আর তুই বড়লোকের বৌ সব জানিস! যাঃ। এমন বাড়ীতে আর একটা দিনও নয়। গুরু নিন্দা! লঘু মুখে! আর একটা দিনও নয়।

মাতাজী পোঁটলা বেঁধে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে একবার উজ্জয়িনীর মুরলীমনোহরকে প্রণাম করতে গেল। গিয়ে দেখল উজ্জয়িনী চোখের জলে ভাসছে। উজ্জয়িনী কিন্তু মাসীকে দেখতে পেল না। আপন মনে বলে যেতে থাকল, "কানু, তোমাকে আমি পটে দেখে তৃপ্ত হব না, মূর্তিতে দেখে তৃপ্ত হব না। আমি চাই সশরীরে দেখতে আমি তোমাকে অন্তরে দেখে তৃপ্ত হব না, স্বপ্নে দেখে তৃপ্ত হব না, আমি চাই স্বচক্ষে, দেখতে, চর্মচক্ষে। কত ভক্ত দেখেছেন, আমি কার চেয়ে কম? আমার মন নিষ্পাপ, আমার

দেহ অস্পৃষ্ট, আমার আচরণ শুচি, আমি তিন বেলা স্নান করি, এক বেলা আহার করি। আমি তোমাকে ছাড়া কারুকে কামনা করি না, কল্পনা করি না, স্বপ্নেও দেখি না। কেন তা হলে আমি তোমাকে গোপীদের মতো করে পাব না?"

মাতাজীও কাঁদল। এমন আকুল আবেদন সে অন্য কারুর কণ্ঠে শোনেনি। তার নিজের আবেদন এ জাতীয় নয়। সে ভালোবেসেছিল মদনমোহন মূর্ত্তিকে। প্রার্থনা করেছিল সম্পত্তিরূপে। চিরকালের মতো সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবার ফলে তার ভালোবাসা গেল চারি দিকে ছড়িয়ে। মা যেমন মৃত শিশুর মুখ সর্ব্বত্র দেখে সেও তেমনি চরাচরময় দেখতে পেল মদনমোহনের রূপ। আর সে আশা করে না যে, বিশেষ একটি স্থলে বিশেষ একটি মূর্ত্তিতে দেখা পাবে তাঁর। যদি পায়ও তবু সেই অষ্ট ধাতুর বিগ্রহে। যে বিগ্রহ গেল ভেসে সেই হয়তো দৈবযোগে উদ্ধার হবে। কিন্তু উজ্জয়িনীর দুঃসাহস দেখ। সে চায় মূর্ত্তিতে নয়, পটে নয়। সে চায় সশরীরে। হতভাগিনী। তা কি সম্ভব! চর্ম চক্ষুতে কেউ যদি তাঁকে দেখে থাকে তবে তা সেকালে, তা একালে নয়। হায় রে মেয়ে! না জানি তোর কপালে কত দুঃখ লেখা আছে।

মাতাজী উজ্জয়িনীর জন্যে কাঁদল। নীরব ক্রন্দন মাঁতাজীর শ্রেণীর স্ত্রীলোকের অনভ্যস্ত। ফোঁপানি শুনে উজ্জয়িনী ঘাড় বেঁকিয়ে আবিষ্কার করল, মাসি। তার যেমন লজ্জা তেমনি রাগ হতে থাকল মাসি সমস্ত শুনেছে ভেবে। কিন্তু যে মানুষ কাঁদছে তার দুঃখে, তাকে কি কঠিন কথা বলে ভৎর্সনা করা যায়! উজ্জয়িনী বড় অপ্রস্তুত বোধ করল। ছি ছি! মাসি এ বাড়ীতে এসে অবধি তার প্রাইভেসি বলে কিছু রইল না।

অহো অভিজ্ঞাতকন্যা! তোমার প্রাইভেসীর সংস্কার তোমার সকল সংস্কারের সেরা। তোমার একে একে অন্য সব সংস্কার মুছলেও ঐটি যেন চীনা কালির দাগ। তুমি কেমন করে মাতাজীর প্রতি সুবিচার করবে। ছোটলোক বড়লোকের তফাৎ যে ঐখানে।

৮

মাতাজীকে কঠিন কথা বলে বিদায় দিয়ে উজ্জয়িনী অনুশোচনায় লুটিয়ে পড়ল। এ কী হয়েছে তার। কেন তার একটুতে রাগ, একটুতে অভিমান, একটুতে কান্না? কী তার ক্ষতি করছিল মাতাজী? অমন সঙ্গিনী সে কোথায় পাবে? অমন হিতৈষী। তবু তাকে বলল কঠিন স্বরে কঠিন কথা। "কেন তুমি যখন তখন আমার ঘরে ঢোক?" কী স্বার্থপরের মতো কথা! 'আমার ঘর।' যে ঘরে রয়েছে সকলের দেবতা সে ঘর একা উজ্জয়িনীর!

তবু ভাবতে ভালো লাগে দেবতা একা তার। তার মুরলীমনোহর। তার প্রভু। তার কানু। তার সখা। তার কৃষ্ণ। রাধার কৃষ্ণ নয়। চন্দ্রাবলীর কৃষ্ণ নয়। উজ্জয়িনীর কৃষ্ণ। রাধামুরলীমনোহর নয়। উজ্জয়িনীমুরলীমনোহর।

উজ্জয়িনী জিভ কাটে। কী অপরাধ! কী লজ্জা! সামান্য মানবী সে! শ্রীরাধার স্থান আশা করে। না, না। সে একজন নগণ্য গোপিকা। সেবিকা, পরিচারিকা, কিঙ্করী। তার পিতৃদত্ত নাম কি একটা নাম! তার নামই নেই। নামহীনা গোপিকা, অনামিকা দাসী।

এই মন্দ নয়। 'অনামিকা দাসী।' তার নাম অনামিকা দাসী।

মাতাজী চলে যাবার পর উজ্জয়িনী ঘরে পড়ে থাকল। নড়াচড়া করল না। শুয়েই কাটায়। ভাবে আকাশপাতাল। কাঁদে। হঠাৎ খেয়াল হলে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। তৃপ্তির হাসি হাসে। নিদাঘে ফল পাকছে, মিষ্ট রসে ভরে উঠছে। নিদাঘ হচ্ছে পরিপক্কতার ঋতু। ঋতুর প্রভাব নারীদেহের উপর পড়ছে না তো? উজ্জয়িনীর দেহ যে ফলের মতো তুল তুল করছে। টস টস করছে। মুখ ভরে আসছে, বুক ভরে আসছে। কেমন মদালস ভাব তার সন্ধিতে সন্ধিতে। অঙ্গে অঙ্গে মদমন্থরতা। সে কোথাও ছুটে যেতে চায় না। সে চায় কেউ তার কাছে আসুক, এসে দু দণ্ড বসুক, দুটো কথা বলুক, একবার চেয়ে দেখুক তার চোখে। সে চায় না কিছু বলতে, কোনোপ্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করতে। সে সম্পূর্ণ অকর্মক।

দেহ যখন ফলের মত পরিপক্কতা পেতে থাকে তখন অন্তরাল খোঁজে। উজ্জয়িনী সহ্য করতে পারে না লেশমাত্র বিক্ষেপ। দাসী তাকে মনে করিয়ে দিতে আসে স্নানের সময় হয়েছে। সে অমনি ফোঁস করে ওঠে। জ্বালাতন। একটু চুপ করে থাকতে দিল না এ পারবতীয়াটা। এটাকে ছাড়িয়ে দিতে হবে। কিন্তু পরে তার ঐ সঙ্কল্প কার্যে পরিণত হয় না, উদ্যমের অভাবে। সে স্বস্থানে ফিরে এসে আবার গা ঢেলে দেয়। ভুলে যায় পারবতীয়াকে। এর পরে হয়তো পারবতীয়া নয়। ঠাকুর। খেতে হবে না? উজ্জয়িনী পণ করে এ বেটা সয়তানকে জেলে না দিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না। না খেয়ে কি মানুষ বাঁচে না? তার নিজের কথা হলে সে না খেয়ে দেখিয়ে দিত যে বাঁচা যায়। কিন্তু কানুকে যে উপবাসী রাখা যায় না। ভোগ দিতে হবে। প্রসাদ পেতে হবে।

দিনগুলি দীর্ঘ। দুপুরে গরম হাওয়া দেয়। ঘুম পায়। এমনি চোখ বুজে আসে, চোখের পাতা জুড়ে যায়। হাই তুলতে তুলতে কখন একসময় উজ্জয়িনী ঢুলতে আরম্ভ করে। ঢুলতে ঢুলতে এলিয়ে পড়ে। তার তখনকার রূপ দেখতে যদি কেউ থাকত, তবে দেখত সে নিজেই একখানি সুকুমার স্বপ্ন। পদ্মিনী নারীর মতো অতি মৃদু নিঃশ্বাস, অতি বিরল স্বেদ। ঈষৎ আকুঞ্চন ঈষৎ প্রসারণ তার বুকের। কেশ তার অবিন্যস্ত। তার অসতর্ক বসনের পল্লবান্তরালে অনতিসুরক্ষিত দুটি ফল। তার নিরাভরণ দেহের আভরণ হয়েছে তার পরিপক্ক সুঠাম অঙ্গ। যেমন তার বাহু তেমনি তার গ্রীবা, তেমনি তার উরু, তেমনি নিতম্ব। এক একটি পরিপূর্ণ মধুকোষ।

প্রগাঢ় আলস্য উজ্জয়িনীকে শয্যার সঙ্গে আঁটে। সে উঠতে চেষ্টা করে, পারে না। ঘুম যখন ভেঙে গেছে, স্বপ্নও গেছে মিলিয়ে, তখনো সে পড়ে থাকে অবশ। তেমনি অবস্থায় করে ধ্যান, করে প্রার্থনা। তবে সেবার বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে বলে ভয় হলে ঝপ্ করে উঠে বসে। হেসে বলে, ওঃ। দিন দিন কুঁড়েমি বাড়ছে। কানু যদি দু হাত দূরে থাকে ততটুকু হাঁটতে পা উঠছে না। পা ওঠা তো দূরের কথা, গা উঠছে না।

দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে উজ্জয়িনী উপরের দিকে চেয়ে টিকটিকি দেখে। নিয়মমতো ঝাড়া হয়নি। কোণে মাকড়সা। টিকটিকি আর মাকড়সা, আরো কতরকম পোকামাকড়, উজ্জয়িনীকে ভুলিয়ে রাখে। ওরাও কি কম অলস! মিনিটের পর মিনিট যাচ্ছে, ওরা নড়ছে না। ওরা কোন এক স্থির জগতের বাসিন্দে। ওদের কিছুতেই বেলা হয় না, বেলা যায় না। কেবল টিকটিকি

যখন ল্যাজের বাড়ি দিয়ে চার পায়ে হেঁটে এগিয়ে যায় ও অকস্মাৎ জিভ বাড়িয়ে দিয়ে পোকাকে টেনে আনে তখন উজ্জয়িনী শিউরে ওঠে! তখন তার আবেশ যায় ভেঙে। বেচারা পোকার জন্য শোকাকুল হয়ে টিকটিকিটাকে অভিশাপ দিতে দিতে যায় সেবার আয়োজন করতে।

কোকিল ডাকিছে মুহুর্মুহু। কোকিল বধূ দিচ্ছে সাড়া। ওদের যে অন্য কোনো কাজ নেই। নেই আহারের তাগিদ। ওদের যেন মিলনেরও ত্বরা নেই। নেই পরস্পরকে খুঁজে বার করবার গরজ। ওরা ভালোবাসে শুধু ডাকাডাকি করতে, ডেকে সাড়া পেতে। উজ্জয়িনী ওদের রীতি দেখে হাসে। ওরা কি কম কুঁড়ে! উড়ে গিয়ে প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হতেও ওরা গা তোলে না। এমন আয়েসী প্রেমিক কে কোথায় দেখেছে?

সন্ধ্যার দিকে একটু শীতল বাতাস বয়। কোনো কোনো দিন কাল বৈশাখীর ঝড় ওঠে। আকাশে মেঘ করে গর্জ্জন। দিগন্ত আঁধার হয়ে আসে। সকলের সব কথা চাপা পড়ে যায়, একটা চাপা স্বর ভূতল মথিত করে আকাশের দিকে উত্থিত হয়। গাছ-গাছড়ার পাতা পতঙ্গের মতো ওড়ে। ধূলায় দিক ঢেকে যায়। বাতাস শাঁ শাঁ করতে থাকে। উজ্জয়িনী দুই হাত যোড় করে মাথায় ঠেকায়। সৃষ্টি পুড়ে যাচ্ছিল, দেবতা। তাকে বাঁচালে। তারপর সোল্লাসে ঝড়ের দৃশ্য দেখে। তার ইচ্ছা করে বিদ্যুতের মতো দিগন্ত হতে দিগন্তে ছুটে যেতে। আঃ, সে কী মুক্তি! সে কী শান্তি! এই স্থাণুর জীবন যে তার দুর্ব্বহ হয়ে উঠেছে। কার জন্তে এ বাড়ীতে দিনক্ষয়? তার কাম্য কি বাইরে নেই? নেই

পথে, নেই আকাশে, নেই ঝড়ের তাণ্ডবে, নেই ধ্বংসে? "মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান।" উজ্জয়িনী ঝড়ের সুযোগ নিয়ে গলা ছেড়ে দিয়ে গান ধরে।

দুপুরে উজ্জয়িনী কানুকে চন্দন মাখিয়ে নিজেও সারা অঙ্গে মাখে। কানুকে মাখানো মানে পটের উপরের কাচে মাখান। সেই তার চন্দনচর্চ্চিত নীল কলেবর। উজ্জয়িনী মুগ্ধ নয়নে তাকায়। ভাবে কানুর শ্যামল দেহ শীতল হল। তার নিজের বেলায় তার অন্য ভাবনা। চন্দনে কি তার জ্বালা নিববার! তার দাহ জুড়াবার?

"কত নলিনী দল শেজ শোয়াউবি

কত দেব মলয়জ পঙ্কা

জলজ দলন কত দেহে দেয়াওব

তথুহু হুতাশন শঙ্কা।"

সে যে কী চায়, কী পেলে শীতল হবে, কী না পেলে জ্বলতে জ্বলতে ভস্ম হয়ে যাবে, তা যদি সে জানত। বাইরে নিদাঘ, অন্তরেও তাই। তবু তার দিন দিন পরিণতি পাচ্ছে, কেন? কেন? কেন? কেউ যদি পীড়ন না করবে, যদি পেষণ না করবে, যদি নিংড়ে না নেবে দ্রাক্ষা কেন শাঁসে মোলায়েম হয়, রসে টগমগ করে? আয়নার দিকে চেয়ে সে লজ্জায় চোখ বোজে। আর চাইতে পারা যায় না। এ আপদ কোথায় ছিল, কোথা হতে এল? চুরি করে দেখেও, চোখের পাতার ফাঁকে। শরীরটা কেমন করে ওঠে—কেমন একটা শিরশিরিয়ে ওঠার মতো। তার আশ্চর্য লাগে। তার ইচ্ছায় এসব হয়নি। তার মতামতের অপেক্ষা রাখেনি। কে যে তাকে নিয়ে কী খেলা খেলছে, কী পরিহাস করছে কেমন করে সে বুঝবে। আর তার মনে হয় না যে সে বালিকা সে নারী।

মাতাজী যে কয়দিন ছিল উজ্জয়িনীকে ধরে জোর করে আয়নার সামনে বসিয়ে তার চুল বেঁধে দিত। যেমন ঘন তেমনি দীঘল কেশ, অনেকদিন তেল না পড়ায় রুক্ষ, এক পোঁছ কম কালো। মাতাজী অনুযোগ করে বলত, "জটা করে রেখেছিস, জটাই পাখীর মতো। ইস!" মাতাজীর প্রযত্নে রং ও রেখা ফিরল। কিন্তু মাতাজী যে কয়দিন ছিল সেই কয়দিন। তারপর চুলে না পড়ল তেল, না লাগক চিরুনি। গল্পের গোঁপখেজুরের মতো উজ্জয়িনী হাই তুলে পাশ ফিরে শোয়। কেউ যদি চুল বেঁধে দেয় তো বেশ হয়। আয়নার সামনে চোখ খুলে বসে থাকাও এক পরীক্ষা। তার চেয়ে শুয়ে শুয়ে ধ্যান করা কেমন আরামের! কানুকে।

গ্রীষ্মের সঙ্গে সঙ্গে উজ্জয়িনীর মন্থরতাও বাড়ল। কিন্তু সে মন্থরতা দেহের। মন তার এক মুহূর্ত্ত সোয়াস্তি পেল না। কী যে তার অভাব, কিসে যে তার পূর্ত্তি তা যদি সে স্পষ্ট করে বুঝত! তার যেন মালুম হয় তার সর্ব্বাঙ্গে পাষাণভার চেপে রয়েছে। তাই তার এত অশান্তি। যদি সে ছুটতে পারত ঝরনার মত অনর্গল, নিরুদ্বেগ, নির্দ্দায়িত্ব। যদি যেতে পারত বৃন্দাবনে—তার মানস-লোকে—যেখানে চলেছে নিত্য লীলা, যেখানে মানুষের তুচ্ছ খাওয়া-শোয়ার অবকাশ নেই, যেখানে নেই তুচ্ছতর পরচর্চ্চা আত্মম্ভরিতা লোকনিন্দা লৌকিকতা। সামাজিক মানুষের প্রতি উজ্জয়িনীর কর্ত্তব্যবোধ লোপ পেয়েছিল, অথচ তার স্বার্থও ছিল না অবশিষ্ট। সে যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত। তার অসাড় দশা তাকে উন্মাদ করবে। একবার যদি ছাড়া পেত তবে জানত কে সে, কী সে, কাকে তার চাই, কে তাকে চায়? তখন সে নিশ্চিত জানত সে অনামিকা দাসী, কানু তার বাঞ্ছিত। সে যদি না যেতে পায় ব্রজে তবে সে মরে গেলে ক্ষতি

কী! কিন্তু কে তাকে নিয়ে যাবে সেখানে? একা কি পারবে যেতে?

কানুকে ধ্যান করে বটে, কিন্তু তাও অলসের ধ্যান। কাঙালের লক্ষপতি হবার দিবাস্বপ্ন। সেবা করে, তাও অভ্যাসবশে। কানু, সত্যি কি তোমাকে পাব? তোমার পট নিয়ে পূজা করছি, সে পূজা কি তোমার পায়ে পৌছাচ্ছে, প্রিয়তম? তেমন পূজায় আমারই কোন তৃপ্তি! এখানে এই যে আমার কুঞ্জ এর চারিদিকে পাষাণপুরী। এর অবস্থিতি শত্রুরাজ্যে। এ যদি হত বৃন্দাবনে—মিত্ররাজ্যে—তবে তুমি এতে আসবার পথে বাধা পেতে না, নাথ। তুমি আসতে রাধার কুঞ্জ থেকে আমার কুঞ্জে, যে পথ দিয়ে আসতে তার দুই ধারে কেতকী বন, নীপতমালবীথি। আমার কুঞ্জ পুষ্পিত লতার আলিঙ্গনবদ্ধ সহকার পাদপের, তার শাখায় শাখায় কোকিল-কোকিলা শুক-শারী। তাতে থাকবে একটি ফোয়ারা, বিশ্বকর্মার নির্মিত! আর থাকবে গুচ্ছ গুচ্ছ সুস্বাদু আম্র। পাখীরা খাবে, আমরাও খাব। নিকটেই যমুনা। তার কুলুকুলু ধ্বনি, তার তীরের বাতাস, সম্বৎসরব্যাপী বসন্ত বিরচন করবে।

## ৮

"টেলিগ্রাম, হুজুর।"

টেলিগ্রাম তো হরদম আসতে লেগেছে। কলেক্টরের কাছে আসবে না তো কার কাছে আসবে। সামান্য বিপদ ঘটলে বা ঘটবার গতিক দেখলে বা স্বয়ং ঘটিয়ে অন্য পক্ষের উপর দোষ চাপাবার মতলবে লোকে কলেক্টরের রাতের ঘুম দিনের আহার কেড়ে নেয়—টেলিগ্রাম করে।

কিন্তু সেসব হল সরকারী টেলিগ্রাম, তার শিরোনামা ডিসট্রেট অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, অথবা কলেক্টর। রায়বাহাদুর বাড়ী না থাকলেও সেসব উজ্জয়িনীর হাতে পৌছায় না।

"টেলিগ্রাম হুজুর। কোঠিকা টেলিগ্রাম।"

উজ্জয়িনী চমকে উঠল। শ্বশুর গেছেন জামালপুরে—নাচতে। রেলের সাহেবদের সাথে ওঁর বনে ভালো। উজ্জয়িনী তাঁর হয়ে সই করল।

কে করেছে টেলিগ্রাম? কার কী হল? কেউ আসছে না তো? আর একটি মিসেস স্যামুয়েলস? কোথাকার টেলিগ্রাম? বিলাতের নয় তো? বাদলের—

উজ্জয়িনী আঁতকে উঠল। তার স্বামীর—

হা ভগবান। কী দুঃসংবাদ এল বিলাত থেকে।

টেলিগ্রামখানা খুলতে সাহস হল না তার। প্রাইভেট টেলিগ্রাম রায়বাহাদুর সেনের নামে বড় একটা আসে না। সেবার এসেছিল যোগানন্দের পাটনা আসা উপলক্ষ্যে। কারুর তো আসার কথা নেই এই সময়। কেন, কেন তবে এ টেলিগ্রাম?

খোলার অধিকার কি উজ্জয়িনীর আছে? খুলবে? না, কাজ কী। হয়তো খুলে দেখবে কোনো আধা-সরকারী খবর। হয়তো কিছু কনফিডেনশিয়াল।

না। খুলতেই হবে। উজ্জয়িনীর কেমন অসোয়াস্তি বোধ হচ্ছে। তার মনের উপর যেন একটা কালো ছায়া পড়েছে। এ টেলিগ্রাম যেন তারই জন্যে। তারই উদ্দেশে। তার স্বামীর—

এক টানে ছিঁড়ে ফেলল খাম। এক নিমেষে পড়ে ফেলল।

**Husband expired to day. Heart failure.**
**Bibi Gupta.**

উজ্জয়িনী দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখের পলক পড়ল না। সে বুঝতে পারছিল না কী তার হয়েছে! তার চারদিকে আঁধার ঘনিয়ে এল! তার পা টলতে আরম্ভ করায় সে দেয়াল ধরে বসে পড়ল! তার বোধ হচ্ছিল তারই হার্ট ফেল করবে, বুক করছিল এমনি ঢিপ ঢিপ, যেন ঢেঁকি পড়ছে উঠছে। কতক্ষণ বাদ তার বিমূঢ় ভাব কিয়ৎ-পরিমাণ কম হল। সে টেলিগ্রামখানাকে আবার খুঁটিয়ে পড়ল। বুদ্ধি খাটিয়ে সেখানার কতরকম ব্যাখ্যা করল। না, এ কি কখনো হতে পারে যে তার বাবা আর নেই, আর দেখা হবে না? অসম্ভব। নিশ্চয়ই টেলিগ্রাফ আফিসের কেরানী ভুল করেছে। মারা যাননি, মারা যেতে পারেন না। মারা কি কেউ আগে খবর না দিয়ে যায়! মারা যাবার আশঙ্কা থাকলে আগে নিশ্চয় তার আসত—উজ্জয়িনীকে পাঠাও। টেলিগ্রাফ আফিসে গোলমাল হয়েছে, কেরানীর ত্রুটি। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে হবে।

কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে উজ্জয়িনী শ্বশুরের জন্যে তারটা ভাঁজ করল। লোক পাঠাল তাঁকে ডাকতে। বাবার ভয়ানক অসুখ! আজকেই রওনা হতে হবে কোয়েটা। সঙ্গে যদি শ্বশুর চলেন তা ভালোই, নতুবা একজন ভৃত্য গেলেও চলবে।

"কানু," উজ্জয়িনী কেঁদে ফেলে বলল, "বাবাকে বাঁচিয়ে দাও। আমার বাবা মরে গেলে আমিও মরে যাব।"

এতদিন সে বাবার চিন্তাকে অবহেলা করছে, মনে মনে বাবাকে অস্বীকারও করেছে। আজ অনুতাপে তার অন্তর দগ্ধ হতে থাকল। সে স্মরণ করল তার স্মৃতি যতদূর পিছনে যায় ততদিনের বৃত্তান্ত।

কবে সে বাবাকে প্রথম চিনল, তাও মনে আনতে প্রয়াস পেল। একটার পর আর একটা ঘটনা সাজিয়ে ভাবতে পারে না, পরম্পরা ভেঙে যায়। সব যেন এক সঙ্গে ভিড় করে আসে। একটার সঙ্গে আর একটা জুড়ে যায়, জড়িয়ে যায়। এবং—

থেকে থেকে শূল ফুটতে থাকে—

সেই বাবাটি আজ আমার নেই।

মিথ্যা কথা। আছেন। একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অমন সকলে হয়। তা বলে—নেই! এত বড় কথা। টেলিগ্রাম কি বেদবাক্য? টেলিগ্রাম কি ভুল হতে পারে না? সে কি জানে না যে কত লোক মিথ্যা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে বন্ধু-বান্ধবকে এপ্রিল ফুল বানায়? এটা অবশ্য এপ্রিল নয়। মে! আর আজকার দিনটা পয়লাও নয়। তবু কে জানে কার হঠাৎ খেয়াল হল মুঙ্গেরের ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে একটু রঙ্গ করতে।

উজ্জয়িনী প্রবল পরাক্রমে অন্তঃশূলকে অবদমন করে রাখল। প্রতীক্ষা করল শ্বশুরের। আজ রাত্রেই যেতে হবে কোয়েটা। বিছানা-কাপড় বাঁধাছাঁদা করা দরকার। টাইম টেবল এই বেলা দেখে নেওয়া যাক। ওঃ পথ তো দশ ঘণ্টার নয়। পৌছানো অবধি বাবা বাঁচলে হয়। হা ভগবান! আর একদিন আগে যদি টেলিগ্রামটা আসত। এতক্ষণে উজ্জয়িনী আলিগড় পেরিয়ে যেত।

কন্যা হয়েছিল কেন যদি না মরণাপন্ন পিতার সেবা করতে পারল? নার্স করতে চেয়েছিলেন তিনি তাকে, তাঁর শুশ্রূষা করতে পারল কই? জীবনে তাঁর সে ইচ্ছার পূরণ হল না। হল না উজ্জয়িনীরও পরিতৃপ্তি। তবু যদি গিয়ে দেখে যে বাবা আছেন তবে সে প্রাণপণ করবে, যতটুকু তার আসে ততটুকুর মধ্যে সে প্রাণ ভরে

দেবে। বাবা তার কাতর, আর সে কি-না আলস্তে দিবানিদ্রা দিচ্ছে। কান্নর দোহাই দিয়ে তার নিস্তার কই? এ যে পাপ। এ যে অকৃতজ্ঞতা। পিতার মরণে কন্যার অসাড়তা।

"বৌমা." ঘরের মধ্যে ঝড়ের মতো ঢুকলেন মহিমচন্দ্র, "বৌমা, যোগী নেই। নেই নেই, ইহলোকে নেই। হায় হায় হায়!"

তাঁর পরনে তখনো ইভনিং স্থট, সন্থ নাচ থেকে ফিরছেন। ইতিমধ্যেই তিনি একখানা গীতা সংগ্রহ করে এনেছিলেন। সেখানা ত্রস্ত ভাবে খুলে বললেন, "বৃথা, বৃথা শোক। শোন শ্রী ভগবান কী বলছেন:

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।
যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে—"

উজ্জয়িনীর সংজ্ঞা লোপ হয়েছিল। মহিমচন্দ্র তাকে দেখে বিষম ভয় পেয়ে গেলেন। সেও জীর্ণ বস্ত্র ছাড়বে নাকি? কিন্তু তার তো ওটা জীর্ণ বস্ত্র নয়। তবে কি গীতা ভুল? মহিমচন্দ্র হাঁক দিলেন নাথুনিকে। নাথুনি আনল জল। সেই জল ছিটানো হল উজ্জয়িনীর মুখে। উজ্জয়িনী চোখ চাইল। বাঁচা গেল। তা হলে গীতা ভুল নয়।

বেচারি উজ্জয়িনীকে প্রাণ ভরে কাঁদতে না দিয়ে হাসানোই বুঝি ছিল তার শ্বশুরের মতলব। ইভনিং বস্ত্র পরিত্যাগ না করে তিনি জীর্ণ বস্ত্রের উপর আর এক চোট বক্তৃতা হানলেন। গীতার বঙ্গানুবাদ দেখে।

উজ্জয়িনী স্থির জানল যে বাবা তার বেঁচে নেই। আর দেখা হবে না তাঁর সঙ্গে। হাজার ডাকলেও তিনি শুনবেন না,

হাজার খুঁজলেও তাঁকে পাওয়া যাবে না। চিঠি লিখলে চিঠি পৌঁছাবে না তাঁর হাতে, তার করলে তার ফিরে আসবে। বাবা, বাবা, বাবা গো! তুমি কোথায়? তোমার স্থান যে শূন্য লাগছে। আকাশ অন্তরীক্ষ পৃথিবী—সব শূন্য। কী যেন ছিল, কী যেন নেই। কে যেন তাকে বিয়োগ করে নিয়েছে। আকাশ থেকে যদি নীলকে, পৃথিবী থেকে যদি শ্যামলকে বিয়োগ করে নেয় তবে কেমন হয়? অন্তরীক্ষ থেকে যদি বায়ুকে বিয়োগ করে তবে যে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। উজ্জয়িনীর তাই হয়েছিল। জলের ছিটা লেগে তার চেতনা ফিরেছে।

"আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে 'রামকে চিন', তাহা হইলে মনে কর আমি উত্তর দিলাম 'চিনি'। এখানে রামের স্থূল শরীর এবং তাহার গুণ ও কর্ম সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াই 'চিনি' উত্তর দিয়া থাকি। রামের ভিতরে যে অচিন্ত্য চৈতন্য লীলা করিতেছে—"

উজ্জয়িনীর মাথা ঘুরতে লাগল। সে উঠে দাঁড়াতেই নাথুনি তাকে ধরে আবার বসিয়ে দিল। তখন সে হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো সমস্ত সংযম হারিয়ে কিসের দ্বারা চালিত হয়ে চিৎকার করে উঠল, "য়্যাঁ—" তীব্র স্বরের চিৎকার।

তখন মহিমচন্দ্রের সুবুদ্ধি হল। শোক মানুষ করবেই, মানুষকে তা করতে দেওয়া ভালো। সকলে তাঁর মতো দার্শনিক নয়। তাঁর স্ত্রীবিয়োগের সময় তিনি কেবল গীতাপাঠ করেছিলেন। বন্ধু-বান্ধবের অনুরূপ দশা হলে তিনি সেই পরামর্শ দিয়ে থাকেন। শোক দূর করবার অমন দাওয়াই আর নেই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যে অপরিমেয় লোকক্ষয় হল তার শোক ভারতের মনে বিদ্ধ রয়েছিল, তাই লিখতে হল গীতা।

তিনি যেমন ঝড়ের মতো ঢুকেছিলেন তেমনি ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেলেন, গিয়ে টেলিগ্রাম করলেন কোয়েটায় সমবেদনা জানিয়ে, লণ্ডনে সংবাদটা জানিয়ে। তারপর খানিক পায়চারি করে কর্তব্য চিন্তা করলেন। উজ্জয়িনীকে তার মায়ের কাছে পাঠাবেন, না তার মাকে অনুরোধ করবেন মুঙ্গেরে আসতে? কোথায় শ্রাদ্ধ হবে—কোয়েটায় কি কলকাতায়, কি আদৌ হবে না? কে জানে ওরা ইঙ্গবঙ্গরা কী মানে, কী না মানে? শব দাহ হল, না গোর দেওয়া গেল, তাই বোঝা যায় না।

এ ছাড়া তাঁর অনেক সরকারী ভাবনা ছিল। সময়ের বড় অভাব। একটা বিষয়ে ভাবতে না ভাবতে আর একটা বিষয় এসে ধন্না দেয়। কমিশনার পরশু আসছেন। তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন করতে হবে। গোটা চারেক কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট ডিউ হয়ে গেছে। আবার তাঁকে যেতে হচ্ছে কয়েকটা মিউনিসিপ্যালিটি পরিদর্শনে। বাজেটের গোলমাল বাধিয়ে বসে আছেন বাবুরা। তার উপর এই আত্মীয়বিয়োগ। একটু দুঃখ করবেন, একটু স্মরণ করবেন মৃত ব্যক্তির গুণাবলী, একটু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, "আহা লোকটা বড় ভালো ছিল" তার অবকাশ কই। সেই যে ভোরবেলা তাঁর ঘুম ভেঙেছে, তখন থেকে কাজ নিয়ে নাচছেন। ভাবলেন মনটাকে খেলিয়ে দেবার জন্যে ঘণ্টাখানেক ফক্সট্রট নাচলে মন্দ হয় না। ওয়াল্ট্‌সেরও ষ্টেপ্‌স্ তিনি শিখেছেন। জিনিসটা বড় উপাদেয়। ইউরোপীয়দের মাথা আছে। কী উদ্ভাবনাই না করেছে। তবে কিনা নারীর সাহচর্য্য না হলে হয় না। রক্ষা এই যে, নারী এ ক্ষেত্রে হিন্দু নারী নয়। ইউরোপীয় নারী সম্বন্ধে দায়িত্ব ইউরোপীয়দের। তাঁর নয়। তিনি চা

মানসিক পরিশ্রমের পর বিনোদন। সেটুকু পাওয়া নিশ্চয়ই অন্যায় নয়। সেটুকুর বেশিও তিনি চান না। ওসব নারীঘটিত ব্যাপারে তিনি নেই। তাঁর চরিত্রের আদর্শ কঠোর।

এমন সময় নাথুনি এসে খবর দিল বৌমেমসাব তাঁকে ডাকছেন।

"কী হয়েছে বৌমা, কী চাই," মহিমচন্দ্র তেমনি শশব্যস্ত হয়ে সুধালেন। "আর একটু গীতা পড়ব? নিয়ে আয় তো রে আমার টেবল থেকে। এ শরীর হচ্ছে আত্মার বসন। এর জন্যে শোক—"

উজ্জয়িনীকে ইতিমধ্যেই রোগপাণ্ডুর দেখাচ্ছিল। সে দুর্ব্বলস্বরে বলল, "আমি যাব।"

"যাবে?" মহিমচন্দ্র কিছুক্ষণ অবাক থেকে বললেন। "কোথায় যাবে?"

উজ্জয়িনী কী বলতে চাইল, কিন্তু তার শোক তার বুক মথিত করছিল, সেই মন্থনের ফলে অশ্রু উদ্গত হচ্ছিল তার চোখ দিয়ে।

"কোথায় যাবে মা," মহিমচন্দ্র গদগদ স্বরে বললেন, "তোমার বুড়ো শ্বশুরকে ফেলে? আমার আর ক দিন! যোগী চলল, আমিও চলছি।" যাবার কথায় তাঁর এত কথা মনে উঠল। তাঁর গীতার উপদেশ গেল ভেসে। "মা গো, তুমি আমাকে রেখে যেয়ো না।"

উজ্জয়িনী তার শ্বশুরকে ভালো করে চিনেছিল। তিনি মাঝে মাঝে শিশুর মতো আকুল হয়ে পড়েন, সেটা তাঁর অভিনয়ও নয়।

কিন্তু সে কতক্ষণ? বস্তুত তাঁর প্রকৃতিতে কী একটা উপাদান কমতি পড়েছিল, কিম্বা একেবারেই ছিল না, যার দরুন কোনো মেয়ে তাঁকে ভালোবাসতে পারত না, কোনো প্রকার ভালোবাসাই তিনি নারীর কাছে পেতে পারেননি। না হয় তাঁর প্রতি স্নেহ, না মমতা, না প্রেম। যেন তিনি মানুষ নন, প্রাণী নন। যন্ত্র। তিনি বোঝেন কাজ, তিনি খোঁজেন উন্নতি। তিনি যে স্বার্থপর বা কৃপণ বা উৎপীড়ক তা নয়। তিনি যন্ত্রের মতো হৃদয়বস্তুহীন। যে পথ ধরেছেন সে পথে রেলগাড়ীর মতো চলেছেন। কে যে চাপা পড়ে মরল, কে যে ধাক্কা খেয়ে বিকল হল, তার তিনি কী জানেন? তাঁকে বুঝিয়ে বললে তিনি বুঝতেন, দয়া করতেন। কিন্তু উজ্জয়িনীরও তো একটা অভিমান আছে। সেও অবুঝ কম নয়।

"আমি যাব," উজ্জয়িনী এর বেশি বলতে পারল না।

"কোথায় যাবে?" মহিম জিজ্ঞাসু ভাবে প্রশ্ন করলেন।

"জানি না।"

"জান না!" মহিম তো অবাক। নাথুনির দিকে তাকালেন, ইমদাদের দিকে তাকালেন। ওরা তাকাল পরস্পরের দিকে। পাগল হয়েছে নাকি? বাপ কি কারুর মরে না? কলকাতা যাব কি দিল্লী যাব, একটা কিছু বলুক। তা না, জানি না!

"জান না কোথায় যাবে?" মহিম গম্ভীর ভাবে বললেন। "যাও, বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়। আমিও খবর দিই পণ্ডিত মশাইকে। তোমার পক্ষে অশৌচের কী বিধি সেটা জানতে হবে আগে।"

উজ্জয়িনী একটা প্রণাম করে রাখল। তিনি ঠাওরাতে

পারলেন না কী জন্য প্রণাম। পাগলামি আর কী! আহা, পিতৃশোক। তিনি উঠে গেলেন। তখন বাড়ীর মেয়েরা উজ্জয়িনীকে ধরাধরি করে নিয়ে গেল তার ঘরে। সেখানে তারা সুর করে কাঁদতে শুরু করে দিল, এতক্ষণ তাদের কান্নাটা ছিল চাপা।

উজ্জয়িনী তাদের বলল, "তোমরা আমার কাছ থেকে যাও।"

তারা কি নড়ে? তাদের কান্না পেয়েছে, তারা কাঁদবে, যেমন ক্ষুধা পেলে তারা খায়। তার থেকে তাদের বঞ্চিত করতে চাইলে তারা সায় দেবে কেন? গালে এক হাত দিয়ে আর এক হাত মাথায় চাপড়ে তারা জাঁকিয়ে বসল। অনেক দিন পরে এমন একটা মহাশোক এসেছে। ক্রন্দনের বুভুক্ষাও আর কোনো বুভুক্ষার চেয়ে ছোট নয়।

উজ্জয়িনীর সবশুদ্ধ এত বিশ্রী লাগছিল যে, সে শোক করবে, কি, রাগ করছিল। এ বাড়ীতে সে যে তার মহান শোক উদ্‌যাপন করবে সে জন্যে প্রাইভেসী ছিল না। সকলের সমক্ষে শোকাকুল হতে সে ঘৃণা করে। অথচ শোকাকুল না হলেও সে পাথর হয়ে যাবে।

তার ঘুম পাচ্ছিল, সে ঘুমের ভান করে পড়ে রইল। তাতে ফল হল। দাসীরা সদলে প্রস্থান করল।

তারপর কাঁদতে গিয়ে দেখে গলা শুকিয়ে গেছে, ভিতর থেকে যা আসছে তা একরকম হাঁপানির বেগ। শলা বিঁধে রয়েছে, যেখানে বিঁধে রয়েছে সেখানে হাত পৌছায় না। শোক তো মনের ব্যাপার। দেহ কেন আর্ত্ত হয়?

নেই, বাবা নেই। আমার সেই বাবাটি আর নেই। নেই—ছোট একটুখানি কথা। ওর হুল ভীমরুলের হুলের চেয়ে তীক্ষ্ণ। ওর দাঁত সাপের দাঁতের চেয়ে বিষাক্ত। নেই—তার উপর আপীল চলে না।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উলটে গেলেও তার নড়চড় হবার নয়। সংসারের সকল ধনকুবের তাদের সমস্ত ধন উৎকোচ দিলেও চিত্রগুপ্ত 'নেই'র জায়গায় 'আছে' লিখবে না।

কোথায় গেলে উজ্জয়িনী তার বাবার দেখা পাবে? স্বর্গে? কিন্তু মরলে যে তার স্বর্গলাভ হবেই এমন নিশ্চয় উক্তি কে করবে? তবে কি আর দেখা হবে না কোথাও—না মর্ত্যে না স্বর্গে? হে ভগবান, এই কি তোমার বিধান? পৃথিবীতে কয় দিনের জন্যে আমাদের দেখা, সেই আদি সেই শেষ? না, না, এত নিষ্ঠুর তুমি নও। আমাদের আবার দেখা হবে, যেখানে হোক, যেমন করে হোক। পুনর্জন্ম তো আছে। মানুষ না হয়ে পশু হলেও এক দিন বাবাকে আমার দেখে চিনব।

কিন্তু ততদিন কেমন করে বাঁচব? কোন্ আনন্দে বাঁচব? কানু, তুমি আমাকে বাঁচতে বল? আমার মতো দুঃখিনীর বেঁচে কী লাভ?

বাবা, না জেনে তোমার মনে কত কষ্ট দিয়েছি। জেনে তোমার কত দোষ ধরেছি। এই তো সেদিন পাটনায় তোমাকে কত অনাদর করেছি। তোমার দিকে ভালো করে তাকাই নি। সে খেদ আমার এ জীবনে ঘুচবে না।

উজ্জয়িনী তার বাবার মুখচ্ছবি তার হৃদয়ে দৃঢ় ভাবে মুদ্রিত করতে লাগল, যাতে মুছে না যায়। তার মনে হতে লাগল ইতিমধ্যেই কতক মুছে গেছে। যতবার তার বাবাকে সে দেখেছে, যতবার মানুষ মানুষকে দেখে—কোন বার তো শেষ বার বলে জানে নি ও জানে না। তাই কোন বার সম্পূর্ণ ছবিটি দেখে নি, দেখা হয় না। যে ছবি আঁকা হয় স্মৃতিপটে, তা সতত অস্পষ্ট, মৃত্যু তাকে আরো অস্পষ্ট করে, মৃত্যুর পরবর্তী কাল তাকে অস্পষ্টতর করতে থাকে।

বাবা! উজ্জয়িনী প্রাণভরে ডাকতে চায়। আজন্ম ডেকে তার সাধ মেটেনি। সাড়া পেয়ে তা মনে রাখেনি। বাবার কণ্ঠস্বর গ্রামোফোনে ধরে রাখতে পারা যেত, যেমন বাবার আকৃতি ফটোগ্রাফে। খেয়াল হয়নি। স্মৃতিকে পীড়ন করলে সেই রেকর্ড থেকে যে স্বর ওঠে তা অস্পষ্ট। মৃত্যু তাকে আরো অস্পষ্ট করেছে, পরবর্ত্তী কাল অস্পষ্টতর করবে। হায়, কী উপায়!

আমি যাব, উজ্জয়িনী আপন মনে বলল। আমি যাব যেখানে দু চোখ যায়। কানুর যদি করুণা হয় তো আমাকে ব্রজে নিয়ে যাবে। আমার একার চেষ্টায় ব্রজে যাওয়া কি সম্ভব? আর এ বাড়ীতে এক দিনও নয়। বাবা দিয়েছিলেন বলে এদের হয়েছিলুম, বাবা ছিলেন বলে এদের ছিলুম। নইলে এরা আমার কে? আমি বেরিয়ে গেলে বাবার মাথা হেঁট হবে না, তিনি মাথা উঁচু রেখেই চলে গেছেন। কলঙ্ক যা হবে তা আমার একার। তা হোক, আমি ডরাব না। টেনিসনের সেই কাব্যাংশ মনে পড়ে—বাবার বড় প্রিয় ছিল তার আবৃত্তি।

"My strength is as the strength of ten
Because my heart is pure."

স্ত্রীলোক যখন সর্ব্বহারা হয় তখনো সে খড়কুটা যাই পায় তাই সম্বল করে। পাথেয় না নিয়ে পথে পা দেয় না, সে পাথেয় যত অকিঞ্চিৎকরই হোক। উজ্জয়িনী মাতাজী মাসির অনুকরণে একটি পোঁটলার পক্ষে যথেষ্ট মাল জড় করল। থাকল তাতে কিছু কাপড় পুঁথি ও পট, মুখ হাত ধোবার সরঞ্জাম, ঘটি ও গেলাস। একখানা সতরঞ্চ ও একটা বালিশও নিল। একখানা হাতপাখা সমেত সে পোঁটলার আয়তন হল ধোপার গাধার পিঠের পোঁটলার মতো। কাজেই

'কিছু' কাপড় থেকে তিন পোয়া বাদ দিতে হল। তা সত্ত্বেও যা থাকল তাই পরে সাধারণ কন্যার সম্বৎসর কাটে।

আভরণ যা ছিল শরীরে তা মাত্র ক' খানা। তা খুলতে মায়া করল। যা ছিল আলমারিতে তা বন্ধ রইল। চাবির গোছা উজ্জয়িনীর জিম্মা। সেটা তোলা ছিল স্বতন্ত্র দেরাজে। সেটার কথা উজ্জয়িনী ভুলে গেল।

সে যে চলে যাচ্ছে তা জানিয়ে একখানা চিঠি লেখা সঙ্গত কি না ভাববার চেষ্টা করল। লিখতে রুচি হল না। বিদায় যখন মোকাবিলায় নিয়েছে পত্রমারফৎ নেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তা ছাড়া, লিখবেই বা কী? যারা অভিমান করে যায় কিম্বা যায় রাগ করে তাদের বক্তব্য পরিষ্কার। তারা ফিরে আসার আশা রাখে বলে পায়ের চিহ্ন রেখে যায়, তা থেকে তাদের অনুসন্ধান হয় সহজ। মানে মানে ফিরে আসার জন্যে তাদের চিত্ত উন্মুখ, তার ছাপ পড়ে তাদের বিরূপ বৈরাগ্যের অন্তরালে। উজ্জয়িনী ফিরবে না। তার অভিমান বা রাগ নেই। সে ভুল করেছিল এ বাড়ীতে এসে। ভুলের সংশোধন হোক, এই সে চায়। মহিমচন্দ্রকে সে ক্ষমা করেছে। পরের কাছে পরের মতো ব্যবহার পেয়েছে বই তো নয়। বাদলকে তার মনে পড়ে না। বাদল তো তাকে মনে রাখেনি। বাদল তার কেউ নয়, কানুই তার সর্ব্বস্ব। সে যাচ্ছে কানুর দেশে, অবশ্য কানু যদি পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে।

"যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে
যেখানে নিঠুর হরি।"

এই পদ মনে আসতেই উজ্জয়িনীর শোক যেন বাষ্প হয়ে অন্তর্হিত হল। পুলকে তার রোমাঞ্চ হতে থাকল। সে যেন বিবাহ-সভায় চলেছে, লগ্নের প্রাক্কালে।

"মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
খুঁজিব যোগিনী হঞা
যদি কারু ঘরে মিলে গুণনিধি
বান্ধিব বসন দিয়া!"

শ্রীকৃষ্ণের পট ততক্ষণে পোঁটলায়। উদ্দেশে বলল, "কানু, বাবার জন্যে শোক করতে গিয়ে তোমাকে যে ভুলতে বসেছিলুম। বাবা একদিন না একদিন যেতেন, তিনি মৃন্ময়। তুমি তো চিরকাল থাকলে, তুমি চিন্ময়। হয়তো ভালোই হল যে বাবা অকালে গেলেন। তিনি থাকলে কি আমার সাহস হত গৃহত্যাগ করতে?"

রাত্রের তৃতীয় প্রহর। ভজন করে ক্লান্ত হয়ে দূরের লোক ঘুমিয়েছে। পাড়া তার আগে থেকে নিস্তব্ধ। বাড়ীতে সকলে সকাল সকাল ঘুমতে যায়। মহিমচন্দ্র ভোরে উঠে সোর তোলেন। উজ্জয়িনী আকাশে চেয়ে দেখল। কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদ যত না আলোক দিচ্ছে তার বেশি দিচ্ছে ম্লানিমা। তখনো ডাকছে একটা কোকিল। কোকিলগুলোর মরণ নেই। গলা ফেটে খন খন করছে। পেঁচার মত কী একটা উড়ছে।

উজ্জয়িনী আন্দাজ করে দেখল পাহারাওয়ালারা নিকটে নেই। ধরা যদি সে পড়ে তবে বাড়ী থেকে বেরিয়েই নয়। তবু ধরা পড়ে শ্বশুরের সামনে আনা হতে তার উৎসাহ ছিল না। বরং সেকথা যতই ভাবছিল ততই ঘেমে উঠছিল।

"কানু, তুমি আমাকে বুদ্ধি দাও।"

এর উত্তরে কানু যে বুদ্ধি দিলেন তা অচিন্তনীয়।

উজ্জয়িনী লেশমাত্র ইতস্তত করল না। কাঁচি হাতে করে আয়নার

সামনে দাঁড়াল, অভ্যাসবশত চুলটা ঠিক করে নিল। তারপর সেই আলুলায়িত ঘন কেশের ভিতর দিল কাঁচি চালিয়ে।

পিঠ ছেড়ে পায়ে লুটাল নারীর গৌরব। তাতেও উজ্জয়িনী থামল না, মাথার সামনের দিকের চুল কাটা ফসলের মতো নামল। তখনো কাঁচি চলল কঁ্যাচকঁ্যাচিয়ে।

বাদলের বিয়ের ধুতি পাঞ্জাবি চাদর ছিল একটা পুরানো ট্রাঙ্কে। সেগুলোর সদ্ব্যবহার হবার আশা ছিল না। ছিল পড়ে এক কোণে। উজ্জয়িনী বিনা দ্বিধায় পুরুষ সাজল। তার গায়ে আঁট হচ্ছিল বাদলের পরিধেয়। কিন্তু তা নিয়ে চিন্তা করবার সময় ছিল না।

পোঁটলা খুলে একটা পুরানো হাতব্যাগের ভিতর পুরল যা কিছু নেবার। যা ধরল না তা রইল পড়ে।

এবার যখন সে আয়নার সামনে দাঁড়াল তখন তার মনে হল দিনের আলোয় যাই হোক, রাত্রের আবছায়ায় তাকে পুরুষ বলে ভ্রম হওয়া বিচিত্র নয়। কোনোমতে একবার ভোর হলে আর ভয় নেই। তখন সে সুযোগ বুঝে আবার নারী হতে পারবে।

ভূলুণ্ঠিত কেশরাশির দিকে চেয়ে সে একটিবার নিঃশ্বাস চাপল ও ছাড়ল। তারপর ভাবল, যার বাপ গেছে মরে, তার জীবনের মমতাই যথেষ্ট লজ্জা, কেশের মমতা কি তাকে মানায়!

চুলগুলিকে সঙ্গে নিল গঙ্গায় দিতে। এত কালের চুল। বাবা এগুলির উপর কতবার হাত বুলিয়ে দিয়েছেন। এগুলিও তো শরীরের অঙ্গ, শরীরজ।

আর একবার আকাশের দিকে চেয়ে দেখল রাত বেশি নেই। একটু পরে পারবতীয়ারা উঠে গঙ্গাস্নান করতে যাবে। তাদের

কাছে ধরা পড়ার সম্ভাবনা। অন্যান্যদের ঘুমও পাতলা হয়ে আসছে। তারাও টের পেতে পারে। অতএব এই তো লগ্ন।

"বাবা," উজ্জয়িনী বলল, "তুমি আর একবার সম্প্রদান করলে। এবার বৃহৎ সংসারের পরম নিয়ন্তার হাতে। তিনি পুরুষোত্তম। তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করবেন না।"

"কানু," উজ্জয়িনী বলল, "আমার আগে আগে চল।"

# তদন্ত

## ১

কমিশনার সাহেবকে ডিনার দিতে হবে, এই ভাবনা নিয়ে রায়বাহাদুরের নিদ্রাভঙ্গ হল। তখনো ভালো করে ভোর হয়নি।

ল্যাণ্ড রেভিনিউ য়্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে কী সব ভুল ছিল, কমিশনার ঘুরিয়ে দিয়েছেন। রায়বাহাদুর কমিশনারের উপর চটে রয়েছিলেন। আমার রিপোর্ট চিরকাল নির্ভুল হয়ে এসেছে, আজ এই কমিশনার বলেন কি-না ফিগার মিলছে না। তা হোক, ডিনারটা তো খান তিনি, ডিনারের পর কথায় কথায় শুনিয়ে দিতে হবে, সাহেব, তুমি ভুল করেছ নিজেই। মহিম সেন কাঁচা কাজ কাকে বলে জানে না। বিলাতে জন্মালে সে এতদিনে লাট বেলাট হত। তার মাথার সিকির সিকি পেয়ে কত লোক শুধুমাত্র বিলাতে জন্মানোর অজুহাতে কমিশনারি করে খাচ্ছে।

রায়বাহাদুর চাকরদের ডেকে তুললেন। "রোজ রোজ এ বেটাদের ঘুম ভাঙাতে হয়, যেন আমিই চাকর, এরা মনিব।" নাথুনি চোখ রগড়াতে রগড়াতে এসে তাঁকে তামাক দিয়ে গেল। মুখ ধোবার আগে তাঁর তামাকটি টানা চাই—এত বড় গড়গড়ার নল দিয়ে। তাতে মাথাওয়ালা লোকের মাথা খেলে। কমিশনার সাহেবের জানা উচিত যে, আমিও একদিন কমিশনার হবার দাবি রাখি। আমার রিপোর্টের উপর কলম ছোঁয়ায় কেটা। ভুড় ভুড় ভুড় ভুড় ভুড় ভুড়। কমিশনারকে ডিনারটা কিন্তু

খাওয়াতেই হবে। দেখে যাক আমি কী স্টাইলে থাকি। আমার বউমা আই এম এস অফিসারের মেয়ে। ছেলে আমার আই. সি এস. হল বলে। ভুড় ভুড় ভুড়। ওরে ও নাথুনি। বৌমেমসাব উঠেছেন রে?

উজ্জয়িনী একটু বেলা করে ঘর থেকে বেরয়। এখনো তার বেরবার সময় হয়নি। কিন্তু কমিশনারকে নিমন্ত্রণ করার ভাবনাটা চুকিয়ে ফেলা দরকার। সারাদিন তো ঐ কথা ভাবা যায় না। উজ্জয়িনীকে বললে পরে ভাবনাটা পাত্রান্তরিত হয়, সেটা তখন উজ্জয়িনীর, তাঁর নয়। বউমেমসাব উঠেছেন রে?

নাথুনি খোঁজ নিল। পারবতীয়া তার স্বভাবসিদ্ধ প্রগল্‌ভতার হাসি হেসে যা বলল তার মর্ম বহুজীর ঘরের দরজা তো খোলা, নিশ্চয় উঠেছেন, তবে কিনা তাঁকে ডাকা যায় না, তিনি স্নানবিশেষে। নাথুনি তার স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য সহকারে হুজুরের পায়ে নিবেদন করল, বউমেমসাব গোসলখানায়, খানিক পরে মোলাকাৎ হবে।

রায়বাহাদুর আবার তাঁর কর্ম্মচিন্তায় মনোযোগ করলেন। ভুড় ভুড় শব্দ উঠতে লাগল। নাপিত এসে নিত্যকার মতো দাড়ি গোঁপ কামিয়ে দিয়ে গেল, রায়বাহাদুর লক্ষ করলেন না। অভ্যাস মতো সারাদিনের কাজের একটা বিলিব্যবস্থা করলেন মনে মনে। তাতে কতকটা শান্তি বোধ করলেন। তারপর উঠে মুখ হাত খুলেন, ঘুরে এলেন। চাকরকে বললেন, লে আও তেল। তেল মালিস করা হতে লাগল সশব্দে। সেই অবসরে রায়বাহাদুর চোখ বুলিয়ে যেতে থাকলেন জমে যাওয়া ফাইলে।

স্নানের পর তাঁর স্মরণ হল উজ্জয়িনীকে বলতে হবে কমিশনারকে

নিমন্ত্রণ করতে। চা তিনি অফিস ঘরে বসে খান, উজ্জয়িনীকে সেইখানে আসতে সেলাম দিয়ে পাঠালেন।

কিন্তু কোথায় উজ্জয়িনী। তার শোবার ঘর খোলা। উঁকি মেরে দেখল পারবতীয়া উজ্জয়িনী বিছানায় নেই, বিছানাই নেই। গোসলখানায় এতক্ষণ কেউ থাকে না, থাকলে সেটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। পারবতীয়া পা টিপে টিপে গেল তার দরজার কাছে। কান পেতে শুনল—নিস্তব্ধ। ঈষৎ ফাঁক করে দেখল কেউ নেই। তা হলে কোথায় বহুজী।

নীচে উপরে প্রত্যেক ঘরে, তারপর বাগানে, তারপর আশে পাশে খোঁজ করা গেল। কোথায় বউমেমসাব! এমন তো কখনো হয় না।

"হুজুর," নাথুনি মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, "বৌমেমসাবকা পত্তা নেহি লগতা।"

"ক্যা বোলতা হৈ, উল্লু।" রায়বাহাদুর গর্জে উঠলেন। "নাও, জরুর সলাম দো।"

নাথুনি খুলে বলল। রায়বাহাদুর বিশ্বাস করলেন না। শাসিয়ে বললেন গর্দ্দান নেবেন। ডাকলেন ইমদাদকে, রামনিহোরাকে, শত্রুঘনকে, মালীকে, গোয়ালাকে। সবাইকে বললেন, যে বউমেমসাবের সন্ধান এনে দেবে সে নাথুনির কান নিয়ে যা খুশি করতে পারবে। তারা চলল প্রতিবেশীদের বাড়ীতে। যদিও যায় না উজ্জয়িনী সেসব জায়গায় তবু গিয়ে থাকতেও তো পারে পিতৃশোকে সান্ত্বনা পেতে।

চাপরাসীরা বকশিষের লোভে হুকুম নিয়ে ছুটল মীরা ব্যানার্জির বাড়ী জামালপুর, যদিও বহুদিন উজ্জয়িনী ওমুখো হয়নি বলে তারা জানে।

যেন কিছুই হয়নি, শীগগির সব ঠিক হয়ে যাবে। রায়বাহাদুর খবরের কাগজে মশগুল হলেন। এক একখানা করে কার্ড আসতে থাকল দর্শনপ্রার্থীদের। রায়বাহাদুর তাদের বসিয়ে রাখলেন, কার্ড তো টিকিট নয় আর তাঁর অফিস কামরা তো সার্কাস নয় যে টিকিট দিলেই ঢুকতে পারা যাবে।

দুপুরের দিকে তাঁর কাছারির সময় হলে তাঁর মনে পড়ল উজ্জয়িনীকে খুঁজতে বাড়ীর বেবাক লোক বেরিয়েছে। তাই তো। বউমা কি সত্যই নেই! কাল তার বাপ মারা গেছে—বড় দুঃখের বিষয়! জীর্ণানি বাসাংসি। কী করা যায়? প্রকৃতির বিধান। বেচারা যোগানন্দ। আর দু-এক বছর বাঁচলেও পারত। জামাইয়ের সাফল্য প্রত্যক্ষ করে যেত। জামাইয়ের সাফল্য মানে মেয়ের সুখের গ্যারাণ্টি। যোগানন্দ আর ছয় মাস বেঁচে থাকলে কত আনন্দই করত। যাক্, তার মারা যাবার খবর পেয়ে বউমা কোথাও গেছে শোক ভুলতে। কাল গীতা শুনে মন মানেনি। ভেবেছে গল্প করলে মন মানবে। অবোধ। বোঝে না যে গীতাছাড়া গতি নেই। অবশেষে গীতারই শরণ নিতে হবে। আমি আবার তাকে গীতার ব্যাখ্যা শোনাব। দেখি আজ সন্ধ্যায় অন্য কোনো এন্‌গেজমেণ্ট আছে কি না।

কাছারিতে তাঁর দূতেরা একে একে গিয়ে জানাল তাঁর বউমা এখানে নেই, ওখানে নেই, সেখানে নেই। তারা প্রতিবেশীর বাড়ী খুঁজতে বেরিয়ে সারা শহর খুঁজে এসেছে। তখন রায়বাহাদুরের চেতনা হল। ডুবে মরেনি তো? বলছিল, আমি যাব। তার মানে কি এই যে, আত্মহত্যা করব! রায়বাহাদুর আঁতকে উঠলেন।

যে সব গুণের দ্বারা তিনি উন্নতি করেছেন, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তার একটি। মনের আতঙ্ক প্রচ্ছন্ন করে মুখের অকুতোভয়তা তার আর একটি। তিনি ভারি আশ্চর্য হয়ে বললেন, "তোরা সারা দিন এই করে নষ্ট করলি! বউমার খোঁজ আমি রাখি না, তোরা আমাকে এনে দিবি! এত বড় জেলা চালাচ্ছি কার বুদ্ধিতে? যা, যা, কাজ কর।"

তৎক্ষণাৎ তিনি পুলিশ সাহেবকে ফোন করলেন। তিনি উপস্থিত হলে তাঁকে বললেন, "ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অপ্রকাশ্য। মোর দ্যান্ কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল। সিক্রেট।"

সাহেব ভেবেছিলেন টেররিস্‌ম্ হবে। রায়বাহাদুরের আরো কাছে সরে বসলেন, উৎকর্ণ হয়ে। রায়বাহাদুর অবিচলিতভাবে বলে যেতে লাগলেন, মিস্টার বাদল সেন লণ্ডনে আই. সি. এস. পরীক্ষার্থী। তাঁর স্ত্রী উজ্জয়িনী ক্যাপ্টেন ওয়াই. গুপ্ত আই এম এসের কন্যা। বড় দুঃখের কথা ক্যাপ্টেন গুপ্ত কাল কোয়াটায় মারা গেছেন। মুঙ্গেরে খবরটা পেয়ে উজ্জয়িনী কাল এত বেশি অস্থির হয়ে পড়ে যে বলে, আমি যাব। তাকে জিজ্ঞাসা করে তার বেশি উদ্ধার করা গেল না। ও কিছু নয়, মেয়েলি ভাবপ্রবণতা, মনে করে রায়বাবাহুর সাবহিত হননি। আজ সকলে টের পেলেন উজ্জয়িনী নেই। চারদিকে লোক পাঠিয়ে জানলেন কারুর বাড়ী যায়নি। আশঙ্কা হয়, শোকে তার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে সাময়িকভাবে। ঝোঁকের মাথায় আত্ম-হত্যা করেছে। জলে ডুবেছে কি ট্রেনের নীচে চাপা পড়েছে একবার গুপ্ত অনুসন্ধান করতে হবে। মৃত্যু-সংবাদ যাতে প্রচার না হয়। তা না করলে ক্যাপটেন গুপ্তের স্ত্রী—তিনি আবার স্যার ভূপতি সেনের নিকট-সম্পর্কীয়া ভগিনী—দ্বিতীয় শোকের আঘাত সহ্য করতে পারবেন না। তাঁর একটা কিছু ঘটবে।

পুলিস সাহেব আবেগের সহিত বললেন, "হেভ্‌ন্‌স্‌।"

রায়বাহাদুর নিজের ঠোঁটে একটি আঙুল ছুঁইয়ে বললেন, "মাম্‌ ইজ দি ওয়ার্ড্‌, মিস্টার এলিস্‌।"

মিস্টার এলিস বললেন, "হুম্‌।" তাঁর ঠোঁট ও চিবুক এক হয়ে গেল।

সাহেবকে বিদায় দিয়ে রায়বাহাদুর দুই হাতে মাথা চেপে ধরলেন। কাল কমিশনার আসছেন, আজ এই বিপদ। ডিনারটা মাঠে মারা গেল। যাক্‌, তার জন্য তত ক্ষোভ নেই, এখন আত্মহত্যাকে কী করে চাপা দেওয়া যায়। ম্যাজিস্ট্রেটের বউমা আত্মহত্যা করেছে। কাগজওয়ালারা যেমন বিচ্ছু, ভারতবর্ষের হেন কাগজ নেই যাতে এ খবর বেরবে না যদি একটিবার জানাজানি ও জানাজানি থেকে কানাকানি হয়! খবরটা ছড়ালে কেবল যে গুপ্তজায়ার প্রাণ যাবে তাই নয়, সেনবংশেরও মান যাবে। রায়বাহাদুর বিক্রমপুরের সেন। সে অঞ্চলে এখনো তাঁর বুড়ী মা ও পৃথগন্ন ভাইরা আছেন। এতদিন রায়বাহাদুর ছিলেন তাঁদের গৌরব, এই ঘটনার পর হবেন তাঁদের কলঙ্ক। আর এই মুঙ্গেরের লোক কী ভাববে। কই, কোনো ইউরোপীয়ান অফিসারের বাড়ীর মেয়ে তো আত্মহত্যা করে না। করলেও তাদের বিবেচনা আছে। করে ইংলণ্ডে গিয়েই। এই হতভাগ্য দেশী অফিসারের বউমা যেন শ্বশুরকে অপদস্থ করবে ভেবে আত্মহত্যা করেছে ঠিক তাঁর এলাকার ভিতরে। এই যে এলিস সাহেব এই বা কী ভাববে! এক চোখ বুজে হাসবে না? ভাববে না যে নেটিবরা আত্মহত্যা করবে, তাও নেটিবদের দেখিয়ে?

গীতায় এ খেদের সান্ত্বনা নেই। রায়বাহাদুর ফাইলের মধ্যে ডুব মারলেন। বাসায় ফিরে ভাষা হারালেন। কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল ক্লার্ক

ছাড়া কেউ তাঁর সাথে রইল না। তাকে ইঙ্গিতে ডেকে হুকুম করলেন, "তিনবার ঘুরিয়ে এস-পি.র সঙ্গে কনেকৃশন কর।" টেলিফোনে পুলিশ সাহেবকে পেয়ে কাতরভাবে সুধালেন, "এনি ইন্‌ফর্মেশন ?"

এলিস সাহেব ওপার থেকে বললেন, "সরি, নান্ সো ফার।"

রায়বাহাদুর আরামকেদারায় শুয়ে পড়লেন। কমিশনারকে কোন্ প্রাণে অভ্যর্থনা করবেন, শরীরে উত্তম নেই। হায়, মানুষ ভাবে এক, মেয়েমানুষ করে আর। এমনি তরলমতি তারা, এতই ভাবপ্রবণ। বাপ মারা গেছে বলে করে বসল আত্মহত্যা, যেন বাপ ছাড়া আর কেউ নেই—যেন বাপের-চেয়ে-আপনার শ্বশুর নেই, আপনার-চেয়ে-আপনার স্বামী নেই। মনে পড়ে বাদলের মাকে। তিনিও ছিলেন একেবারে মেয়েমানুষ। যখন অসুখ বাধানো উচিত নয়, অসুখের জন্যে স্বামী প্রস্তুত নয়, স্বামীর উপরওয়ালাকে নিয়ে স্বামী উদ্‌ভ্রান্ত, তখনি বাধিয়ে দিলেন এক নশ্বর অসুখ। অসাবধানতায় ও অবাধ্যতায়, এক হয়ে দাঁড়াল দুই তিন চার। ভুগলেন, ভোগালেন, ছুটি নিতে প্রায় বাধ্য করেছিলেন আর কী! গবর্নমেণ্টের কাছে মুখ দেখানো দায় হত। গবর্নমেণ্ট বলত, কী রায়বাহাদুর, তুমিও সকলের মতো কাজে ফাঁকি দিতে চাও! ছুটি নেয় কারা? যারা পিঁজরাপোলের গোরু। স্ত্রীর মৃত্যুতেও রায়বাহাদুর ছুটি নেননি, পাছে রেকর্ড খারাপ হয়, পাছে উন্নতি আটকায়।

এত দিনে আমাকে বুঝি নিতেই হল ছুটি। মুঙ্গেরের লোক আত্মহত্যার কী জানি কী কারণ সমঝাবে। তাদের মুখে হাত দেওয়া বাঘা হাকিমেরও সাধ্য নয়। ছুটি নিয়ে বদলি ছাড়া গতি নেই। তার মানে রেকর্ড খারাপ হবে। গভর্নমেণ্ট বলবে, কী রায়বাহাদুর, বড় যে কমিশনার হবার সাধ! কমিশনার হয় কারা?

হায়, মেয়ে, তোমার যদি এক রতি দায়িত্বজ্ঞান থাকত! তবে তুমি মেয়ে না হয়ে পুরুষ হতে।

২

সন্ধ্যাবেলা পুলিশ সাহেব নিজে এসে খবর দিলেন লাশ পাওয়া গেছে, সনাক্ত করতে হবে চুপি চুপি। পাওয়া গেছে মাইল দশেক দূরের একটা গ্রামে, তবে জলে ডুবে নয়, ট্রেনের নীচে পড়ে নয়, বিষ খেয়ে।

রায়বাহাদুর বললেন, "লাশ সনাক্ত করতে যাচ্ছি একথা যেন না রটে। যাচ্ছি কমিশনার সাহেবের জন্যে শিকারের বন্দোবস্ত করতে। ওদিকে বাঘটাঘ দেখা যায় কি? মনে মনে যোগ করলেন অবশ্য এ জেলাতে মাত্র একটি বাঘ আছে, সে আমি।

বাসার সবাইকে উচ্চ স্বরে জ্ঞাপন করলেন, বাঘ শিকারের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছেন। সাহেবকে সঙ্গে নিতে চাইলেন। কিন্তু সাহেব কি ব্রিজ কামাই করতে পারেন? ব্রিজ না খেলতে পেলে তাঁর রজনী ব্যর্থ। চড়া স্টেকে খেলেন। বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেন ডিনার খেতে। তারপর বলেন. একহাত হোক। হতে হতে অনেক হাত হয়, অনেক রাত হয়, অতিথি দশবিশ টাকা হেরে দু-তিন টাকার মাল খেয়ে ফেরেন।

রায়বাহাদুর একজন বিশ্বাসযোগ্য পুলিশ অফিসার সমভিব্যাহারে শিকারের আয়োজন করতে মোটরে রওনা হলেন। এক জায়গায় আর একজন পুলিশের লোক তাঁর মোটর থামিয়ে নিবেদন করল, হুজুর, এখান থেকে আধ মাইল দূরে একটি স্ত্রীলোকের লাশ পাওয়া গেছে।

সুরতহাল করা দরকার। হুজুর যখন দয়া করে এদিকে এসেছেন, হুজুর করলেই সবচেয়ে ভালো হয়। আমি ঘোড়া আনিয়ে দিচ্ছি, মোটর আর যাবে না।

রায়বাহাদুর শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, আমি শিকারের খবর নিতে এসেছি, আমাকে এসব বাজে কাজ করতে ডাক কেন? তোমার আক্কেল নেই?

সেও শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, হুজুরের শিকারের ক্ষতি হলে অধীন অতীব দুঃখিত হবে। কিন্তু এই কেসটা বড়ই সন্দেহজনক। পরে হয়তো হুজুরই কৈফিয়ৎ তলব করবেন। তাই হুজুরকে জানানো।

রায়বাহাদুর নাচার ভাবে বললেন, চল, যখন ছাড়বে না। কই, ঘোড়া কোথায়?

ঘোড়া কাছেই ছিল। চিঁহিঁ করে উঠল। রায়বাহাদুর চললেন ঘোড়ায় চড়ে। পুলিশের দুজন অফিসার চলল পায়ে হেঁটে। সময় বাঁচল না, ইজ্জৎ বাঁচল।

রায়বাহাদুর ভূতের ভয় করতেন না। তবু তাঁর পা দুটো ঠকাঠক করে ঘোড়ার গায়ে ঠেকতে থাকল, শরীর তাঁর ঘন ঘন কাঁপতে থাকল। গিয়ে কী দেখবেন! যে উজ্জয়িনী জীবনের হিল্লোল তুলে কাল ছিল তাঁর বউমা, আজ সে জঙ্গলের লাশ! পিঁপড়ের সারি লেগেছে তার মুখের ফেনা পর্য্যন্ত। তার চোখের তারা আকাশের তারার মতো জ্বল জ্বল করে না, তার অর্দ্ধেক ইতিমধ্যে গলে গেছে। বিকট ভয়াবহ পরিণতি।

রায়বাহাদুর মনে মনে গীতপাঠ করলেন। ফল পেলেন না। যতই তিনি এগিয়ে যেতে থাকলেন মৃত্যুর দৃশ্যের দিকে, ততই সে দৃশ্য তাঁর কল্পনায় জেগে যেতে থাকল।

ম্যাজিস্ট্রেট চলেছেন এই পথ দিয়ে। কেমন করে রাষ্ট্র হয়ে গেল। তাঁর পিছু পিছু সেই অন্ধকারে যেন মিছিল বেরল। যেন তিনি মিছিলের চালক। যেখানে তিনি পৌঁছলেন সেখানেও লোক জড় হয়েছিল দেদার। একটা সোর উঠল, হট যাও, হট যাও। দফাদার চৌকিদার অতিরিক্ত কর্ম্মতৎপর হয়ে ঠেলে নিয়ে গেল জনতাকে। দাঙ্গা বাধবার উপক্রম। বচসা সপ্তমে উঠল।

হাকিম বাহাদুর শিকারে বেরিয়েছিলেন, পথি নারী বিবর্জিতা শুনে তাঁর সন্দেহ হল, তাই তিনি স্বয়ং এসেছেন সুরতহাল করতে। হট যাও, হট যাও। সেলাম কর।

পাঁচ শ হাতের সেলাম রায়বাহাদুর এক হাতে লুফলেন। কয়েক পা এগিয়ে যেতেই দেখলেন কী একটা লম্বা জিনিস সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা। তাঁর হৃৎপিণ্ডটা হঠাৎ যেন নিখোঁজ হয়ে গেল।

তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যে চোখ বুজে বুকে হাত বুলালেন। চেয়ে দেখলেন দারোগার ইঙ্গিতে একটা ডোম মড়ার মুখের ঢাকা সরাচ্ছে। রায়বাহাদুরের মনে হল বিছানায় শুয়ে দুঃস্বপ্ন দেখছেন, সব অলীক। কে ঐ মেয়েটা? উজ্জয়িনী? না। দেখতে দেখতে বদলে যাচ্ছে স্বপ্নে যেমন হয়। বিবর্ণ কালো মুখ, বিষের ক্রিয়া তাকে করাল করেছে। এ কখনো উজ্জয়িনী নয়।

রায়বাহাদুর আরো এগিয়ে গেলেন। চৌকিদার আলোটা আরো বাড়িয়ে দিল।

দুঃস্বপ্ন! কী দেখছি! এই কি সেই! এই কি আমার বউমা! হতে পারে। অসম্ভব নয়। কিন্তু এ তো বাঙালী নয়। এর গড়ন অন্য ছাঁদের! এর বয়সও তো বেশি বলে বোধ হচ্ছে।

রায়বাহাদুর ভাবলেন মৃত মানুষের বয়স একটু বেশি মালুম হয়ে থাকে। গড়নও বদলায়।

এমন সময় তাঁর কানে গেল ওরা সব বলাবলি করছে, শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করে এই কাণ্ডটি বাধিয়েছে, নইলে ওর মরার কারণ ছিল না, ওর স্বামী পার্ব্বতীপুরে রেলের চাকরি করে, পুলিশের চাকরি, তাই ওকে নিয়ে যেতে পারে না।

রায়বাহাদুরের নিরুদ্দেশ হৃৎপিণ্ড যথাস্থানেই অনুভূত হল। দুঃস্বপ্নও গেল কেটে। তাঁর আর সন্দেহ রইল না যে, লাশ একজন ছত্রী স্ত্রীলোকের। উজ্জয়িনীর সঙ্গে কিসের সাদৃশ্য? হা হা হা হা। সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। আধখানা কি সিকিখানাও সে মানুষ নয়। দেখ না, ওর নাকে কত বড় একটা নথ।

"সাব ইনস্পেক্টর," রায়বাহাদুর গর্জন করলেন, "লুক হিয়ার।"

শুধু দারোগা কেন যাবতীয় দর্শক মনোযোগের পরিমাণ বাড়িয়ে দিল। রায়বাহাদুর তর্জ্জনী চালনা করে বললেন, "ইস্‌কো কৌন পৈছানতা হৈ?"

চার-পাঁচজন লোক চৌকিদারের হাতের বেড়া ভেঙে ছিটকে পড়ল। "হুজৌর!"

ওরা ও আরো অনেকে এক স্বরে বলে গেল, এ মেয়ের নাম সখী। এর বাপ ধনুক ধারী সিং, এর বিয়ে হয়েছে বুলাকির সাথে। এরা ছত্রী। এদের একজনের বাড়ী লালদরজায়, অপরের রোশনপুরে। ইত্যাদি।

একজন উদ্যোগী হয়ে শাশুড়ীকে খবর দিয়েছিল। সে আধ মাইল দূর থেকে রায়সা চিৎকার করে শোক জাহির করছিল যে রায়বাহাদুরের যেটুকু সন্দেহ ছিল সেটুকুও বিষ খেয়ে মরল। তিনি

গীতার একটা শ্লোক আবৃত্তি করে বললেন, "যা হবার তা হবে। তা হয়েছে। এখন একে সংকার কর।"

জনতা বলাবলি করল, এমন হাকিম দেখা যায় না। শাস্ত্র জানেন।

দারোগা বলল, "তা হলে সুরতহাল রিপোর্ট আমিই লিখি, সার।"

রায়বাহাদুর ঘোড়ায় উঠে বললেন, "ইট ইজ ইওর ডিউটি।"

আবার তেমনি হেমলিনের বেহালা বাদকের মতো তিনি আগে আগে চললেন, গ্রামশুদ্ধ পিছু পিছু চলল। পাকা রাস্তায় পড়ে রায়বাহাদুর ঘোড়া দাঁড় করালেন। ইংরেজিতে একটি নীট লিট্‌ল স্পীচ দিয়ে বললেন, তোমাদের রাজভক্তি আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। একজন ইংরেজিনবীশ সেটি মুখে মুখে তর্জমা করে সবাইকে শোনাল। তার ফল হল এই যে, সেই রাত্রে অন্তত সতের জন লোক পাওয়া গেল যাদের একটা না একটা দরবার ছিল। কেউ বলে খাজনা দিতে পারছে না বলে তার ভিটায় ঘুঘু চরতে আসছে। কেউ বলে মহাজন ডিক্রি পেয়েছে, এইবার গ্রাম ছাড়তে হবে, বঙ্গাল মুলুক তার আশ্রয়।

রায়বাহাদুর মোটরের দরজা বন্ধ করে বললেন, "চালাও।"

শিকারের আয়োজন গেল চুলোয়। রায়বাহাদুর বাড়ী ফিরলেন। তাঁর মনে একটা নূতন সংশয় উদিত হয়েছিল। উজ্জয়িনী যে যাব বলছিল তা কোন্ অর্থে? সূক্ষ্ম অর্থে, না, স্থূল অর্থে? এমন হতে পারে যে, সে আত্মহত্যা করেনি, সে চলে গেছে নির্দ্দিষ্ট কোনো স্থানে—কোয়েটায় কি কলকাতায় কি সিমলায়—যেখানে তার আত্মীয়রা আছেন।

রায়বাহাদুর উজ্জয়িনীর আত্মীয়দের ঠিকানায় টেলিগ্রাম করলেন।

একটু সতর্ক ভাষায়! উজ্জয়িনী যে নিরুদ্দিষ্টা সে কথা ফাঁস করলেন না। লিখলেন, উজ্জয়িনী আপনার ওখানে পৌঁছেছে আশা করি।

সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না—এই হচ্ছে রায়বাহাদুরের পলিসি। তিনখানা টেলিগ্রাম এই পলিসি শিরোধার্য করে বোঁ বোঁ করে কোয়েটায় সিমলায় কলকাতায় ছুটল। রায়বাহাদুর সোফায় শুয়ে শিকার করার উল্লাস অনুভব করলেন। নিশ্চয় এর এক জায়গায় উজ্জয়িনী গেছে। যাবে আর কোথায়! যার যে পর্যন্ত দৌড়। ওরে, তুই আমার চোখে ধূলা দিবি, সেদিনের মেয়ে। আমি একটা জেলার মালিক, রাজপ্রতিনিধি। বয়সও হল বড় কম নয়, অনেক দেখেছি, অনেক ঠেকেছি, অনেক শিখেছি, আমার জানতে কি বাকি আছে কোনো জিনিস!

রায়বাহাদুর পুলিশ সাহেবকে ফোন করে জানালেন, ও উজ্জয়িনী নয়। মৃতদেহের খোঁজ চলতে থাকুক। তবে আমার মনে একটা নূতন থিওরীর উদ্গম হয়েছে। সেটা এই যে, উজ্জয়িনী হয়তো পাগল হয়ে তার মায়ের কাছে কিম্বা দিদির কাছে চলে গেছে, পাছে আমি যেতে না দিই, তাই আমাকে জানায়নি, আমার অনুমতি চায়নি।

সাহেব সহানুভূতিভরে সমর্থন করলেন এই থিওরী। তাঁর তা ছাড়া করণীয় কিছু ছিল না।

উজ্জয়িনী বেঁচে আছে ও যেখানে হোক এক জায়গায় গেছে, এই আত্ম-আশ্বাসনা রায়বাহাদুরকে সুনিদ্রা দিল। তিনি পরদিন প্রহৃষ্ট চিত্তে কমিশনারের অভ্যর্থনা করলেন। একটা ডিনারও দিলেন পরের খবরদারিতে।

৩

টেলিগ্রামের উত্তর এল প্রথমে কলকাতা থেকে: উজ্জয়িনী আসেনি। কখন বেরিয়েছিল, কোন্ রাস্তায়? পথে কোথাও নামবার কথা ছিল কি? ডলি এখন সিমলায়।—মিটার।

তারখানা পেয়ে মহিমচন্দ্র একগাল হাসলেন। মন্মথ মিত্তির তো বদ্যির ছেলে নয়। কতই বা বুদ্ধি তার ঘটে। বদ্যি আর বুদ্ধি—দেখ না কেমন সাদৃশ্য। কায়েতের পো ঠাওরেছে আমি তাকে সবিস্তারে জানাব কবে কোন্ রাস্তায় আমার বৌমা মিত্তিরের বৌকে দেখতে গেছে। তাই যদি আমি জানতুম তবে তার করতুম কেন? চিঠি লিখলে কি তোমাদের ব্যারিষ্টোক্রেসীর পক্ষে বেতালা হত। আরে ঢের দেখেছি ব্যারিস্টার। বাংলা বেহারে ব্যারিস্টার আছে শ সাতেক, ম্যাজেস্টার আছে ক'জন? আমার মতো জনা পঞ্চাশ। হো হো হো হো!

এ হল কমিশনারের আসার দিন। কমিশনার মহিমচন্দ্রের কাজের তারিফ করে সেই দিনই বিদায় হলেন। পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে গেলেন, "রায়বাহাদুর, ইওর এক্‌স্‌পিরিয়েন্স ইজ গ্রেটার দ্যান মাইন।"

পরদিন প্রত্যূষে এল সিমলার জবাব: উজ্জয়িনী আসছে জেনে সুখী। কোন্ ট্রেনে দিল্লী পৌছাবে?—চ্যাটার্জি।

বামুনের ছেলে ভাবিয়ে তুলল। তা বলে সেই একা বামুন নয়। আমরা বদ্যিরাও যে বামুন তা প্রমাণ হয়ে গেছে। কাজেই চাটুজ্যে ও সেন সমান হয়ে গেছে।

মিত্তির সোজাসুজি বলেছিল উজ্জয়িনী আসেনি। তাই তাকে

আবার তার করার দরকার হল না। চাটুজ্যে আসল খবরটুকু হাতে রেখেছে। তার না করলে বার হবে না। কিন্তু এদিককার আসল খবরটুকু যেন হাত থেকে না ফসকায়।

মহিমচন্দ্র চাটুজ্যেকে তার করলেন: দিল্লী ইতিমধ্যেই পৌঁছে থাকা সম্ভব।

মনে মনে হাসলেন। সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি।

বাকি থাকে কোয়েটা—তবে কোয়েটা যেতে এত সময় লাগে যে উজ্জয়িনী তার অভিমুখে গিয়ে থাকলে লাহোর পার হয়নি। কোয়েটার জবাব এলেই বা কী! না এলেই বা কী। মিসেস গুপ্তের সঙ্গে বুদ্ধির যুদ্ধ করতে মন সরে না। আহা বেচারি। চমৎকার মানুষ। মেয়েদের মধ্যে ওঁর সমকক্ষ নেই। পূজা করতে ইচ্ছা হয় ওঁকে। কেমন স্মার্ট, কেমন সুন্দর, কী রিফাইন্ড্! আর ইংরেজি যা বলেন তা শুনে তৃপ্তি হয়। আমার বৌমা তার মায়ের মতো হবে এই প্রত্যাশায় তাকে বৌমা করা। আরে রাম। রাণীর গর্ভে কাঠের পুতুল! ঐ মিত্তির হতভাগা ভাগ্যবান। ডলির নাম যাই হোক মায়ের নাম রাখবে সে-ই। লিলিও খুবসুরত। তবে কেমন যেন একঘেয়ে। যা হোক, ও দুবোনের প্রাণ আছে। আর এটা!—কাঠের পুতুল। কতকটা তার শাশুড়ীর মতো। ভেবেছিলুম যোগানন্দের বাড়ী থেকে মেয়ে আনলে যাচাই করা মেয়ে পাওয়া যাবে। হরি, হরি! কাঠের পুতুল।

কোয়েটাও নীরব রইল না। প্রশ্ন করল, উজ্জয়িনী কার সঙ্গে আসছে, কেন আসছে? আমি নিজে সিমলা যেতে উদ্যত। তার জন্য কতদিন অপেক্ষা করতে হবে?

মুঙ্গের প্রশ্ন শুনে হতভম্ব।

কী উত্তর দেওয়া যায়! মিসেস গুপ্তকে প্রাণ ধরে ঠকানো যায় না। তিনি যে মহিমচন্দ্রের আরাধ্যা। অথচ সত্য বলতেও ভরসা হয় না, যদি সামলাতে না পারেন, মারা যান। উভয়সঙ্কট। মহিমচন্দ্র ভেবে দেখলেন, এর সহজ সমাধান, সবুর করা। ইতিমধ্যে সিমলা কিম্বা কলকাতা থেকে বার্ত্তা পাওয়া যাবে—উজ্জয়িনী পৌঁছে গেছে। হয়তো কোয়েটা থেকেই। প্রশ্নের উত্তর না পেলে মিসেস গুপ্ত উদ্বিগ্ন হবেন, কষ্ট পাবেন, কিন্তু মারা তো যাবেন না।

ওদিকে সিমলা থেকে জরুরি তার এল দিল্লীতে উজ্জয়িনী নামেনি। আর কলকাতা থেকে মিটার জানালেন তিনি মুঙ্গের হয়ে সিমলা যাচ্ছেন, অমুক সময় পৌঁছাবেন।

মহিমচন্দ্র সেই গ্রীষ্মকালে সরষে ফুল দেখলেন। মিত্তির ভদ্রলোক নয়, অর্থাৎ শুধু তার করে তার না পেয়ে চিঠি লিখে চিঠি না পেয়ে নিরস্ত হবার পাত্তর নয়। ভদ্রলোকের কাজ কাগজ কালো করা, কাগজের বাইরে যে জগৎ তা ছোটলোকের। আজ্ঞাবহের। অর্ডারলির।

মহিম ভাবলেন মিত্তিরের পোকে বঙ্কির মাথার খেলা দেখিয়ে দিলে হয়। কিছু করতে হবে না, খুব যেন কাজের তাড়া, তাই মফঃস্বলে যেতে হবে। মিটার সাহেব এসে কাউকে না পেয়ে শুকন মুখে ফিরে যাবেন। অবশ্য যাতে শুকন পেটে না ফেরেন সে ব্যবস্থা থাকবে।

কিন্তু তা হলে তো ব্যারিস্টার সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের প্রতাপ প্রত্যক্ষ করলেন না। মিটার আসুক, এসে দেখুক সেনকে কত লোক বাঘের মতো ভয় করে, বাদশাহের মতো মান্য করে। হোক

একটা সান্ধ্য পার্টি। সেন যে কেমন অতিথিবৎসল তার স্মৃতি মিটারের সম্বল হোক।

শেষাবধি দাঁড়াল এই যে মিত্তির এসে বললেন, "হাতে মোটে একটি ঘণ্টা সময়। ব্যাপারটা বাস্তবিক কী?"

মহিমচন্দ্র পুরোনো ঘুঘু। তিন কোয়ার্টার কাল আবোল তাবোল বকে মিষ্টি মদ খাইয়ে মিত্তিরকে তাড়া দিয়ে বললেন, "গাড়ীর সময় যে হল, মাই ইয়ং ফ্রেণ্ড।"—অবশ্য ইয়ং ফ্রেণ্ডের বয়স তাঁর নিজের বয়সের কাছাকাছি।

মিত্তির ফস্ করে শুধালেন, "ভালো কথা, বেবী হঠাৎ কলকাতা গেল কেন? আর গেল যদি তবে পৌঁছাল না, এর মানে কী?"

মহিমচন্দ্র এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন। বিনা বাক্যব্যয়ে রুমাল লাগালেন চোখে। মাথাটা একটু নেড়ে গলাটা একটু ভারি করে বললেন, "আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না। যোগানন্দ চলে গিয়ে আমাকে কী বিপদেই ফেলে গেছেন। তাঁর মেয়ে বলে, আমি যাব। আমি বললুম, মানুষের শরীর, জীর্ণ বস্ত্র। শোক করে কী হবে। সে তত্রাচ বলে, যাব। আমি শুধাই, কোথায় যাবে? সে জবাব দেয় না। ভাবলুম ছেলেমানুষী খেয়াল। ঘুমুতে গেলুম। পরদিন শুনি সে নেই। খোঁজ খোঁজ খোঁজ। কার বাড়ী গেছে? কারুর বাড়ী যায়নি। তবে কি আত্মহত্যা করল? ডাক পুলিশ সাহেবকে। পুলিশ সাহেবকে হুকুম করলুম। হাঁ, হুকুম করলুম। কেন করব না? সে আমার অধীনস্থ, হলই বা ইউরোপীয়ান। হুকুম করলুম খবর এনে দিতে। সে খবর আনাল কী জানেন? বিষ খেয়ে মরেছে।"

মন্মথ মিত্তির সিগার উগরে ফেলে বললেন, "ইউ ডোণ্ট মীন—ডু ইউ ?"

মহিম ঘটনাটাকে ঘোরালো করবেন ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু ট্রেনের সময় যে হল। এক কথায় বললেন, "ইট ওয়াজ নট শী।"

মিত্তির ঘড়ি দেখে বললেন, "সো, হ্যাট্‌স্ হ্যাট্।"

মহিম এতক্ষণ পরে হাসলেন। সিদ্ধির হাসি। বললেন, "তিন খানা তার করে দিলুম। আঁধারে ঢিল ছোঁড়া। কলকাতায় যায়নি, তা তো দেখেছি। সিমলায় কি কোয়েটায় গিয়ে থাকতে পারে।"

মিত্তির উঠে বললেন, "না আঁচালে বিশ্বাস নেই।"

এবার চোখ কপালে তোলবার পালা মহিমচন্দ্রের। তিনি ফিস ফিস করে বললেন, "কী মনে করে ও কথা বললেন ?"

মিত্তির যা মনে করেছিলেন তা খুলে বললেন। মহিমচন্দ্র পাঁচ মিনিট হাঁ করে দাঁড়ালেন। তারপরে সত্যিই কেঁদে রুমাল দিলেন চোখে। হা ভগবান! আমার বৌমা কুলত্যাগিনী! এ কি কখনো সম্ভব! ওরে পাষণ্ড মিত্তির। ওরে সন্দেহী কায়স্থ!

চেয়ে দেখলেন মিত্তির বেপরোয়া ভাবে সিগার টানছেন। যেন বলতে চান, লোকটা গেঁয়ো। যা নিয়ে গৌরব বোধ করতে হয় তাই নিয়ে প্যান প্যান করছে।

দেখে মহিমচন্দ্রের পিত্ত জ্বলে গেল। ক্রোধ সম্বরণ করলেন এই ভেবে যে, কী জানি বাবা, চিত্রগুপ্ত কী লিখে রাখবে, সে বেটাও তো কায়েত।

মন্মথ মিত্তিরকে বিদায় দিয়ে মহিমচন্দ্র নেকড়ে বাঘের মতো উজ্জয়িনীর কাগজপত্র নিয়ে টানাহেঁচড়া করলেন। যেখানে যা পেলেন তা বাজেয়াপ্ত করলেন। কোথাও এক টুকরো বাজার হিসাব দেখলে

তার মধ্যে কত কী পড়লেন। হাঁউ মাঁউ কাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ। তবে রে ছুঁড়ি! তোর এই কাজ। আমার চোখে ধূলো!

উজ্জয়িনীর পত্রসম্পদ অল্প। ঘাঁটাঘাটি করতেই বেরিয়ে পড়ল ত্রিভঙ্গমুরারি মিশ্রকে লেখা একখানি চিঠি। এখানি উজ্জয়িনী ঠিকানার অভাবে পাঠাতে পারেনি।

"হুঁ!" মহিমচন্দ্র হালুম হালুম করলেন। তাঁর মালুম হল তিনি ক্লু আবিষ্কার করেছেন। কেল্লা ফতে! তবে রে শূয়ার ত্রিভঙ্গ-মুরারি! আমার কাছেও তো তুই একদিন এসেছিলি। তখন তোর মতলবটা ঠাহর হয়নি। তোর মনে এই ছিল?

মহিমচন্দ্র একবার ঠিকানার উপর চোখ বুলিয়ে গেলেন। তাঁর প্রত্যয় হল, এ চিঠি সোজা ভাষায় লেখা হলেও এর বাঁকা অর্থ আছে। তিনি ইংরাজীতেই পত্রাদি লিখে থাকেন। বাংলা বোঝেন না বলে তাঁর বিশ্বাস। উজ্জয়িনীর বাংলা তিনি ইচ্ছা করেই ভুল বুঝলেন। তা ছাড়া তিনি ধরে নিলেন যে যদিও এই একখানি চিঠি ধরা পড়ল, এমনি কত চিঠিরই না আদান-প্রদান হয়েছে।

"কোই হৈ!" রায়বাহাদুর চিৎকার করলেন।

"হুজুর!" একসঙ্গে সাতজন ভৃত্য হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়িয়ে এল।

"গাড়ী তৈয়ার করো। হম পুলিশ সাহেবকা কোঠি যায়েঙ্গে।"

## ৪

সাহেব বললেন, "আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না, রায়বাহাদুর।"

ইনি বললেন, "বিশ্বাস কি আমারই হত? এই চিঠি আমার ঘাড় ধরে বিশ্বাস করিয়েছে।"

বাংলা চিঠি না? না জানি কি লেখা আছে। সাহেব চুপ করলেন।

ইনি চিঠিখানাকে মহামূল্য দলিলের মতো সযত্নে ভাঁজ করে তুলে রাখলেন।

"কী করতে বলেন, রায়বাহাদুর?"

"ত্রিভঙ্গমুরারির গর্দ্দান চাই। এর বেশিও চাইনে, কমও না।"

"রায়বাহাদুর, তা কেমন করে সম্ভব?"—সাহেব মুচকি হাসলেন।

রায়বাহাদুরও মুচকি হেসে ভাবলেন, এই বিদ্যা নিয়ে তুমি এস পি. হয়েছে। বললেন, "এর চেয়ে সোজা আর কী হতে পারে!"

বিস্মিত এলিস সাহেবের কাছে বিশদ করলেন নিজের প্রস্তাব। "সেদিন একটা বড় ডাকাতি হয়ে গেছে শহরে। ডাকাতিটাতে ভদ্রশ্রেণীর যুবকদের সংশ্রব আছে বলে অনুমিত হয়। মনে করুন, একখানা বেনামী চিঠি পাওয়া গেছে—"

"মনে করুন, বেনামী চিঠি পাওয়া গেছে! সে কি রায়-বাহাদুর! মনে করব কী করে, যখন বাস্তবিক পাওয়া যায়নি?"

রায়বাহাদুর একখানা কাগজ টেনে নিয়ে ঝরনা কলম বার করে বাঁ হাতে লিখতে শুরু করলেন। সাহেব তা দেখে বললেন, "বুঝেছি।"

রায়বাহাদুর সাহেবটার নির্ব্বুদ্ধিতার দরুন চটে উঠেছিলেন। চটলে কার্য্যহানি। সামলে নিয়ে বললেন, "মনে করুন, দারোগা এই বেনামী চিঠি পেয়ে কেস ডায়রিতে তুলেছে। তারপর খানাতল্লাস করেছে ত্রিভঙ্গমুরারির বাড়ী, ধরেওছে ত্রিভঙ্গকে, ধরে চালান দিয়েছে। তাতে ফল হয়েছে এই যে, অনেক গোপনীয় চিঠিপত্র পুলিশের হাতে এসেছে। সেই বাড়ীতে যে উজ্জয়িনী আছে তা

আমি ইঙ্গিত করছি না। কিন্তু কোথায় সে আছে তার ইঙ্গিত সেই বাড়ীতেই পাওয়া সম্ভবপর।"

সাহেব বললেন, "তা বটে।"

রায়বাহাদুর সাহেবের সুবুদ্ধিতে পরিতোষ পেয়ে বলে গেলেন, "তারপর ত্রিভঙ্গকে গ্রেপ্তার করে একটু চাপ দিলেই বাবাজী কবুল করবেন উজ্জয়িনীকে কোথায় সরিয়েছেন। আর যদি না পাওয়া যায় ত্রিভঙ্গকে তার বাড়ীতে তবে তো কোনো সন্দেহই রইল না যে সে উজ্জয়িনীকে নিয়ে আপনি সরে পড়েছে।"

সাহেব বললেন, "তা তো পরিষ্কার।"

রায়বাহাদুর মনে মনে বললেন, বেঁচে থাক। ইন্সপেক্টার জেনারল হবে, আমার আশীর্ব্বাদে। মুখ ফুটে বললেন, "তখন আমার মতে পুলিশের ইণ্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ থেকে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত ব্যাপী অনুসন্ধান হলে ভালো হয়।"

পুলিশ সাহেব এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। চমকে উঠে বললেন, "রায়বাহাদুর, আপনি নিজের খরচে প্রাইভেট ডিটেকটিভ্ নিযুক্ত করুন। না, না, না, না। অমন অনুরোধ করবেন না।"

রায়বাহাদুর দ্বিধাহীন ভাবে বললেন, "তাঁকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেব যে উজ্জয়িনীর সন্ধান দেবে।"

পুলিশ সাহেব বললেন, "উপরওয়ালাদের নাড়ী টিপে দেখি।"

রায়বাহাদুর বললেন, "ধন্যবাদ। তা হলে আমি উঠি।"

"না, না, সে কী।" মিস্টার এলিস দুই হাত মেলে তাঁকে বসালেন। বললেন, "হোক এক হাত ব্রিজ। তবে তো উঠবেন।"

রায়বাহাদুর বুঝতে পারলেন সিংহের বিবরে এসে পরিত্রাণ নেই। যাবে আজ বারো তেরো টাকা উড়ে। তা যাক। ওড়বার

জন্যেই টাকার সৃষ্টি। এই তো উজ্জয়িনীর সন্ধানে হাজার টাকা উড়তে চলল। ওড়ে টাকা রাখে কে ?

এলিস সাহেব তাঁর মেমসাহেবকে ও টেলিফোন যোগে সিবিল সার্জনকে ডেকে তাসের চতুরঙ্গ পূর্ণ করলেন। রায়বাহাদুর মহা আনাড়ি। তাঁর পার্টনার মিসেস এলিস তাঁকে বাঁচাবার যত চেষ্টা করলেন সব নিস্ফল। রায়বাহাদুর এক একটা কল দেন আর হাসির রোল ওঠে। মোট কথা তিনি টাকা ওড়াবার জন্যে খেলছেন, খেলা জেতবার জন্যে নয়।

খেলতে খেলতে লোকসান যখন এগারো টাকায় উঠল তখন রায়বাহাদুর হাত গুটালেন। ঘুষের টাকা নয় যে খয়রাৎ করবেন, ঘুষের টাকা তিনি স্পর্শ করেন না। বাপের টাকাও নয়, বাপ ছিলেন গরিব কবিরাজ। শ্বশুর যখন মেয়ে দিয়েছিলেন তখন ইনি ছিলেন কলেজের ছাত্র, ইনি যে একদিন ম্যাজিস্ট্রেট হবেন তার সূচনা পেলে শ্বশুর ভিটা মাটি বিক্রী করে এঁকে এঁর উপযুক্ত দক্ষিণা দিতেন নিঃসন্দেহ, কিন্তু শ্বশুর মহাশয়ের কল্পনার চরম ছিল ম্যাজেস্টারি নয় সাবরেজিস্টারি, তাই এঁর সমস্তই স্বোপার্জ্জিত বিত্ত। তার থেকে এগারোটা টাকা এক বৈঠকে উড়ল। হাত না গুটালে আরো উড়বে।

এলিস-গৃহিণী বললেন, "এরই মধ্যে উঠতে চান রায়বাহাদুর ? ওদিকে যে আপনার খানা তৈরি করতে বলেছি।"

রায়বাহাদুর আমতা আমতা করে বললেন, "কেন কষ্ট করলেন, আমি তো—"

"বুঝেছি, আপনি জাত দিতে ভয় করেন। আমার মনে ছিল না।"

"তা হলে আমাকে বসতেই হল, জাত না দিয়ে উঠছি না।"

খেলা জোর চলল। আরো সাত টাকা রায়বাহাদুরের হিসাবে দেনা। পাওনা শূন্য। রায়বাহাদুর মনে মনে রুখলেন। কিন্তু উঠতে পারছেন কই! মিসেস এলিস যে হাসবেন। এত বড় ম্যাজিস্ট্রেট, কিন্তু জাত মানে!

আরো তিন টাকার ধাক্কা। অথচ খানার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

রায়বাহাদুর মরীয়া হয়ে চেয়ার ছাড়লেন। বললেন, "আমাকে মাফ করবেন, মিসেস এলিস। সরকারি কাজ পড়ে রয়েছে।"

এলিস গৃহিণী আবিষ্কার করলেন যে, একজন রায়বাহাদুরেরও ধৈর্যের সীমা আছে। তিনি খানার হুকুম দিলেন। এলিস সাহেব পাওনার হিসাবে মন দিলেন। সিবিল সার্জন রায়বাহাদুরকে ব্রিজ খেলায় জেতবার সঙ্কেত বাতলাতে লাগলেন।

খানার পর রায়বাহাদুরের মাই ডিয়ারী ভাব জন্মাল! কফিতে চুমুক দিতে দিতে বললেন, "মাই ডিয়ার এলিস, ইউ উইল নট ডিসাপয়েণ্ট মি, উইল ইউ?"

এলিস তখন ভিজে রয়েছেন—তাঁর তো কেবল খানা নয়, পিনাও হয়েছে। বললেন, "মাই ডিয়ার আর. বি, আই উইল মোস্ট সার্টেন্‌লি নট।"

সিবিল সার্জন আঁচতে পারলেন না। আঁচবার অবস্থাও তাঁর ছিল না। আঁচানোই তখন তাঁর একমাত্র কাজ। দ্রাক্ষারস দিয়ে আঁচানো।

রায়বাহাদুর জানতেন মদের গেলাসের উপরে যে প্রতিজ্ঞা তা সাহেবেরা ভাঙে না। নিশ্চিন্ত হলেন। আর দেরি করলেন না। বাস্তবিক তাঁর অনেক ফাইল পড়ে রয়েছিল।

পরদিন সকালে তামাক খেতে বসেছেন, এমন সময় এক

টেলিগ্রাম। কোয়েটা থেকে মিসেস গুপ্ত জানিয়েছেন, তিনি উজ্জয়িনীর ব্যাপার বুঝতে না পেরে সোজা মুঙ্গের আসছেন।

সর্ব্বনাশ। রায়বাহাদুর নল মুখে নিয়ে লাফ দিলেন। গড়গড়াটা তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লাফাল। সর্ব্বনাশ। মিত্তিরকে বলেছি, সে পুরুষ মানুষ, সে চেপে যাবে। মিসেস গুপ্তকে বললে তিনি প্রত্যেক আত্মীয়কে জানাবেন, কাগজে বিজ্ঞাপন দেবেন, লাট সাহেবের মেম-সাহেবকে ধরে আমার চাকরিটি খাবেন।

অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, "সর্ব্বনাশ হো গয়া।" চাকররা শুনে বলাবলি করল—"বহু মেমসাব মর গই।" দাসীরা তা শুনতে পেয়ে অট্টনাদ করল। তাকে ওরা কান্না বলে।

রায়বাহাদুর টেলিফোনে পুলিশসাহেবকে বললেন, "রুইন হ্যাজ বিফল্‌ন্ মি।"

এই পণ্ডিতি ইংরাজি সমঝা কক্‌নি ইংরেজের অসাধ্য। সাহেব অনেক বার বেগ ইওর পার্ডন করে অবগত হলেন মিসেস ওয়াই গুপ্ত আসছেন, অতএব ত্রিভঙ্গমুরারিকে পাকড়াতে হবে।

ত্রিভঙ্গমুরারির বাড়ী খানাতল্লাস হল। তাকে পাওয়া গেল না। কাগজপত্র যা পাওয়া গেল তার একখানিও উজ্জয়িনীর হাতের নয়। তা নাই হলো, রায়বাহাদুর তাই পড়ে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। একটা বিরাট অন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র চলেছে তাঁর এলাকার ভিতরে। কাশীর কবি দেবদত্ত শুকুল, জব্বলপুরের সাহিত্যিক রামনরেশ চৌবে, দিল্লীর গীতকার ইস্তার হুসেন, কলকাতার নাট্যকার অশোক আতর্থী, পণ্ডিচেরীর রোগী কালিয়াবরণ—এঁরা সবাই ত্রিভঙ্গকে চিঠি লিখে থাকেন। চিঠি যখন লেখেন ও সে চিঠির যখন প্রতীয়মান কোনো উদ্দেশ্য নেই তখন এই সকল বাগ্‌বহুল হস্তলিপি কি এই থিওরী

প্রতিপাদন করে না যে, একটা ঘোর অন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র চলেছে? আর তেমন ষড়যন্ত্র যদি চলে থাকে তবে তা কাকে অবলম্বন করে? নিশ্চয় উজ্জয়িনীকে। নতুবা উজ্জয়িনা কেন ত্রিভঙ্গকে চিঠি লেখে?

ত্রিভঙ্গমুরারি বাড়ী নেই। সে নাকি রেওয়া স্টেটে বক্তৃতা করতে গেছে। মহারাজার কাছ থেকে কিছু মাসোহারা আদায় করতে। কিম্বা নগদ বিদায়। এই ওজর কি কখনও বিশ্বাসযোগ্য? রায়বাহাদুর রোষে ফুলতে থাকলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ায় মরবার ঠাঁই পেল না। এখন যদি সে নেটিভ স্টেটে উজ্জয়িনীকে নিয়ে বাস করে তবে তার টিকি ধরে টান মারি কী করে! লিখতে হবে রেসিডেণ্টকে—লজ্জার মাথা খেয়ে। এদিকে মিসেস গুপ্ত যে এসে পড়লেন।

৫

সত্যি মিসেস গুপ্ত এসে পড়লেন। একা নয়, সঙ্গে দুই মেয়ে, দুই জামাই, এক নাতনী—লিলির মেয়ে। শ্রাদ্ধ কলকাতায় হবে বলে স্থির হয়েছে। এর প্রধান কারণ উজ্জয়িনী। সিমলায় শ্রাদ্ধ হতে থাকবে আর ওদিকে উজ্জয়িনী নিরুদ্দেশ—এ কেমনতর! কলকাতায় হলে উজ্জয়িনীকে পথে খুঁজে পাবার সম্ভাবনা আছে।

গুপ্তজায়া তাঁর অতিথি, শুধু তিনি নন, তাঁর দুই তিলোত্তমা কন্যা ও দুই দিকপাল জামাতা, অহো সৌভাগ্য! রায়বাহাদুরের মনে হল, তাঁর উচ্চতা দুই তিন ইঞ্চি বেড়ে গেছে। আদিতে ছিল পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে হয়েছিল পাঁচ ফুট

সাড়ে সাত ইঞ্চি, এখন পূরা ছয় ফুট। মুঙ্গেরের লোক দেখুক, কারা তাঁর কুটুম্ব, কাদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার।

বৈধব্যের বিষাদ গুপ্তজায়াকে মহিমান্বিত করেছিল। হিন্দু বিধবার মতো তাঁর আভরণ ও পরিধেয়। তবে পায়ে জুতো ও হাতে ঘড়ি।

তিনি বিশ্রাম না করে, দশটা অবান্তর কথা না বলে, একেবারে প্রশ্ন করলেন, "আমার মেয়ে কই ?"

রায়বাহাদুর মনে মনে মহলা দিয়ে রেখেছিলেন। চোখে দু ফোঁটা জল এনে আবেগ স্ফুরিত স্বরে বলবেন, "যোগানন্দ গেল, কেন যে আমরা পড়ে থাকলুম, কেন এই দুর্গতি হল আপনার আর আমার ?"

কিন্তু মিসেস গুপ্ত সময় দিলেন না মেক-আপের। বিনা আড়ম্বরে ওকথা নিতান্ত আন্তরিকতাহীন শোনাল। গুপ্তজায়া অসহিষ্ণুতা ব্যক্ত করলেন। লিলি ডলি কৌতুক বিচ্ছুরিত করতে থাকল।

রায়বাহাদুর অসম্বদ্ধ ভাবে কী বলে গেলেন। শোনা গেল, অন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র, ত্রিভঙ্গমুরারি, নেটিভ স্টেট।

মিটারকে চ্যাটার্জি বললেন কানে কানে, "হোয়াট ননসেন্স।"

মিটার চ্যাটার্জির পা টিপে হাসলেন। চ্যাটার্জি যুগপৎ হেসে ও গর্জে উঠলেন, "হেই।" সিমলায় জঙ্গী বিভাগে কাজ করেন, জঙ্গী চেহারা।

রায়বাহাদুর আর একটু খুলে বলছিলেন, "আত্মহত্যা নয়, লাশ সনাক্ত করতে গেছলুম।"

চ্যাটার্জি সিদ্ধান্ত করেছিলেন আত্মহত্যা। আর মিটার সন্দেহ করেছিলেন গৃহত্যাগ। পথে তাই নিয়ে দুজনায় তুমুল তর্ক হয়ে গেছে। স্ত্রীরা যে যার স্বামীর পক্ষ নিয়েছে। কেবল মিসেস গুপ্ত ও তাঁর নাতনী নিরপেক্ষ।

চ্যাটার্জি বললেন, "দয়া করে আর একটু খোলসা করে বলুন কেন আত্মহত্যা নয়।"

রায়বাহাদুর বললেন, "লাশ অন্যলোকের।"

"কী করে জানলেন, দয়া করে জানান।"

"আমি স্বচক্ষে দেখেছি লাশ—।"

"অন্য লোকের। কিন্তু চক্ষু তো একা আপনার নেই, আপনিও বেবীর একমাত্র আত্মীয় নন। একখানা ফোটো নিলে এমন কী অন্যায় হত?"

"য়্যাঁ! তা তো খেয়াল হয়নি।"

"ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, মনে কিছু করবেন না। তবে কি না আমাদের মন মানছে না।"

"আমি নিশ্চয় করে বলছি ও দেহ উজ্জয়িনীর নয়। ওটা যার সে একটি ছাত্রী মেয়ে, কী নাম সজনী, না—"

"বুঝেছি। শোনা কথা, চিনতেন না আপনি সে মেয়েকে।"

রায়বাহাদুর অস্থির হয়ে বললেন, "পাঁচ শ লোক তাকে দেখে বলল সে সজনী, না কী। তার স্বামী কাজ করে পার্ব্বতীপুরে।"

চ্যাটার্জি সবিনয়ে বললেন, "মাফ করবেন বেয়াদবি। একটা ছাত্রী মেয়েকে পাঁচ শ লোক চিনত, এমন কথা কখনো শুনিনি। এ অঞ্চলে কি পর্দ্দা নেই?"

রায়বাহা.র হাড়িকাঠে পড়লেন। তাঁর ছটফটানি দেখে ডলির মায়া হল। সে তার স্বামীর দিকে তাকাতেই স্বামীর সঙ্গে চোখাচোখি। মিটার রায়বাহাদুরের পক্ষ নিলেন। তিন হাজারি ব্যারিস্টার। চ্যাটার্জিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবেন।

বললেন, "রায়বাদুর, সুরতহাল হয়েছিল আশা করি।"

"আলবৎ। আনিয়ে দিচ্ছি সুরতহালের রিপোর্ট। কোই হৈ।"

চ্যাটার্জি দমে গেলেন। মিটার সোজা হয়ে বসলেন। চশমাটা একবার খুললেন, একবার পরলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি তো এ জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ?"

রায়বাহাদুর ভ্রূ কুঞ্চন করলেন। বললেন, "তার খুব প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারি।"

মিটার হেসে বললেন, "তা জানি। গ্রেপ্তার হবার অভিলাষ নেই। জেরা করতে করতে অমন দস্তুর দাঁড়িয়ে গেছে যে বাপকেও জিজ্ঞাসা করতে হয়, আপনি তো বাবা ?"

তারপর মিটার ক্রমে ক্রমে ধূলিসাৎ করলেন চ্যাটার্জির সিদ্ধান্ত। শেষে বললেন, "রায়বাহাদুর, কী চিঠিপত্র পেয়েছেন আনুন দেখি।"

তিনি যতক্ষণ পঠনে মনোনিবেশ করলেন অন্যেরা ততক্ষণ তাঁর মুখভাব অধ্যয়নে মনোনিবেশ করলেন। তিনি ট্রেন্‌ড্‌ ব্যারিস্টার, মুখভাব নির্ব্বর্ণ রাখতে অভ্যস্ত। পড়া শেষ করে দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো এক ফালি হাসি ফোটালেন।

"রায়বাহাদুর," মিটার আরম্ভ করলেন, "রায়বাহাদুর, ত্রিভঙ্গ নয়।"

"কী! কী! ত্রিভঙ্গ নয়? তবে কে?"

"সুধীন্দ্রনাথ!"

রায়বাহাদুর উত্তেজিত হয়ে বললেন, "অসম্ভব।"

"কেন অসম্ভব? সুধীন্দ্রনাথ কি পুরুষ নয়?"

রায়বাহাদুর ক্রুদ্ধ হয়ে, বললেন, "সুধীন যে আমার ছেলের বন্ধু।"

মিটার ফুর্ত্তি করে বললেন, "বন্ধু না হলে এমন কর্ম্ম কে করে?"

রায়বাহাদুর অপ্রতিভ ও অতিষ্ঠ হয়ে বললেন, "কিন্তু সে যে এখন বিলেতে।"

মিটার মুচকি হাসলেন। বললেন, "বিলেত তো কাছে। চাঁদ কত দূরে জানেন তো। তবু সে টান দেয় সাগরকে।"

গুপ্তজায়া এতক্ষণ অবাক হয়ে শুনছিলেন নানা মত ও সেসব মতের খণ্ডন। প্রশ্নক্ষেপ করলেন, "তুমি কি বলতে চাও বেবী বিলেত গেছে?"

"আমি কিছু বলতে চাইনে, মা। বিলেতও গিয়ে থাকতে পারে, হিমালয়ও গিয়ে থাকতে পারে। আসল কথা, সুধীন্দ্রনাথ জানে কোথায় গেছে ও কার আকর্ষণে গেছে।"

রায়বাহাদুর ঘাড় নাড়লেন। "কখনো নয়। সুধীন আমার বন্ধুর ছেলে, আমার ছেলের বন্ধু।"

চ্যাটার্জি সমবেদনায় বললেন, "পারিবারিক দুর্ঘটনা অমন কত হয়, আক্ষেপ করবেন না রায় বাহাদুর।"

মিটার কপট সমবেদনা প্রকট করলেন। বললেন, "যার বৌ তাকে ফিরিয়ে দেবে, যদি বন্ধুর ছেলে ও ছেলের বন্ধু হয়ে থাকে। আপনি হতাশ হবেন না, রায়বাহাদুর।"

এই রসিকতায় মিসেস গুপ্ত আহত হলেন। রায়বাহাদুর তো জ্বলে উঠলেন। দেখা গেল লিলি ও ডলি হাসি চাপতে পারল না। চ্যাটার্জি মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্যে বললেন, "তোমার ও দুর্নীতির অনুমান যুক্তিসহ নয়। বেবী বড় পবিত্র মেয়ে। ও ঠিক আত্মহত্যা করেছে।"

মিটার এর উত্তরে করুণা ভরা চাউনি দিয়ে চ্যাটার্জিকে হাস্যাস্পদ করলেন। শোনা গেল, লিলি ডলির কানে কানে বলছে, "বেবী বড় পবিত্র মেয়ে। ও ঠিক আত্মহত্যা করেছে।" ডলি বলছে, "লিলি পবিত্র নয়, তাই বেঁচে আছে।"

রায়বাহাদুর মিসেস গুপ্তকে দৃঢ় স্বরে বললেন, "ত্রিভঙ্গ। সুধীন্দ্র নয়। আপনি ওসব বাজে কথা কানে তুলবেন না। ত্রিভঙ্গকে ধরে এনে দু শ বার চাবকাব। তবে আমার নাম এম. সি সেন।"

একজন ম্যাজিস্ট্রেটর দৃঢ় বিশ্বাসকে মিসেস গুপ্ত অগ্রাহ্য করতে পারলেন না।

"কিন্তু"—মিসেস গুপ্ত আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করলেন,—"এর কী দরকার ছিল? কেন সে আজ ত্রিভঙ্গের সঙ্গে রেওয়া স্টেটে পালায়? কতই বা তার বয়স? তার বয়সের মেয়েদের স্কুলের পড়া শেষ হয়নি। কে তার বিয়েতে মত দিয়েছিল? কেন আমার কথা কেউ তখন শোনেনি?"

স্বামী বেঁচে থাকলে এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে কেমন কলহ করতেন, তিনি নেই, হায় রে! মিসেস গুপ্ত স্বামীর শোকে তথা কলহের শোকে উৎসারিত অশ্রু রুমাল দিয়ে রোধ করলেন।

তা দেখে রায়বাহাদুর কাতর হয়ে বললেন, "আহা সোনার প্রতিমা, কী ছিলেন কী হয়েছেন।"

ডলি লিলির কানে কানে বলল, "ইজ্ন্ট্ হি এ ক্রীম?"

লিলি এর উত্তরে বলল, "এ নাইস পেট মাঙ্কি।"

যোগানন্দ মারা গেছেন বলে তাঁর প্রথম দুই কন্যার স্বভাবের বৈলক্ষণ্য হবে, প্রকৃতির কাছে তা প্রকাশ করা যায় না। তারা তেমনি কুরঙ্গচপল সুরঙ্গিনী। লিলি কী একটা বুনছিল। ডলি তা দেখে পরিহাস করে বলছিল, "একটি কি যথেষ্ট নয়? আমি হলে ভাবতুম ওয়ান ইজ ওয়ান টুউ মেনি।" লিলি বলছিল, "সবাই কি তোর মতো ভাগ্যবতী? আবার বিলেত চললি। কোনো দায় নেই।"

মিটার তখন চ্যাটার্জিকে বোঝাচ্ছিলেন নেটিভ স্টেটদের সহিত ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের সন্ধি শর্ত্ত, এক্‌স্ট্রাডিশন সংক্রান্ত আইন, ত্রিভঙ্গকে ধরবার উপায়, উজ্জয়িনীর সম্মতি আইনগত সিদ্ধ কি অসিদ্ধ। চ্যাটার্জি থেকে থেকে মাথা নেড়ে বলছিলেন, "ও ঠিক আত্মহত্যা করেছে। টেক ইট ফ্রম ওল্‌ড চ্যাটার্জি।" মিটার সে কথা শুনে বলে উঠেছিলেন, "হাকিমে কী না বলে চীনারা কী না খায়! ত্রিভঙ্গের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ নেই। ছোকরা যদি আমাকে দেয় তো জিতিয়ে দেব।

রায়বাহাদুর মিসেস গুপ্তকে বোঝাচ্ছিলেন, "মামলা করে লোক হাসিয়ে কী হবে? কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া তো টম্‌ফুলারি। আমি এলিসকে হুকুম করেছি, ও গোপনে তল্লাস করছে, রেওয়ার রেসিডেণ্টকে লিখতে যাচ্ছি, দরকার হলে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের পলিটিকল ডিপার্টমেণ্টকে জানাব।"

মিসেস গুপ্ত বলছিলেন, "আমি ফরেন সেক্রেটারিকে চিনি। চমৎকার লোক।"

তবে তো চাল মাৎ। অন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র করে ম্যাজিস্ট্রেটের পুত্রবধূকে বহিষ্করণ। আমি জানতে চাই কে কে আছে এর পিছনে? ত্রিভঙ্গ ত দাবা নয়, ও একটা বোড়ে।"

মিটার যোগ দিয়ে বললেন, "আমিও সেই কথা বলি। ত্রিভঙ্গ একটা বোড়ে। দাবা হচ্ছে সুধীন্দ্রনাথ।"

চ্যাটার্জি জিজ্ঞাসা করলেন, "রাজাটি তা হলে কে?

"রাজা এ ক্ষেত্রে নেই। রানী হচ্ছেন উজ্জয়িনী আর যদি তুমি বিলিতী পদ্ধতির খেলা পছন্দ কর তবে রাজা হচ্ছে সুধীন্দ্রনাথ, রানী হচ্ছেন উজ্জয়িনী।

রায় বাহাদুর গর গর করছিলেন। প্রতিবাদ করে বললেন, "আমি অনুনয় করছি, সুধীকে এর মধ্যে আনবেন না। স্পেয়ার মাই ফিলিংস্। প্লীজ্।"

মিটার জিভ কেটে বললেন, "ভুলে গেছলুম। বন্ধুর ছেলে, ছেলের বন্ধু। লক্ষণ মিলে যাচ্ছে। তবু জেলা মাজিস্ট্রেটের নিষেধ শিরোধার্য করতে হয়।"

লিলি ডলিকে সুধাল, "সুধীন্দ্রনাথটি কে? তোদের বালিগঞ্জের সুধীন সিন্‌হা নয় তো?" ডলি জবাব দিল, "না। সে কি একটা সামান্য স্কুলের মেয়ের প্রেমে পড়তে পারে? তার আছে।" লিলি চুপি চুপি জানতে চাইল, "কে?" ডলি চুপি চুপি জানাল, "রোমা। রোমা পলিট।"

মিসেস গুপ্ত বাণীহারা মূর্ত্তির মতো এক ভাবে বসেছিলেন। আকস্মিক বৈধব্য তাঁর মুখর চাঞ্চল্য অপহরণ করেছিল, তাঁর প্রকৃতিগত তারুণ্য অপহরণ করেছিল তার তরুণবয়সী কন্যার অন্তর্ধান। তিনি অন্তরে কিছুই বিশ্বাস করছিলেন না—রায়বাহাদুরের প্রত্যয়, মন্মথর সন্দেহ, অমিয়র রোমাঞ্চকর ধারণা। তাঁর মেয়েকে তিনি মন দিয়ে না চিনলেও শিরায় শিরায় চেনেন। তাঁরই তো সন্তান। তিনিও তার বয়সে অন্তর্ধানের কল্পনা করে সুখ পেতেন। কোনো প্রেমিকের খাতিরে না, এমনি। মুক্ত বিহঙ্গের জীবন তাঁকে প্রলুব্ধ করত। স্বামীকে ভালোবাসতেন প্রাণ ঢেলে, তবু তাঁর আকাঙ্ক্ষা জাগত দায়িত্বলেশহীন ডায়না হতে।

তাঁরই তো মেয়ে উজ্জয়িনী। কুমারী অবস্থার স্বাদ সবটা পেতে না পেতে তার হল বিয়ে। কোনো খেদ কি ছিল না তার অন্তঃকরণে? গিয়ে যদি থাকে ত্রিভঙ্গের সঙ্গে তা কি প্রেমবশত? না, কল্পলোকের আহ্বানে?

মধুর যৌবন। মধুর মুক্তি। জীবন তো দু বার আসে না। যৌবনও একটি বার। বিবি গুপ্ত—সুজাতা গুপ্ত—গোপনে ফিরে গেলেন তাঁর কনিষ্ঠা কন্যার বয়সে। প্রথম যৌবন সে বয়স তিনি পারেননি ভোগ করতে, লুট করতে। তাঁর মেয়ে যদি পারে তবে সে তো তাঁরই ভোগ। বেনামী ভোগ। তিনি কি তার উপর রাগ করবেন? কদাচ না। কখনো তিনি এত খুশি হননি তার উপর। উজ্জয়িনী, বাছা আমার। তোর জন্যে উদ্বেগ বোধ করব না জানি কত কাল। কিন্তু রাগ? না। এক মুহূর্ত্তের তরে না। যা তুই করেছিস তা আমারও করা। তা যদি আমি করতে পারতুম আমি অন্য মানুষ হতুম। জীবন আমার এমন কৃত্রিম, এমন ব্যর্থ হত না। কী পেয়েছি জীবনে? দারুব্রহ্ম স্বামী! সংসারের শত অভিনয়, সহস্র দায়িত্ব। উজ্জয়িনী, তোর মধ্যে বাঁচলুম।

# নব জীবনের প্রান্তে

## ১

"ই কামরা নহি। ই কামরা নহি।"

উজ্জয়িনী আশ্চর্য হয়ে লোকটির দিকে তাকিয়ে রইল। মাথায় ফুলকাটা গোল টুপী, তার নীচে কলো চুল শাদা হয়ে আসছে। ধুতির উপরে কোট, তার বুকে সোনার ঘড়ি চেন। ট্রেনের পাদানের উপর দাঁড়িয়ে দুই হাতে দুই পাশের শিক জড়িয়েছে। খোলা দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কার সঙ্গে কথা বলছিল এতক্ষণ, উজ্জয়িনী সেই কামরায় উঠতে চায় দেখে কুকুরখেদানোর স্বরে চ্যাচাচ্ছে, "ই কামরা নাহ। ই কামরা নহি।"

উজ্জয়িনী আত্মসম্বরণ করে জিজ্ঞাসা করল, "ক্যা, রিজার্ভ হায় ?"

বৈষ্ণবীর মুখে ইংরেজী বুকনি শুনে লোকটি কিছু ভড়কে গেল। বলল, "রিজার্ভ নহি, ফাস্ট কিলাস।"

উজ্জয়িনী বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করল, "তব কেঁও বোলতেহেঁ এ কামরা নেহি ?"

একজন সামান্য বৈষ্ণবীর কণ্ঠস্বরে এমন দৃঢ়তা, গ্রীবাভঙ্গিমায় এমন দৃপ্ততা, ব্যবহারে এতটা আত্মবিশ্বাস লোকটিকে বিমূঢ় করল। সে অপ্রস্তুত হয়ে বার বার ভিতরে ও বাইরে চোখ ফেরাতে থাকল। নামতে কি চায় অথচ মেয়েদের কামরার ভিতরেই বা ঢোকে কী বলে ?

লোকটার অসভ্যতায় উজ্জয়িনী আরক্ত হয়ে উঠেছে এমন সময় ভিতর থেকে কে হুকুম করলেন, "আনে দিজিয়ে বাবুজী।"

বাবুজী ব্যস্তসমস্ত হয়ে নেমে গিয়ে কাছেই দাঁড়ালেন ও জানালা দিয়ে উঁকি মারলেন। তারপর উজ্জয়িনী কামরায় উঠলে দুই একবার ইতস্তত করে আবার পাদান আরোহণ করলেন।

ভিতরে গিয়ে উজ্জয়িনী কোনোদিকে দৃকপাত না করে কাউকে কিছু না বলে একটি বার্থ দখল করল ও দখলের নিশানা স্বরূপ গদির উপরে গাঁটরিটি চাপাল। এক বার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ছাটা চুলের বাহার দেখে নিয়ে ফিরে গেল নিজের জায়গায়, গাঁটরির কোলে মাথা রেখে গা এলিয়ে দিল। ঘুমে তার চোখ বুজে আসছিল, ঘুময়নি কাল সারা রাত।

সে কামরাটিতে ছিলেন একটি মধ্যবয়সিনী মহিলা। তাঁর শয্যার উপর তিনি উঠে বসেছেন। সঙ্গে চলেছে রকমারি সরঞ্জাম। কতক তার মধ্যে বাদ্যযন্ত্র। একটা তো আলবোলা। লটবহরের এক কোণে মাথা গুঁজেছে তাঁর বুড়ী ঝি। হঠাৎ মনে হয় সেও একটা সামগ্রী।

গাড়ী যতক্ষণ থামল বাবুজী হিন্দীতে কী সব বল্লতে থাকলেন, জবাব পেলেন না। ভোঁস ভোঁস করে গোটা কতক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বার বার ঘড়ি দেখে দেখিয়ে দিলেন যে তাঁর সোনার ঘড়ি আছে। মেজের উপর নানারকম ফলমূল মিষ্টান্ন রয়েছিল। তিনি চোখের ঠারে বোঝাচ্ছিলেন যে ওসব তাঁর নৈবিদ্য।

গাড়ী যখন চলতে আরম্ভ করল বাবুজীও পাদানির উপর চড়ে খানিক দূর চললেন। তারপর মধ্যবয়সিনীর একটি আদেশে আপ্যায়িত হয়ে ছয় দফা সেলাম ঠুকে এক দফা লম্ফ দিলেন। প্ল্যাটফর্মের লোক দেখতে পেল তিনি ইণ্টার ক্লাসে চাপলেন।

উজ্জয়িনীর এদিকে মনোযোগ ছিল না। কামরায় অন্য কেউ যে আছে তাও সে তেমন লক্ষ্য করেনি। তার ঘুম আসছিল না। একটা অপূর্ব্ব অনুভূতি তাকে বিহ্বল করেছিল। স্বপ্নভঙ্গের পর যেমন মনে হয়, এত ক্ষণ যা ঘটছিল সব মিথ্যা, এইবার যা ঘটতে যাচ্ছে সব সত্য এও অবিকল সেই অনুভূতি। ভোরের আলো লাগছে চোখে, ভোরের হাওয়া লাগছে গায়ে, জগৎ জাগছে গানের সুরে। সমস্ত সৃষ্টির ডানা চঞ্চল হয়ে উঠেছে, ঝটপট করছে চলার আবেগে। কী যে আছে ঐ উদার অবাধ শূন্যে কে তা জানে! হয়তো নেই দাঁড়াবার জায়গা, জুড়াবার ঠাঁই। উদার বলেই তা উদাস, অবাধ বলেই বিমুখ।

ট্রেন চলেছে বিচিত্র শব্দলহর তুলে। উজ্জয়িনীর সর্ব্ব শরীর সেই চলনের শরিক। ঝক ঝকা ঝক ঝকা ঝক ঝক ঝকর ঝকর ঝোঁ ঝোঁ। দুড়ুম দুড়ুম দুড়ুম দুড়ুম দুড় দুড় ঝঅকঅর ঝক ঝক ঝঅকঅর।

আহ্! কী আমোদ। কী আশ্বাস। জীবনের একটা পর্ব্ব সমাপ্ত হল। সে আর বালিকা নয়, নারী। আর পরাধীনা নয়, স্বাধীনা। তার প্রাণে নবীন উদ্দীপনা, নব দায়িত্ববোধ। সে অপরের পরামর্শ নিতে পারে কিন্তু কর্ত্তব্য স্থির করবে স্বয়ং। অন্যান্যদের খুশি করবে খুশির সহিত, কিন্তু তাদের খুশির বাহন হবে না। গেছে সেসব দিন মাস বছর যবে তার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অন্তরে অন্তরে ছিল বাবাকে মাকে শ্বশুরকে মেনে চলা। জীবনের আদি পর্ব সমাধা হল। আর সেদিকে ফিরে চাইতে প্রবৃত্তি হয় না। যা গেছে তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। তা ভালো ছিল কি ছিল না, অকারণ এ চিন্তা। সেই চিন্তার সময় কি এই শুভ প্রভাত? এ যে যাত্রাকাল। যাত্রীর ভাবনা সম্মুখের। তার পা সামনের দিকে, চোখ সামনের দিকে, তার দেহদণ্ডের ঝোঁক

সামনের দিকে। তাই তার মনও রয়েছে সামনে এগিয়ে, বৃন্দাবনের আশেপাশে, মথুরার ঘাটে বাটে।

থেকে থেকে কেবল অন্তঃশূল উঠতে থাকে। নেই, নেই, বাবা নেই; দেখা হবে না, কথা হবে না, চুপ করে পাশ ঘেঁসে বসা হবে না।

কিন্তু এও তো স্বপ্নরাজ্যের অলীক ব্যথা। কেই বা কার বাবা, কেই বা কার মেয়ে। মিথ্যা মায়া। সংসারে দু দিনের তরে এসে খেলার ঘর সাজিয়ে বসা। খেলায় একজনের নাম বাপ, আর একজনের নাম মেয়ে। সত্যি কি তাই? দূর! তা কি কখনো হয়? উনি শাপভ্রষ্ট দেবতা কি যক্ষ। এ জন্মে ভগবানের শত্রুতা করে গেলেন। হিরণ্যকশিপুর মতো। ওঁর বাড়ীতে প্রহ্লাদের মতো আমার জন্ম। পূর্ব্বজন্মের কর্ম ফল। তা নইলে ওঁর সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক! কার সঙ্গেই বা কার কী সম্পর্ক! ওঁর কর্ম ওঁকে কোথায় নিয়ে চলে গেল। আমি কি তার ঠিকানা পাব?

উজ্জয়িনীর শিরায় শিরায় পথের পুলক প্রবাহিত হচ্ছিল। রক্ত-স্রোত চলেছে ট্রেনের মতো রব তুলে। যা হয় হবে, যা হয় হবে, যা যা যা, যা হয় হবে। কানু তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কানু তার ভার বইবে। সে কোথায় উঠবে, কী খাবে, কেমন করে তার দিন কাটবে, কার আশ্রয়ে তার রাত কাটবে—এসব তো তার ভাবনা নয়। তার সঙ্গে আছে তার অভিভাবক। তাকে যেখানে নামতে বলবে সেখানে নামবে, যেখানে থামতে বলবে সেখানে থামবে। তার দায়িত্বটা কিসের?

তার সাধ যাচ্ছিল গলা ছেড়ে গান গাইতে, ইঞ্জিনের বাঁশীর মতো। কিন্তু কামরায় কারা আছে, তাদের আপত্তি থাকতে পারে। সে গুনগুনাতে লাগল,

"সোহ কোকিলা অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা।"

মধ্যবয়সিনী তা শুনে শুধালেন, "মৈথিল?"

উজ্জয়িনী সচকিত ভাবে বলল, "কী?" তারপর বলল, "না। বাঙালী।" চেয়ে দেখল এক জোড়া ভাবাকুল চক্ষু তার প্রতি নিদ্দিষ্ট। সঙ্কোচে চোখ ফিরিয়ে নিল। তখনো অনুভব করতে থাকল সেই দৃষ্টির অচপল অভিনিবেশ। সে দৃষ্টি তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করছে এই বোধ তাকে উল্লসিত ও তার কায়ার পর অপরিচিতার নয়নস্পর্শ তাকে রোমাঞ্চিত করল।

সে আড়চোখে চুরি করে দেখল তেমন সুরূপা নয়, অথচ লাবণ্যবতী, এক মধ্যবয়সিনী নারী তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে। হিন্দুস্থানী হবে। যদিও পরিচ্ছদে সে কথা লেখা নেই। পারিপাট্যের দিক থেকে বাঙালীর মতো। বড় ঘরের মেয়ে না হলে ফার্স্ট ক্লাসে চড়ে কেন? গান বাজনার শখ আছে তা তো পরিষ্কার। কিন্তু আলবোলাটা ও পিকদানিটা কি খুব সেকেলে নয়? মধ্যবয়সিনী অভিনিবেশের সহিত জিজ্ঞাসা করলেন, "কতদূর যাওয়া হবে?"

উজ্জয়িনী ফুর্তি করে বললে, "কে জানে!"

মধ্যবয়সিনী কৌতুক বোধ করলেন। "কে জানে?" বিধবা মানুষের কথা কে আর জানবে। স্বামী তো নেই।"

"নেই বলে মনে হয়?" উজ্জয়িনী লঘু স্বরে শুধাল।

"মনে হবার কারণ নেই কি?"

"আছে?"

মধ্যবয়সিনী পরিহাসের প্রতাপে অপ্রতিভ হয়ে অভিমানভরে মুখ ঘুরালেন। উজ্জয়িনী কানুকে বলল, কানু, ও কী বুঝবে? ও আমার সাজ দেখে ভাবছে আমি বিধবা। হায় রে মানুষের চোখ! আমার কানু থাকতে আমি বিধবা!

ঘুম আসছে না, ঘুমের আলস সারা শরীরে। সত্য কথা বলতে কি, কিছু ভাল লাগছে না। উঠে বসে প্রভাতের শোভা উপভোগ করতে গা করছে না। শুয়ে শুয়ে কানুকে ধ্যান করতে মন যাচ্ছে না। প্রাণের শিখা যেন স্তিমিত। যেন নির্ব্বাপনের বিলম্ব নেই, যেন ভোরের বাতাস হচ্ছে মৃত্যুর মুখের ফুৎকার।

তার অঙ্গেও জাগে উত্তেজনা যখন মনে হয় কেউ বলছে সে বিধবা। কী? বিধবা? আমার কানু যে অমর, আমি চির জীবন অবিধবা। আমি জন্ম জন্মান্তর অবিধবা। যদি মুক্তি পাই জন্মচক্র থেকে তবে তো আমি কানুর সত্তায় বিলীন হয়ে গেলুম। কানুই আমি, আমিই কানু। বৈধব্য আমার ভাগ্যে লেখা নেই। হলই বা আমার সাজ বিধবার মতো।

হঠাৎ তার বুক ব্যথিয়ে ওঠে। নেই, নেই, নেই। পৃথিবী আছে মানুষ আছে, ট্রেন আছে, স্টেশনের পর স্টেশন আছে। কিন্তু কোনখানে যেন একটা ফাঁক, হিমালয়ের কন্দরের মতো সে যেন বুজবে না। কী যেন ছিল, কী যেন নেই। কিসের অভাব, কিসের অভাব, কী কী কী কী, কিসের অভাব! উজ্জয়িনী নিঃশ্বাস ফেলে, "বাবা গো।"

মধ্যবয়সিনী তা শুনতে পেয়ে উজ্জয়িনীর দিকে ফিরে চান। তার শুকনো মুখ দেখে অনুকম্পা বোধ করেন। ভরসা করে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারেন না। এ মেয়ে কি কম রঙ্গিনী! বিধবা হয়েছে বটে।

কিন্তু সেকথা কানে তুলতে চায় না। মধ্যবয়সিনী মনোযোগ করেন, রহস্যময়ীর অবয়বে কোনো সঙ্কেত না পেয়ে হার মানেন।

উজ্জয়িনী ঘুমিয়ে পড়ছে আশঙ্কা করে মধ্যবয়সিনী মৃদু স্বরে বললেন, "সামনে গাড়ী বদল করতে হবে যে।"

উজ্জয়িনী ধড়ফড় করে উঠে বসল। বলল, "তাই নাকি?"

তিনি মৃদু হেসে বললেন, "দেরি আছে। ব্যস্ত হবেন না।"

উজ্জয়িনী অপ্রতিভ হয়ে বলল, "যান, একে বুঝি ব্যস্ত হওয়া বলে।"

তিনি সায় দিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, "তা বটে। কী আছে যে নামাবার জন্য ব্যস্ত হতে হবে।"

উজ্জয়িনী ভাবল তিনি গম্ভীর মুখে পরিহাস করছেন। সেও পরিহাস ফিরিয়ে দিতে গিয়ে বলল, "জিনিস নামানো ছাড়া আর কোনো কারণে ব্যস্ত হতে নেই, কেমন?"

এর উত্তর সহসা মধ্যবয়সিনীর মাথায় এল না। তিনি মুচকি হাসতে থাকলেন। যেন সেই হাসিটাই তাঁর প্রত্যুত্তর।

## ২

লোকটা এমন ঠ্যাটা। আবার যেখানে গাড়ী দাঁড়াল সেখানে সেও দরজা দিয়ে শ্রীমুখ বাড়াল। চুরি করে একবার উজ্জয়িনীকে দেখে নিতেও ছাড়ল না। তবে তার লক্ষ্য মধ্যবয়সিনী। তিনি তাকে উপেক্ষা করলেন। গাড়ী আবার চলতে শুরু করলে ও সে তেমনি নেমে গেলে তিনি উজ্জয়িনীর দিকে চেয়ে বললেন, "আপনার সঙ্গে কেউ যাচ্ছে না?"

"যাচ্ছে বৈই কি," উজ্জয়িনী ইঙ্গবঙ্গ তরুণীদের মতো এক মুহূর্তে

একাধিকবার মাথা নামিয়ে উঠিয়ে সায় দিল। ফিক করে হেসে বলল, "আপনার এই সঙ্গীটি কিন্তু বেশ।"

"কে বলল ও আমার সঙ্গী?" মধ্যবয়সিনী ভ্রূ কুঞ্চন করলেন। মুখ নাড়া দিয়ে বললেন, "যাঃ।"

"ওকে দেখলে মরা মানুষেরও হাসি পায়।" উজ্জয়িনী সে হাসির নমুনা দিল।

"আমার তো রাগ হয়।"

"অপাত্রে রাগ।"

তারপর কথা খুঁজে না পেয়ে কতক্ষণ দুজনেই নীরব। যে দাসীটি ছিল সে বসে বসে ঘুমচ্ছিল। মধ্যবয়সিনী ইশারায় শুধালেন, "খাবেন?"

উজ্জয়িনী মিষ্টান্নের প্রতি দৃষ্টিপাত করে ঘাড় নাড়ল। তার ক্ষুৎপিপাসা লোপ পেয়েছিল। হঠাৎ সে কেমন যেন গম্ভীর হয়ে পড়ল। কী যেন তার মনে পড়তে থাকল। তার মুখভাব নিরীক্ষণ করে মধ্যবয়সিনীও সাহস করলেন না পীড়াপীড়ি করতে।

হয়তো এমনি সময় কাল বাবা দেহত্যাগ করলেন। একটা দিনের ব্যবধান—জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে। সে যদি আগে জানত তবে একবার এ জন্মের মত সাধ মিটিয়ে তাঁকে দেখত। যবনিকা পতনের পর আর কি অভিনয় দেখবার বাসনা মেটে! কেবল ডাকতে প্রাণ চায়, "বাবা, বাবা গো!"

ইচ্ছা করে অতীতের কথা মনে আনতে। কবে তার বাবা কী বলেছিলেন, কী করেছিলেন, সেসব তার মনে ভিড় করে আসতে চায়, যদি একটু ফাঁক পায়। এদিকে যে কানুকে অবহেলা করা যায় না। কানু, তুমি সে আমার প্রাণ। তোমাকে বসিয়ে

রেখে কি আমি বাবার কাছে যেতে পারি? এক মুহূর্তের বিরহ কি আমার সইবে! না, সখা এই বেশ। তুমি ও আমি একসঙ্গে পথ চলেছি, তুমি বাজাচ্ছ বাঁশি, আমি ধরেছি তোমার হাত, সেই যে সাঁওতাল যুবক যুবতীর ছবি, ইণ্ডিয়ান আর্ট। আমার বাপ নেই মা নেই, কেউ নেই, আমার অতীত নেই। আমি স্রোতের শৈবাল।

কোন বিধি সিরজিল সোতের শেওলি
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বঁধু বলি।

উজ্জয়িনী কিছু না খাওয়ায় মধ্যবয়সিনীও কিছু খেলেন না, গোটা কয় হাই তুলে স্থির হয়ে বসলেন। শূন্যদৃষ্টিতে প্রান্তরের পানে চাইলেন, প্রান্তর বিপরীত মুখে ছুটেছে, ট্রেনের মতো গতিমান। পাতলা তাঁর শাড়ী ও শাড়ীর পাড়। পাতলা তাঁর গায়ের ও মুখের ত্বক। তার উপর দিয়ে হাওয়া হিল্লোল তুলে যাচ্ছে। তিনি গুনগুন করে কী একটা রাগিণীর পিঞ্জরদ্বার খুলছেন, কোন সে পাখী মুক্তির সূচনায় অধীর হয়েছে, আবেগে কাঁপছে! উজ্জয়িনী শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গেল।

উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত সে কদাচ শুনেছে। তার বাবার গানের শখ ছিল না। মায়ের যা ছিল তা গ্রামোফোনযোগে ইউরোপীয় নৃত্য সঙ্গীতের। কখনো তা নিয়ে তার কৌতূহল বোধ হয়নি। কাব্যের ছন্দে যে সঙ্গীত আছে তাই তাকে সঙ্গীতের স্বাদ দিয়ে এসেছে, তার বেশি সে চায়নি ও পায়নি।

এ কোন্ মায়াপুরীর তোরণ—এই ট্রেন! দুই অপরিচিতা নারী। একজনের কণ্ঠে স্বরলহর। অনুচ্চ, কিন্তু সমতল নয়, আন্দোলিত। কোথায় এসে পড়ল উজ্জয়িনী নাম্নী গোপিকা। এ

নয় তার কল্পলোক বৃন্দাবন। এতে নেই কানু। কিন্তু এও কি সামান্য মনোহর?

এমন সময় একটা ঝাঁকানি দিয়ে ট্রেন গেল থেমে। উজ্জয়িনীরা গলা বাড়িয়ে দেখল স্টেশন নয়। সিগন্যাল ডাউন হয়নি বলে ট্রেন আটক হয়েছে। মধ্যবয়সিনীর গানেরও সেই দশা। তিনি মুচকি হেসে বললেন, "ঐ দেখুন কে নামছে।"

উজ্জয়িনী খিল খিল করে হেসে উঠল। কে আর নামবে? সেই মাড়োয়ারি বাবু। বলল, "আপনারই তো সঙ্গী।"

"কে বলল আমার সঙ্গী? বাঃ।"

"বলতে হবে না। ওর এক লক্ষ্য, এক ধ্যান। দেখুন দেখুন কেমন দৌড়াচ্ছে। চলন্ত গাড়ীতে উঠতে গিয়ে কাটা না পড়ে।"

"ছি ওকথা মুখে আনবেন না। সেদিন সত্যিই একটা লোক কাটা পড়ল।

"ওমা তাই নাকি। কাটা পড়তে দেখলেন?"

"দেখিনি। শুনলুম। লোকটাকে নেমে যেতে দেখলুম ঠিক, এইরকম পথের মাঝখানে ট্রেন থামার সুযোগ নিয়ে। পা-দানি থেকে পা সরিয়েছে কি না সরিয়েছে ট্রেন ছাড়ল। আর অমনি সে লোকটা গেল ঘ্যাচ করে কাটা। সকলে বলাবলি করল যার যেদিন মরণ।"

মরণের উল্লেখে উজ্জয়িনীর মুখ শুকিয়ে গেল। অবশ্য একরাত্রের অনিদ্রায় ও শোকে সে মুখ বিবর্ণ হয়েই রয়েছিল।

ট্রেন যখন চলল তখন মধ্যবয়সিনী তার দিকে একটু সরে বসলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার কি কোনো অসুখ করেছে?"

সপ্রতিভ ভাবে উজ্জয়িনী বলল, "না।"

"তবে কি আপনি অসুখ থেকে উঠেছেন, হাওয়া বদলাতে যাচ্ছেন ?"

"না।"

"বোধ হয় আপনি চিরকাল এমনি রোগা। ঠিক।" মধ্যবয়সিনী অনুকম্পাভরে মাথা নাড়লেন। "বিধবা হয়ে অবধি কেবল উপবাসই করছেন। ঠিক।"

উজ্জয়িনী বৈধব্যের উল্লেখে অসন্তুষ্ট হল, কিন্তু তাকে যে কেউ রোগা বলতে পারে এতটা আশা করেনি, ভারি আপ্যায়িত হয়ে চোখ নামাল। তার ভয় ছিল সে মোটা।

"বাস্তবিক, আপনাকে দেখে বড মায়া হয়। অমন সুন্দর চুল, তার এই ছিরি।"

উজ্জয়িনী দ্রবীভূত হল। তার লেশমাত্র অসন্তোষ রইল না। তার চোখ ছল ছল করছিল অনিদ্রায়, চোখের পাতার জল দানা বাঁধল। চারিদিক কুয়াশায় অস্পষ্ট বোধ হল। আতপ্ত স্পর্শ থেকে সে বুঝল তার গাল বেয়ে ধারা বয়ে যাচ্ছে। উষ্ণ প্রস্রবণের ধারা।

সঙ্গীতের দ্বারা মধ্যবয়সিনী তার অন্তর জয় করেছিলেন। মধুর বাক্যের দ্বারা তার মনের সঙ্কোচ মুছালেন। "আমি জানি, আমি জানি, নারীজন্মের কত কষ্ট। নারীর কাছে নারীর লজ্জা কিসের ? লজ্জা পুরুষের কাছে। নিষ্ঠুর কপট পুরুষ।"

পুরুষের নিন্দা উজ্জয়িনীর মধুর লাগল। পুরুষের প্রতি তার অভিমান অনন্ত।

"আহা," মধ্যবয়সিনী উজ্জয়িনীর কাছে সরে এলেন। "অমন সুন্দর চুল কোন শত্রু কাঁচি দিয়ে কুচিয়েছে। বিধবা বলে কি

তার উপর এত নির্যাতন করতে হয়। ভদ্র বাঙালী পরিবারেও শ্বশুর-শাশুড়ীর এই কর্ম। রাগ করে চলে এসেছ বুঝি ?"

উজ্জয়িনী প্রতিবাদ করবে ভাবল। কিন্তু এ তো ভুল নয় যে সে পালিয়ে এসেছে। ইনি কেমন করে জানলেন? সে বিস্ময়ে হতবাক হল।

"কাঁদতেই আমাদের জন্ম। তবু কান্নাও একদিন অসহ্য হয়। সাধে কি কেউ বাড়ী ছাড়ে! আ হাহা। কত দুঃখ। ওগো দুঃখিনী, তোমাকে কী সান্ত্বনা দেব!"

মধ্যবয়সিনী উজ্জয়িনীর পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। উজ্জয়িনী শিউরে উঠল। অপরিচিতার স্পর্শ। অনধিকার-চর্চ্চায় সে বিরক্ত হয়েছিল, কিন্তু এমন একজন মমতাময়ীর সহানুভূতির প্রতিদান কি বিরক্তিপ্রকাশ? কৃতজ্ঞতায় উজ্জয়িনী নীরব রইল।

এমন সময় গাড়ী ভিড়ল কিউল স্টেশনে। মধ্যবয়সিনী বললেন, "নামতে হবে যে। দাঁড়াও, কুলি ডাকি।"

মাড়োয়ারি বাবু নিকটবর্তী হয়েছিলেন। কুলির উল্লেখ শুনে অযাচিতভাবে হাঁক ছাড়লেন, "কুলি, কুলি! এক আদমি। নেহি, এক আদমি। এক, এক।"

লোকটার রকম দেখে উজ্জয়িনীর হাসি ফুটেছিল। সে রঙ্গভরে বলল, "অতগুলো কুলি দেখে ওর আশঙ্কা হয়েছে পাছে আপনাকে শুদ্ধ উঠিয়ে নিয়ে যায় মাল যথেষ্ট না হলে।"

মধ্যবয়সিনী মুচকি হাসলেন। চুপি চুপি বললেন, "কোনো মূর্খ যদি স্বেচ্ছয়ে সাহায্য করতে আসে—বিশেষত যাতায়াতের গোলমালে—তবে তা প্রত্যাখ্যান করা অবলার পক্ষে মূর্খতা।"

যখন এক্‌স্‌প্রেস এল তখন দুজনে তার একটি কামরায় উঠে

বসল। দাসীকে এ গাড়ীতে ফার্স্ট ক্লাসে নেওয়া যায় না, দিনের গাড়ী, একাকীত্বের ভয় নেই। কামরায় একজন ইউরোপীয় মহিলা ছিলেন, তাঁর একচ্ছত্রতা নষ্ট হওয়ায় তিনি রুষ্ট হয়ে ফোঁস ফোঁস করলেন। মাল ছড়িয়ে কামরাটা একাকার করে রেখেছিলেন, কোনোটাতে করলেন পদাঘাত, কোনোটাতে টান মেরে জোরসে ছুঁড়লেন। তাঁর কর্তব্য তিনি করলেন, যদিও এতটা দাপাদাপি ও লাফালাফির সহিত। তারপর এক জায়গায় আড়ষ্ট হয়ে বসলেন কোনোদিকে দৃকপাত না করে। আমাদের এ দুজন একটা বার্থ খালি পেয়ে পাশাপাশি বসে হাসাহাসি করল। অবশ্য চোখে চোখে। খাস ইংরেজ মেম দেখে মাড়োয়ারী কামরার কাছে ঘেঁষল না। দূর থেকে তাক করল।

৩

"এখন তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমতে পার," বললেন মধ্যবয়সিনী।

"কী দরকার?" উজ্জয়িনীর ঘুম আসছিল না। চমৎকার সকালবেলাটা ঘুমিয়ে মাটি করবে, দু ধারের দৃশ্য দেখবে না?

"সারা রাত যে ঘুম হয়নি তা তো বোঝা যায়।" তিনি বললেন। "তবে কাছে কোথাও যদি নেমে যাবার কথা থাকে তা হলে কাজ নেই ঘুমিয়ে।"

'কাছে' তো পাটনা। সেখানে নামলে বীণার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। কেমন আছে বীণা, জানতে এত ইচ্ছা করে। আর বীণার শাশুড়ী। তাঁর কাছে উজ্জয়িনী এত কৃতজ্ঞ। কানুর সঙ্গে তিনিই তো তাকে মেলালেন। তিনি তার পৌর্ণমাসী। তাঁদের ওখানে যাওয়া অবশ্য

উচিত, কিন্তু এখন না। এখন কানু টানছে বৃন্দাবনে। সে চলেছে কানুর বাড়ী, বিয়ের পরে স্বামীর বাড়ী। সে যে নববধূ।

"না। কাছে না। কিন্তু ঘুমও যে পাচ্ছে না।" উজ্জয়িনী আলস ভেঙে চোখ মিট মিট করে বলল। স্বামীগৃহযাত্রার যে উত্তেজনা, ট্রেনের গতির সাথে মনের গতি, মনের গতির সাথে তনুর গতি, সর্ব্বময় গতির দ্বারা আজ জগৎ গতিমান। আজকের দিনে নিদ্রা?

"তা হলে তুমি কিছু খাও।"

"না।" উজ্জয়িনীর ক্ষুধাতৃষ্ণাবোধ ছিল না। শরীরমনের একটিমাত্র বোধ—গতিবোধ। সে বলল, "ক্ষিদেও পাচ্ছে না। তেষ্টাও না।

মধ্যবয়সিনী তার মুখের দিকে চেয়ে কতক্ষণ কী ভাবলেন। তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, "আমাকে সত্য করে বল তো কী হয়েছে।"

উজ্জয়িনী এর জন্য তৈরি ছিল না। ইনি যিনিই হোন এঁর কী অধিকার আছে জানবার? অতি অশিষ্ট কৌতূহল। সামলে নিয়ে বলল, "কী আর হবে। ঘুম হয়নি কাল রাত্রে।"

"বোন," মধ্যবয়সিনী গাঢ় স্বরে বললেন, "আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পার।"

"কিন্তু," উজ্জয়িনী দৃঢ় অথচ নম্রভাবে বলল, "বিশ্বাসের পাত্রী হয়ে আপনি কোন তৃপ্তি পাবেন? ট্রেন থেকে নামলে আপনিই বা কে, আর আমিই বা কে? কাল সকালে আপনার মনে থাকবে না আজকের এই আলাপ।"

"কে বলতে পারে," তিনি মধুর হেসে বললেন, "কাল সকালেও আমরা একত্র থাকব।" উজ্জয়িনীর অবিশ্বাস অনুমান করে যাগে

কয়লেন, "ইচ্ছা করলে আমি তোমার সঙ্গ নিতে পারি, বোন। তুমি যেখানে যাবে আমিও সেইখানে।"

উজ্জয়িনী ফুর্তি করে বলল, "তা হলে তো চমৎকার হয়। চলুন, চলুন। আর দেরি কেন ?"

"সে কী ! তুমি যে বলছিলে কাছে কোথাও নামবে না।"

"ধরুন, যদি মত বদলাই ?"

"বেশ আমিও সেইখানে নামব।"

উজ্জয়িনী বিশ্বাস করল যে ইনি তামাসা করছেন না, ছলনা করছেন না। কিন্তু কেন এ কৌতূহল ? কী আছে তার মধ্যে যা এঁর কাছে মূল্যবান ?

"আপনি কি আমার প্রেমে পড়লেন নাকি," উজ্জয়িনী কপট গাম্ভীর্যের সহিত বলল।

"কী ?" তিনি প্রথমটা অপ্রতিভ হলেন। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, "না ভাই। কারুর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে সাহস হয় না। সে-ই তোমাকে পাবে যে তোমাকে ভালোবেসেছে, তোমার ভালবাসা পেয়েছে।"

উজ্জয়িনী ভাবল ধরা পড়ে গেছে. আর লুকিয়ে কী হবে! সে তো বিশ্ববাসীর শ্রবণে ঘোষণা করতেই চায় যে প্রেম এসেছে তার জীবনে, সামান্য পুরুষের প্রেম নয়, পুরুষোত্তমের। সলজ্জ মুখে জিজ্ঞাসা করল, "দিদি, আপনি কেমন করে জানলেন ?"

মধ্যবয়সিনীর নয়নে জয়ের আভা। তিনি কৌতুক বিচ্ছুরিত করে বললেন, "কিন্তু আমি জানতে চাই যার এত আনন্দ তার কেন বিষাদ লক্ষণ ? কেন তার চোখ জলে ভরে আসে, কেন তার দেহ লুটিয়ে পড়তে যায় ?" শেষের কথাগুলি বলবার সময় তাঁর কৌতুক পরিণত হল করুণায়।

কামরায় ছিল তৃতীয় একজন। তাই উজ্জয়িনী অশ্রু রোধ করল। তার সাধ যাচ্ছিল এই দরদী মহিলাটির কোলে মাথা রেখে অঝোরে কাঁদতে। তার মতো দুঃখিনী কে? যে বয়সে অন্যান্য মেয়েরা কলেজে পড়ে, জীবনে কত কী করবার অভিলাষ পোষণ করে, নির্ব্বোধ তরুণদের ব্যাকুল হৃদয় নিয়ে করে নির্দ্দোষ মেয়েলি খেলা, সেই বয়সে তার হয়ে গেল বিয়ে, তার জীবনের সেবিকাব্রত গেল ঘুচে, অথচ বিয়ের ফুল ফুটতে না ফুটতে গেল ঝরে। ভাগ্যে কানুর সঙ্গে ভাব। কানু ছিল তাই রক্ষা। নইলে তার যৌবন ব্যর্থ যেত, জীবন তো গেছেই। তার বাবার মৃত্যুর পর তার বাঁচা না বাঁচা সমান। তাদের যে অভিন্ন জীবন।

উজ্জয়িনী শুধু বলল, "সে অনেক কথা, দিদি।"

তিনি বললেন, "থাক, তা হলে আর এক দিন শুনব।"

উজ্জয়িনীও মনে মনে মেনে নিল যে তাদের বন্ধুতা আজ ফুরিয়ে যাবে না, কাল ফুরিয়ে যাবে না, তাদের বন্ধুতায় 'আর একদিন' আসবে। সেই 'আর একদিনের' জন্যে সে তার কাহিনী তুলে রাখল। বাস্তবিক আজ তার বাগ্‌বিস্তারের দিন নয়, আজ সে শোকার্ত। একটু কাঁদতে পেলে বেঁচে যায়। তার রাগ হতে থাকল ঐ মেমটার উপরে।

মেমসাহেব তখন এক মনে টাইমটেবল দেখছেন। তাঁর লম্বা চিবুক ক্রমে সুঁচল হয়ে আসছে। বেশী ভাড়া দিয়ে প্রথম শ্রেণীতে চড়েও তৃতীয় শ্রেণীর আরাম। মান সম্ভ্রম রইল না। 'ফর ইউরোপীয়ান্‌স্ ওন্‌লি' লিখে কেন যে রেল কর্তৃপক্ষ বাইরে লটকে দেয় না! আর তাদেরই বা দোষ কী? নেটিভদের মেয়েরা প্রথম শ্রেণীতে উঠবে এ কি কোনো দিন কেউ কল্পনা করেছে? হত যদি মহারানী তবে মেমসাহেব পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এরা তত উঁচু দরের নয়।

মেমসাহেব নিতান্ত ভুল করেননি। উজ্জয়িনী বিনা টিকিটের যাত্রী। আর মধ্যবয়সিনীর টিকিট কিনে দিয়েছে গ্রামোফোন কোম্পানী।

যা হোক, মেমসাহেবকে সামনেই নামতে হল। দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্টে। তার সঙ্গে সঙ্গে উজ্জয়িনীদের সঙ্কোচের ভারও গেল নেমে। মধ্যবয়সিনী বললেন "নাকটা কী ধারালো!" উজ্জয়িনী বলল, "মুখ ফুটলে দেখতেন জিভটাও ক্ষুরধার!" দুজনে মিলে হাসাহাসি করতে করতে সহসা শুনতে পেল কে বলছে, "টিকেট্‌স, প্লীজ।"

উজ্জয়িনীর মনে পড়ে গেল সে টিকিট কেনেনি, কেনবার কথা ভাবেনি, কেনবার মতো টাকা আনেওনি। তার গা ছম ছম করে উঠল। কী লজ্জা, কী অপমান! মধ্যবয়সিনী না জানি কী ঠাওরাবেন। আর ঐ বেটা মাড়োয়ারি, সেও মেমসাহেব নেমে গেছেন দেখে আবার ভিড়ে গেছে, সেই বা কী রঙ্গ করবে। "ই কামরা নহি।"

মধ্যবয়সিনী এক সঙ্গে দুজনের টিকিট দেবেন ভেবে উজ্জয়িনীর দিকে হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন। উজ্জয়িনী পলকের মধ্যে মনঃস্থির করেছিল। তার ব্লাউসের সন্ধিতে ছিল একটি হীরার আংটি। বিপদে পড়লে সেইটি মুখে দিয়ে আত্মহত্যা করবে বলে সেটিকে আনা। নইলে অলঙ্কারের প্রতি তার আসক্তি ছিল না। সব ফেলে এসেছিল। মধ্যবয়সিনীর হাতে সেইটি রেখে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। একটি কথা কইল না।

তিনি চকিতে বুঝলেন। চেকারকে বললেন, "দেখুন, আমি একখানা টিকিট ও আর একখানার দাম দিচ্ছি। জরিমানা যা লাগে তাও দেব।"

"হাওড়া বেনারস?" চেকার জিজ্ঞাসা করল।

"হাঁ।"

"ভায়া লুপ ?"

"হাঁ। ভাগলপুরে কাজ ছিল।"

চেকার দু টাকা বকশিশ পেয়ে কৃতার্থ হয়ে বলল, "গুড মর্নিং, ম্যাডাম।"

মধ্যবয়সিনী সম্মানে বললেন, "গুড-বাঈ, চেকার।"

উজ্জয়িনী এতক্ষণ জড়সড় হয়ে বসেছিল। গাড়ী চলতে আরম্ভ করলে গদগদ ভাবে বলল, "ধন্যবাদ। অজস্র ধন্যবাদ। কেমন করে এ ঋণ শোধ করব! আমার নেমে যাওয়া উচিত ছিল। আমি নেমে যাব, যা থাকে কপালে।"

তিনি তার টিকিটখানা নেড়ে বললেন, "না গো না।"

"কে আপনি? কেন আপনি আমার জন্যে ক্ষতিস্বীকার করলেন?" উজ্জয়িনী অর্দ্ধ রুদ্ধ কণ্ঠে অসম্বদ্ধ প্রশ্ন করে চলল। "বলুন, আপনার জন্যে আমি কী করতে পারি? কিসে এ ঋণ শোধ হবে? আপনি কি দেবতা? আপনি না থাকলে আজ আমার কী যে হত! কেমন করে জানলেন যে আমি এই ট্রেনে উঠব? আপনি কি সর্ব্বজ্ঞ?"

তিনি মৃদু হাসির ফুল ফুটিয়ে বললেন, "এই যে তুমি আমাকে বিনিময় দিয়েছ। হাতে কিছু পেয়েছি বলে হাত থেকে কিছু দিয়েছি।" উজ্জয়িনী বোধ হয় হীরার দাম জানে না, ছেলেমানুষ। এই অনুমান করে আরো বললেন, "তোমার টিকিটের চেয়ে এর দাম ঠিক কতটা বেশি তা যদি জানতে চাও তবে ডাক দেব ঐ মাড়োয়ারী শ্রেষ্ঠীকে। যদি তাকে বেচতে আপত্তি না থাকে তবে দেখবে এখন সে কত টাকা দেয়।"

উজ্জয়িনী সভয়ে বলল, "না, না। তাকে ডেকে কাজ নেই। আপনি ওটা রাখুন। ও হবে আমার স্মারক। কাল যখন আমাকে ভুলে যাবেন তখন এ যেন আপনার আঙুলে ঝলমল করে। দিন, পরিয়ে দিই।" এই বলে আগ্রহাতিশয্যে তাঁর দিকে এগিয়ে গেল।

তিনি এই অপরূপ মেয়েটির দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে কৌতুক হাস্য করলেন। শোকে অনিদ্রায় অনাহারে এর শ্যামল মুখ মসীময় হয়েছে। কেশের উপর পঙ্গপাল চরে বেড়িয়েছে। থান কাপড়ের ঘটা যৌবন গোপন করতে পারছে না। তিনি তাকে টেনে নিয়ে দুই হাতে জড়িয়ে পাশে বসালেন।

## ৪

বললেন, "বিধবামানুষ, এ অলঙ্কার বয়ে বেড়াও কেন?"

"বিপদে পড়লে মান বাঁচাব বলে।"

"বিপদের সম্ভাবনা কি আর নেই?"

"কে জানে!" উজ্জয়িনী নির্লিপ্তভাবে বলল, "যার আমি, সে-ই আমার মান বাঁচাবে, আমার আর ভয় নেই বিপদকে।"

মধ্যবয়সিনী তার হাতে একটু চাপ দিয়ে বললেন, "সে জন কে? কোন্ কামরায় উঠেছেন? তাঁকে এইখানেই আসতে বলা যাক?" মুচকি হেসে, "বাইরে লেডিজ লেখা আছে বটে। কিন্তু দিনের বেলা মিক্স্‌ড্ হলে কে বাধা দিতে যাচ্ছে?"

উজ্জয়িনী এবার গোপন করল না। বলল, "তার নাম কানু। সে আছে আমার সঙ্গে। সে আছে এই কামরায়। আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি।"

"তা হলে," মধ্যবয়সিনী কলহাস্য করে বললেন, "সে আমি!"

উজ্জয়িনী বুঝতে না পেরে সবিস্ময়ে বলল, "আপনি!" তার কী মনে হল, সে এক দৃষ্টে তাঁর দিকে চেয়ে রইল। তারপর কাতর স্বরে বলল, "কানু, এই কি তোমার ছদ্মবেশ। বল, বল। আমার গোড়াতেই সন্দেহ হয়েছিল যে ইনি অন্য কেউ নন। ইনি কানু। কানুর পক্ষে সকলই সম্ভব। কখনো মালিনী, কখনো দেয়াশিনী, বণিকরমণী কোনোদিন।"

মধ্যবয়সিনী বিমূঢ় হয়ে ভাবছিলেন কানু কে? তাঁর খেয়াল হল যে কানু কৃষ্ণ। এই তরুণী কি তবে কৃষ্ণকে ভালবেসে কুলত্যাগিনী হয়েছে? তিনি কিছু না বলে শুনে যেতে থাকলেন কানুর পরিচয়।

"কানু," উজ্জয়িনী বলে যেতে থাকল, "তপস্যা করে যোগী ঋষি তোমার দেখা পায় না, আমি অভাগিনী কী পুণ্য করেছি!" তার চোখ জলে পূর্ণ হয়ে এল। গলা আবেগে ভারী হল। সে আর কী বলল শোনা গেল না। কেবল তার বলার আকুলতা তার চারদিকে একটি বাঙ্ময় পরিমণ্ডল বিরচন করল।

মধ্যবয়সিনীর যেটুকু সংশয় ছিল সেটুকু দূর হল। কানু নিশ্চয় কৃষ্ণ। হতভাগিনী তাঁর সন্ধানে গৃহত্যাগিনী হয়েছে।

"আমি জানতুম," উজ্জয়িনী বলল। "আমি জানতুম, যদি সর্ব্বস্ব দিই তবে এই জন্মেই তোমাকে পাব। যারা তোমাকে পায় না তাদের আত্মসমর্পণে কুণ্ঠা থাকে বলেই পায় না।" এটুকু পরিষ্কার করে বলতে উজ্জয়িনী অনেক সময় নিল।

মধ্যবয়সিনী কোন্ প্রাণে বলবেন যে, তিনি কানু নন, তিনি সুশীলাবতী, প্রসিদ্ধ হিন্দী গায়িকা, কলকাতায় গ্রামোফোন

কোম্পানীর আহ্বানে গান দিতে গেছলেন, ফিরছেন তাঁর স্বধামে—কাশীতে। মেন লাইনের ট্রেনে খুব ভিড়, মেমসাহেবদের সঙ্গে রাত কাটাতে সাহস হয় না। নইলে লুপ লাইনে আসার উপলক্ষ ছিল না। এই নাম না-জানা তরুণবয়সিনীর সঙ্গে সাক্ষাতের সম্ভাবনা ছিল না।

"রাধে," তিনি তার হাতে হাত রেখে বললেন, "এতক্ষণ তোমাকে পরীক্ষা করছিলুম, এখন তোমাকে হাতে নিলুম।"

উজ্জয়িনী স্তম্ভিত হয়ে, সন্ত্রস্ত হয়ে, উল্লসিত হয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। কিছুতেই পা ছাড়ল না। তার বাক্‌শক্তি লোপ পেয়েছিল, মনে মনে বকে যেতে থাকল, কানু, কানু, কানু। শ্যাম, শ্যাম, শ্যাম। প্রিয়, প্রিয়তর, প্রিয়তম! হতভাগিনীর কী সৌভাগ্য! আমি জানতুম। আশ্চর্য, আমি কেমন করে জানলুম! বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ। বহু ভাগ্যে বিধি আনি মিলাইয়া দিল। আর বেঁচে কী হবে! জীবন সার্থক। এবার মরণ হোক।

মধ্যবয়সিনী—এখন থেকে তাঁকে আমরা সুশীলাবতী বলব—সুশীলাবতী এসব স্বগত উক্তি শুনতে পেলেন না। অনুমানে বুঝলেন নারীর আত্মনিবেদনের ভাষা। লজ্জায় কণ্টকিত হতে থাকলেন। মনে মনে আফসোস করলেন, আহা, আমি পুরুষ হলুম না কেন, তা হলে এই প্রবঞ্চনার দ্বারা প্রকৃতিবিপর্যয় ঘটত না।

উজ্জয়িনী কি ওঠবার নাম করে? সে একভাবে বকে যায়, পুরুষোত্তম, তোমাকে নিবেদন করব এমন নৈবেদ্য আমার কই! বঁধু, তুমি সে পরশমণি হে, বঁধু, তুমি সে পরশমমি। ও অঙ্গ পরশে এ অঙ্গ আমার সোনায় বরণখানি। সেই জন্যে তো তোমার চরণ

ধরে পড়ে রয়েছি। হোক আমার অঙ্গ সোনার বরণ। তবে তো তোমাকে দেবার মতো কিছু থাকবে। কী দিব কী দিব করি মনে করি আমি। যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি। তুমি সে আমার নাথ আমি সে তোমার। তোমার তোমাকে দিব কী যাবে আমার।

ট্রেন যখন আরায় দাঁড়াল উজ্জয়িনীর টনক নড়ল। জনতার বিচিত্র কোলাহল, উদ্যত কৌতূহল, তার সঙ্কোচবোধ ফিরিয়ে আনল। সে ধীরে ধীরে উঠে বসল। কিন্তু তার কানুর পাশে নয়। কানু যে পুরুষ, ওটা তো ওর ছদ্মবেশ মাত্র। কেউ না দেখতে পাক সে তো দেখতে পাচ্ছে কিশোর বয়স, চাঁচর কেশ, কণ্ঠে বনমালা, অধরে মুরলী। সে যে দেখছে এই যথেষ্ট নির্লজ্জতা।

সুশীলাবতী বুঝতে পারছেন যে মেয়েটি পাগল। কোনো প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে এর কাণ্ডজ্ঞান খণ্ডবিখণ্ড হয়েছে, তার এক একটি টুকরা বেশ আস্ত, কিন্তু সব জড়ালে তা ভগ্ন। পাগলের পাগলামি কি কথায়? তা মাথায়। এই পাগলিনীর আত্মনিবেদন তাঁকে ব্যাকুল করছে সমবেদনায়। এ যেন একটি বোবা মানুষ, এর আত্মপ্রকাশের বাসনা স্বাভাবিক। অথচ তার তাড়নায় যে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী সেইটে করুণাবহ। এই তরুণবয়সিনীর কৃষ্ণকামনা স্বামীকামনার বিকৃতি। সুশীলাবতী চিন্তা করছেন, বৈধব্য ছাড়া এর ব্যাধি আর কী হতে পারে।

উজ্জয়িনীর অভিভূত অবস্থা। হয়তো সে মূর্চ্ছা যাবে। কানু তার এত কাছে। সশরীরে। কোন্ কানু? যিনি গোবর্দ্ধন ধারণ করেছিলেন, বকাসুর অঘাসুর পুতনা বধ করেছিলেন। ত্রিভুবনজয়ী কংস যাঁর ঈষৎ স্পর্শে ভূপতিত। সেই বিরাট পুরুষ আজ

তার সমক্ষে। কে সে? সামান্য মানবদুহিতা। কীই বা তার পরিচয়? জীবনে সে কিছুই করতে পারেনি, কিছুই হতে পারেনি। সুন্দরী নয়, গৌরী নয়, নয় কলাবতী। শুদ্ধমাত্র ইচ্ছাশক্তির অনুশীলনে সে জগতের একমাত্র পুরুষকে তার নয়নপথবর্তী করেছে।

গাড়ী আবার কখন চলতে লেগেছে, অনেকটা চলে গেছে, উজ্জয়িনীর লক্ষ্য নেই। তার মনে পড়েছে যে তার কানু তাকে রাধা বলে সম্বোধন করেছেন। আহা। এ কি সত্য! না, মায়া! না শ্রবণবিভ্রম! রাধা। সে রাধা। সে রাধার অবতার। আশ্চর্য, একথা তার কখনো মনে হয়নি। অথচ রাধার সঙ্গে তার কত সাদৃশ্য। রূপের সাদৃশ্য নাই বা থাকল। রূপ কি নারীর সব? আর রূপ কি কেবল দেহের? কানুকে যা আনন্দ দেয় তা কি কেবল যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই তাঁহা তাঁহা সরোরুহ ভরই। যাঁহা যাঁহা ঝলকত অঙ্গ তাঁহা তাঁহা বিজুলি তরঙ্গ। যাঁহা যাঁহা নয়নবিকাশ তাঁহি কমল পরকাশ।

সে রাধা। তারই কথা লিখে গেছেন পদাবলীকার, তারই গান গায় কীর্ত্তনীয়া। তারই মূর্ত্তি মন্দিরে মন্দিরে। তারই রাজত্ব বৃন্দাবনে। উজ্জয়িনী তার অষ্টোত্তর শত নামের একতম নাম। উজ্জয়িনী নামে যারা তাকে ডাকে তাদের সে সাড়া দেয়, তা বলে সে কি উজ্জয়িনী? সে রাধা।

আশ্চর্য, আশ্চর্য। এতদিন এসব তার মনে পড়েনি! এইবার মনে পড়েছে। এই তো একে একে স্মরণে আসছে বৃষভানু রাজপুরী, বৃষভানু অবিকল যোগানন্দ। মাতার নাম কী জানি কী, মাতামহীর নাম মুখরা। এই বৃদ্ধাই তার সর্ব্বনাশ করেছে, তাকে জটিলার

পুত্র অভিমন্যুর সঙ্গে বিবাহ দিয়ে। এই তো ললিতা সখী, এই তো বিশাখা, এই চিত্রা। অয়ি চম্পকলতিকে!

ওদিকে তার কল্পনা যেমন সক্রিয় এদিকে তেমনি তার ইন্দ্রিয়। সে তার কানুর প্রতি সমস্ত শরীর উন্মুখ করে কানুকে সর্ব্বতোভাবে অনুভব করছে, ব্যবধান সত্ত্বেও। তার দৃষ্টি তার শ্রুতি তার ত্বক মুহুর্মুহু সীৎকার করে উঠছে। একে তো গ্রীষ্মের দিন, তার উপর এমন অনুভূতি। সহজনিঃসৃত স্বেদবিন্দুতে তার বদনমণ্ডল আচ্ছন্ন হচ্ছে। সে হস্তক্ষেপ করছে না। তা করতে গেলে স্বপ্ন ভেঙে যাবে, কানু হয়ত অন্তর্ধান করবে। যে হাত দিয়ে সে কানুর হাতের পরশ পাচ্ছে সেই হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঘাম মুছবে তা দিয়ে? না, না। সে এক মুহূর্ত্ত ছুটি নেবে না।

সুশীলাবতী তাকে উন্নয়ন উৎকর্ণ ও উৎসুক লক্ষ্য করে করুণার সহিত কৌতুক বোধ করছিলেন। কী মনে করে নিজের বার্থ ছেড়ে তার কাছে উঠে এলেন। তাকে এক হাতে ঘিরে আর এক হাতে শাড়ীর আঁচল দিয়ে তার মুখ মুছলেন। দেখলেন তার মুখে উদয়ারুণ রাগ। মৃদু হেসে বললেন, "এ রং কী দিয়ে মুছলে উঠবে?"

উজ্জয়িনী তখন মরণ কামনা করছিল—রভসে।

তিনি বললেন, "কি গো, রাধা! আনার বুঝি ক্ষুধা নেই। ভোগ লাগাবে না, প্রসাদ পাবে না?"

উজ্জয়িনী অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "তাই তো, তাই তো।" কিন্তু তার কাছে তো পয়সা নেই যে ফল কিনবে কি কিছু কিনবে।

"কী ভাবছ?" সুশীলাবতী অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করে বললেন, "ও কী?

এ বেলা আমার ওতেই চলবে। ও বেলা তোমার আপন হাতের কিছু দিও।”

সেই মাড়োয়ারীর উপহার। তরবেতর মিষ্টান্ন, পুরী, ফল। উজ্জয়িনী ইতস্তত করল। তার ওসব বাজারের জিনিসে রুচি ছিল না।

“বিদুরকে তো চেন। এ জন্মে বেচারার চেহারা অমন হয়েছে, তাই ওকে লোভী মাড়োয়ারী বলে ভ্রম হচ্ছে। এসব ঐ বিদুরেরই দেওয়া ক্ষুদকুঁড়ো।”

অন্য কেউ বললে উজ্জয়িনী বিশ্বাস করত না। কিন্তু কানু কি পরিহাসচ্ছলে মিথ্যে বলতে পারে! ও লোকটা তা হলে বিদুর! বিদুরকে অবশ্য রাধার চেনবার কথা নয়, বিদুর মথুরনাথের ভক্ত। তা হোক, ও তো রাধার ক্ষতি করেনি। ও তো অক্রূর নয়। আহা, বিদুর তবে লোকটা, মাড়োয়ারি বাবু নয়। কানুকে কত যত্ন করে খেতে দিয়েছে। প্রত্যেক স্টেশনে কানুর তত্ত্ব নিচ্ছে। বিদুর না হয়ে আর কে হবে! আর ঐ যে দাসীটা ওটা বোধ হয় বিদুর-পত্নী। পুরাণে বলে বিদুর ছিলেন দাসীপুত্র। ওই হয়তো বিদুরজননী। উজ্জয়িনী দেখতে পাচ্ছে, পুরাণে যা লেখা আছে সব সত্য। ট্রেনে আরো যে কত পৌরাণিক চরিত্র রয়েছেন, কানুকে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারবে।

৫

খাইয়ে খেয়ে এমন আনন্দ উজ্জয়িনী জীবনে পায়নি। এত দিন দেবতাকে যা দিয়েছে দেবতা স্পর্শ করেননি, অথচ দেবতার

প্রসাদ বলে সেই সামগ্রীর শত গুণ মূল্য. তার একটি কণিকা অপচয় করতে নেই। তাই উজ্জয়িনী আপনার ক্ষুধার মাপে দেবতার আহারীয় আহরণ করত। প্রকারান্তরে আপনার চরিতার্থতার ব্যবস্থা। সে এক অদ্ভুত আত্মপ্রবঞ্চনা। আজ তার প্রয়োজন হল না। দেবতা স্বয়ং স্পর্শ করেছেন, সেবন করেছেন, ভোজনক্রিয়ার যাবতীয় পদ্ধতি পরিপাটিরূপে সমাধা করেছেন। উজ্জয়িনী আজ যা করল তা দেবতার অনুসরণ, যা পেল তা দেবতার অবশিষ্ট। তাকে তার নিজের জন্যে হিসাব করতে হয়নি, যা তার কপালে জুটল তাই সে খেল।

মোগলসরাই স্টেশনে বিদুরের মা এসে তামাক সেজে দিয়ে গেল। উজ্জয়িনী জিব কেটে আপন মনে বলল, আমারি উচিত ছিল। যদিও আমি এর প্রণালী জানতুম না। যাক, দেখে রাখলুম. এর পরে আমার কাজ আমিই করব। কই, পূর্বজন্মে কানুর এ নেশা ছিল বলে তো স্মরণ হয় না। রাজপুত চিত্রকররা ওকে ও আমাকে—আশ্চর্য, আমাকেও—আলবোলা সমেত আঁকে. তা মনে পড়ছে।

সুশীলাবতী বড় আরাম করে তাকিয়ায় পিঠ রেখে পাক দেওয়া আলবোলার নল মুখে ছুঁইয়েছিলেন। অন্যান্য দাসীরা তাঁর পদসেবা করে। দু-চারটে রসের কথা হয়, তার বেশি হয় সংসারের কথা, সুখদুঃখের কথা। আজ তাঁর কেমন ফাঁকা ঠেকছিল। সেবার অভাব, কথার অভাব। পাগলের সঙ্গে পথযাত্রা। তাঁকে কিছু ফরমাস করলে সে করতেও পারে, না করতেও পারে। কী করা যায় তাকে নিয়ে। লোকের ভালো করা কি মুখের কথা! জীবনে তিনি অনেকের উপকার করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। এও লক্ষ্য করেছেন যে কিছু না করাই অনেক সময় প্রকৃত উপকার। তা বলে নিঃসম্বল পাগলকে—নারীকে—পথে বিবর্জন করা চলে না।

"ওগো রাধা," তিনি হেসে বললেন, "তোমার জিনিস গোছাও। কাশীর আর দেরি নেই।"

উজ্জয়িনীর খটকা বাধল। কাশী তো কৃষ্ণের স্থান নয়, কাশী হচ্ছে শিবের। অবশ্য হরি আর হর অভিন্ন। তা হলেও বৃন্দাবন রয়েছে কী জন্যে? কাশীতে কানুর কী কাজ? হয়তো শিবের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের আমন্ত্রণ। দেবতারা কি কেবল এক এক জন এক এক স্থানে অধিষ্ঠান করেন, মাঝে মাঝে মিলিত হন না?

সে তার নিজের জিনিস গোছানো ফেলে সুশীলাবতীর লটবহর নিয়ে মেতে গেল। তার নিজের বলতে যা বোঝায় তা সামান্য, আর তাও কি কানুর নয়? কেন যে কানু বলে 'তোমার?' ওগো, তোমার কথা তোমায় ফিরিয়ে দিই—'তোমার।'

"ও কী! ও কী!" সুশীলাবতী মৌখিক অনুযোগ করলেন। "ওসব থাক, স্টেশনে চাকররা আসবে, ওরা যেমন করে পারে নামাবে।"

উজ্জয়িনী অভিমান করে বলল, "আমার জিনিস বাঁধতে চাকর আসবে না, বাঁধব আমি। তোমার জিনিস বাঁধতে চাকররা আসবে।" চাকর শব্দের বহুবচনের উপর উজ্জয়িনী জোর দিল।

তার ঠোঁট উল্টানো সুশীলাবতীর ভারি মিষ্টি লাগল। এই প্রথম সে তুমি বলল। তাও মধুর। তিনি সকৌতুকে বললেন, "তুমি আমার কাছে এসে বস তো। থাক ওসব পড়ে।"

উজ্জয়িনী লজ্জায় মুখ তুলতে পারল না। যন্ত্রচালিতের মতো তাঁর পায়ের দিকে গিয়ে বসল। তার বেশি একটি কাজ করল না। ইচ্ছা থাকলেও স্পর্শ করল না তাঁর পা। লজ্জায় জড়সড় হয়ে বসে রইল।

কোথায় গেল তার শোকবোধ! তার বাবা কবে ছিলেন, কবে

অতীত হলেন—বৃষভানু রাজার মতো। কত যুগ কেটে গেছে, তাঁকে ভাল মনে পড়ে না। তিনি তো শাশ্বত নন। শাশ্বত পুরুষ আর শাশ্বতী নারী শুধু কানু আর সে। তারাই যুগে যুগে রূপে রূপে লীলা করে এসেছে। তাদের না আছে আদি, না অন্ত। কার জন্যে তারা শোক করবে। তারা যদি থাকে তবে তাদের পিতা হবার জন্যে বাসুদেবকে ও বৃষভানুকেও বারম্বার আসতে হবে। তারা শ্বাশত, ওঁরা শ্বাশতের আনুষঙ্গিক।

বাবা, আবার তোমাকে পাব, তোমার সঙ্গে জন্ম জন্মান্তরের সম্পর্ক। যতবার আমি জন্মগ্রহণ করব ততবার তোমার পিতৃত্বের আবশ্যক হবে। আমি রাধা, আমি তো সীতার মতো অযোনিসম্ভবা নই। বাবা, তোমার আমার দেখা হবে আবার।

তার চমক লাগল যখন চলন্ত গাড়ীর পাদানিতে উঠে কতকগুলো মানুষ ঝুলন্ত অবস্থায় চলল। "কাশী যাবেন, মা? হামি লিয়ে যাব।"

সুশীলাবতী সুন্দর হিন্দীতে তাদের ভৎর্সনা করে বললেন তিনি বিদেশিনী নন, কাশীবাসিনী।

উজ্জয়িনী মনে মনে হাসল। এরা এমন মূঢ়, কানুকে চিনতে পারছে না। কানুকেও অগত্যা একটা মিথ্যা কথা বলতে হল—সে বিদেশী নয়, কাশীবাসী। হা হা হা। কানু বৃন্দাবন ছেড়ে কাশীবাসী! কাশীই যে তা হলে বৃন্দাবন হয়ে উঠত। শিব যেতেন কোন্ ধামে?

ট্রেন দাঁড়াল। সুশীলাবতী তাঁর জরিন নাগরা পায়ে দিয়ে দরজা খুলে দিলেন। জনা চারেক পাগড়ীওয়ালা ষণ্ডামার্ক প্রচণ্ড সেলাম ঠুকে কামরায় ঢুকল, ঢুকে হেঁইও হেঁইও করে আড়াই মিনিটের মধ্যে সুশীলাবতীর সমস্ত মাল কুলির পিঠে চাপিয়ে দিল। উজ্জয়িনীর

পোঁটলাটি যেখানে যেভাবে ছিল সেইখানে সেইভাবে পড়ে রইল, অবজ্ঞায় তারা ওটি উপেক্ষা করল। উজ্জয়িনীকেই তারা আমলে আনল না। সামান্য একটি পোঁটলা যার সম্বল সে কেন তাদের নজরে পড়বে? তারা যে সম্পত্তির দ্বারা মানুষের মান সম্মান মাপে। তারা বড়লোকের চাকর। তাই বড়লোক ছাড়া অন্য সকলের বড়।

উজ্জয়িনী কার কাছে নালিশ করবে? ওরা যার চাকর সে কি লক্ষ্য করছে না ওদের অন্যায়? ওদের উপর রাগ না করে সে কানুর উপর অভিমান করল। কিন্তু তার অভিমানও যে কানু লক্ষ্য করছে তাও বোধ হল না। কানুর দৃষ্টি অনুসরণ করে সে দেখতে পেল ঐ মাড়োয়ারী বিদুর হাত যোড় করে দাঁড়িয়েছে। কানুর দৃষ্টিতে কোপের আভাস। যেন সে দৃষ্টি তিরস্কার করছে। কী অপরাধ করল নিরীহ ভক্ত বিদুর!

"রাধা," তিনি বিরক্তি দমন করে গম্ভীর স্বরে বললেন, "এস।"

দুটি মাত্র কথা। পোঁটলাটার কী হবে তা তিনি নির্দ্দেশ করলেন না। উজ্জয়িনী একবার সেটার দিকে মমতাভরে তাকাল, তারপর কানুর সঙ্গ নিল।

"হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ। ছোড় যাতী। ছোড় যাতী।" মাড়োয়ারি যেন এত ক্ষণে একটা উপলক্ষ্য পেল। কোথায় পোঁটলাটাকে দয়া করে নামাবে, না উজ্জয়িনীদের পিছন পিছন ছুটতে ছুটতে হাঁকতে হাঁকতে চলল, "ছুট গিয়া। ছুট গিয়া।"

সুশীলাবতী তাঁর চাকরদের শুধালেন, "ক্যা ছুট গিয়া?"

উজ্জয়িনী এর উত্তর দিল।

তিনি চাকরদের ধমক দিয়ে উজ্জয়িনীকে বললেন, "কানুকে পেয়ে সংসার ভুলো না গো। শ্যাম ও কুল দুই রাখতে হবে।"

উজ্জয়িনী ভাবল কানুর মুখে এ কী বাণী। কিন্তু ভেবে আর কী করবে। কানু যা বলে তাই শিরোধার্য।

সুশীলাবতীর মোটর তৈরি ছিল। উজ্জয়িনী তাঁর পাশে বসল। রাস্তার পর রাস্তা গলির পর গলি পেরিয়ে সে মোটর অভিমন্যুর মতো ব্যূহ ভেদ করতে করতে চলল। উজ্জয়িনী নামমাত্র চেয়ে দেখল, দু ধারে বাজার, কোথাও বাগান, কোথাও মন্দির। কানুর সঙ্গসুখ অনুভব করতেই তার চিত্তবৃত্তি তৎপর ছিল। তার জীবন সার্থক, সে ধন্য।

জীবন যৌবন সফল করি মানহু
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা।

একটা বড় গেটের সামনে মোটর দাঁড়াল। সমুচ্চ কপাট। দারোয়ান তারই অন্তর্গত জানালা খুলে দেখল মালিক স্বয়ং। অমনি কপাট দু ভাগ হয়ে গেল। সুশীলাবতী বললেন, "নাম। এটুকু পায়ে হেঁটে যাওয়া যাক। বসে থেকে থেকে খিল ধরে গেছে।"

উজ্জয়িনী সোৎসাহে বলল, "সেই বেশ।"

সোজা সিঁথির মতো রাস্তা। তার দু ধারে মোচার মতো আকৃতি অথচ তালের মতো উঁচু ফার শ্রেণীর গাছ। চলতে চলতে উজ্জয়িনী ভাবছিল কাশীতে কুঞ্জ আছে। এই তো নীপতমালবীথি। ওটা কী? একটা লেকের মতো। রাধাকুণ্ড, না শ্যামকুণ্ড? আর ওগুলো কিসের মূর্তি? বিলিতী স্ট্যাচু, না বস্ত্রহরণের পর ব্রজগোপিকা?

সুবৃহৎ অট্টালিকা। মারবেলের সোপান লতার মতো ঘুরে ঘুরে উঠেছে। সোনালী রঙের কাজ। হাতীর দাঁতের মতো সুগোল সুদীর্ঘ থাম। মারবেলের ছককাটা মেজে। প্রমাণাকার তৈলচিত্র দেয়ালে। নীচে ঢালা ফরাসের উপর ছবি আঁকা গালিচা, মখমলের

তাকিয়া, রেশমের ঝালর। ঝাড়লণ্ঠন। বিচিত্র বাদ্যযন্ত্র। কোনো কোনো কক্ষে বিলাতী আসবাব। একটি ঘরে দাঁড়ের উপর হীরামন পাখী।

সিঁড়ি বয়ে তেতলায় উঠে উজ্জয়িনী কাতরস্বরে বলল, "আর পারছিনে। পড়ে যাব।"

সুশীলাবতী তার হাতটা ধরে ফেলে আঁতকে উঠলেন। "এ কী! এত গরম কেন?" তার কপালে হাত রেখে চোখ কপালে তুললেন। "জ্বর!"

তাড়াতাড়ি তাকে টেনে নিয়ে যে ঘর সামনে পেলেন সেই ঘরে পুরলেন। প্রশস্ত পালঙ্কের উপর নিবিড় প্রাবরণী। সেই সবের নীচে দুধের মতো বিছানা। উজ্জয়িনীর আপত্তি ছিল, তার কাপড় ছাড়া হয়নি। কিন্তু মুখ ফুটে বলবার বল ছিল না। তিনি তাকে বিনা-বাক্যে শুইয়ে দিলেন। তারপর পাশের ঘর থেকে ডাক্তারকে করলেন টেলিফোন।

ক্রমে ক্রমে উজ্জয়িনীর বস্তুজ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে আসছিল। তার পারি-পার্শ্বিক তার চোখে স্বপ্নের মতো পট পরিবর্তন করছিল। ওগুলো থাম নয়, পাদপ। এটি একটি ঘর নয়, বিতান। পালঙ্ক একে বলে না, এ বেদী।

ও কি কানু তার কাছে এল? ওটা কি থার্মোমিটার, না বাঁশি? ঘড়ি, না সুদর্শন চক্র?

সব এলোমেলো। সব অদ্ভুত। মাকড়শার জাল। সে যেন মক্ষিকা। কানু যেন মাকড়শা। কোথায় এসে পৌঁছেছে সে। মরণ, মরণ, নিশ্চিত মরণ।

উজ্জয়িনী বিকারের ঘোরে কী যে বকল, কী যে শুনল, কী যে

খেতে চাইল, কী যে খেতে পেল, কে যে তাকে দেখতে এল, তার নাড়ী টিপল, তার বুকের শব্দ শুনল, কিছুই উপলব্ধি করল না।

দিন দুই পরে উজ্জয়িনী প্রকৃতিস্থ হল। জিজ্ঞাসা করল, "আমি কোথায় আছি?"

উত্তর পেল, "আমার বাড়ীতে।"

"আপনি কে।"

"তুমিই বল।"

উজ্জয়িনী স্মৃতির খেই খুঁজে পেল না। চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে বলল, "আমি তো পারলুম না।"

সুশীলাবতী বললেন, "কাল বলব।"

পরদিন উজ্জয়িনীকে বলতে হল না। দেখা হতেই সে বলল, "দিদি, কী হয়েছিল বলুন তো। আমি যত ভাবছি তত আশ্চর্য হচ্ছি। আপনার সঙ্গে ট্রেনে আলাপ, আপনি আমার টিকিটের দাম দিয়ে আমার মান রক্ষা করেন। তারপর?"

সুশীলাবতী স্মিত ও প্রীত ভাবে বললেন, "এই বার পাগলামি সেরেছে।"

উজ্জয়িনী বিস্মিত ভাবে বলল, "খুব পাগলামি করেছি, না?"

"করনি?" তিনি পরিহাসের সুরে পাল্টা প্রশ্ন করলেন। "তোমাকে দেখে যত খুশি হয়েছিলুম তোমার পাগলামি দেখে তত রাগ করেছিলুম, বোন। দুঃখ কার জীবনে নেই? তা বলে পাগল হয়ে যেতে হবে!"

উজ্জয়িনী লজ্জিত হয়ে নীরব রইল। লজ্জার চেয়ে যখন কৌতূহল প্রবল হল তখন আবদার ধরল, "বলুন, কী পাগলামি করেছি।"

সুশীলাবতী কী ভাবছিলেন। গাঢ়স্বরে বললেন, "আচ্ছা, বলব।

কিন্তু তার আগে তুমি আমার কয়েকটি কথার জবাব দাও। কেন তুমি বাড়ী ছাড়লে ?"

উজ্জয়িনীর মনে হল এ অতি অন্যায় অনুসন্ধিৎসা, অতি অভদ্র কৌতূহল। কিন্তু তার নিজের দিক থেকে যা ছিল তা অন্যায় বা অভদ্র না হলেও তা তো সেই মনোবৃত্তি। সে পরাভবের অভিমানে বলল, "থাক, আমি কিছু জানতে চাইনে। আমার প্রশ্ন আমি ফিরিয়ে নিলুম।"

সুশীলাবতী উচ্চ হাস্য করে ঢলে পড়লেন। বললেন, "সারেনি, সারেনি। পাগলামি তেমনি আছে। উঠি, কাল আসব।"

উজ্জয়িনী অধীর কণ্ঠে বলে উঠল, "এসে দেখবেন আমি চলে গেছি।"

সুশীলাবতী সামলে নিলেন। উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় যাবে ?"

"যেখানে যাচ্ছিলুম।"

"সেইখানেই তো এসেছ।" সুশীলাবতী দুষ্টুমি করে বললেন।

উজ্জয়িনী লাফ দিয়ে উঠে বসল। বলল, "বৃন্দাবন ?"

তিনি একটু দমে নিয়ে বললেন, "হাঁ—না—ধরতে গেলে বৃন্দাবনই। তবে লোকে বলে বেনারস।"

উজ্জয়িনী হাঁপাচ্ছিল। ভেঙে পড়ে বলল, "না। না। এ বৃন্দাবন নয়। বুঝেছি, এ বেনারস। এরই জন্যে কি আমি বাড়ী ছেড়েছিলুম ? আমি তো এ রাজসম্ভোগ চাইনি। আমারও এ জিনিস ছিল। আমাকে যেতে দিন।" বলল বটে, "যেতে দিন," কিন্তু উদ্যম প্রকাশ করল না। শরীরে বল নেই।

সুশীলাবতী মিনতির স্বরে বললেন, "আমি তোমাকে বৃন্দাবনে দিয়ে

আসব, বোন। আগে সেরে ওঠ। তোমার কপালে অনেক কষ্ট লেখা আছে, জানি। কিন্তু দুদিন সবুর করলে সে পালিয়ে যাবে না, বরং তাকে সইবার সামর্থ্য হবে।”

ধীরে ধীরে উজ্জয়িনী পোষ মানল। কখন এক সময় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শুধাল, “যা বলব তা গোপন রাখবেন তো?”

“রাখব।”

“তিন সত্যি?”

“সত্যি, সত্যি, সত্যি।”

“বলি তা হলে।” বলবার উদযোগ করে উজ্জয়িনী স্থির করতে পারল না কোন্‌খান থেকে শুরু করবে। নিজের নামটা বলবে কি? সেটা বাদ দিলে তার বাবার নামও চাপা দিতে হয়। তা হলে কারুর নাম করা উচিত হবে না, তার শ্বশুরেরও না, স্বামীরও না।

“আমি,” উজ্জয়িনী কাহিনীর রাজ্যে পা বাড়িয়ে দিল, “বিধবা নই, সধবা। আমার স্বামী আছেন প্রবাসে।” লক্ষ্য করল, সুশীলাবতী নিঃশ্বাস ধারণ করছেন।

“স্বামী আছেন প্রবাসে। তিনি আমাকে স্ত্রী বলে স্বীকার করেন না। ভুলেও একখানা চিঠি লেখেন না, খবর নেন না। আমি তাঁকে দোষ দিইনে। তাঁর বিশ্বের ভাবনা।” লক্ষ্য করল, সুশীলাবতী সে কৈফিয়ৎ গ্রাহ্য করছেন না, মাথা নাড়ছেন।

“আমি আমার বাবার হাতে মানুষ।” উজ্জয়িনীর চক্ষু সজল হয়ে এল। “তিনি নাস্তিক ছিলেন।” ‘ছিলেন’ বলতেই বর্ষণ নামল। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, “বাবা নেই। বাবা চলে গেলেন।”

সুশীলাবতী ভাবলেন অনেক দিনের ঘটনা। এখনো তাই নিয়ে কাঁদে কেন? কী বলে সান্ত্বনা দেবেন ঠাহর করতে পারলেন না।

উজ্জয়িনী বিহ্বলভাবে বললে, "আমি একবার শেষ দেখা দেখতে পেলুম না।"

স্বামী দেখতে পারে না, বাপ মারা গেছে। এই তো গল্প। সুশীলাবতী আশা করেছিলেন রোমাঞ্চকর ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত। নিরাশ হলেন। নারীর সাধারণ ভাগ্যের প্রতি তাঁর নারীসুলভ মমতা ছিল, অনুকম্পা ছিল। নূতন না হলেও তার জন্যে নূতন করে দুঃখ হয়। বললেন, "আহা! কী আফসোস! শেষ দেখা দেখতে পেলে না।"

কাহিনীর সূত্র হারিয়ে গেছল। ফিরে পেয়ে উজ্জয়িনী বলল, "যাক সবাই। কারুর জন্যে আমার আফসোস নেই। একজন যদি থাকে।" ফিক করে হেসে বলল, "সে জন কে বলব?"

সুশীলাবতীর গতায়ু আশা পুনরুজ্জীবিত হল। তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, "কে?"

"কে আবার? জানেন না বুঝি?" রসিয়ে রসিয়ে বলল, "কানু।"

এই রে! পাগলামি ফের শুরু। সুশীলাবতী ব্যঙ্গ করে বললেন, "তাই বল। আমি ভাবছিলুম কোনো সামান্য পুরুষ।"

"আমি কি কখনো সামান্য পুরুষের প্রেমে পড়তে পারি!" উজ্জয়িনী মাথা হেলিয়ে দুলিয়ে স্বর নাচিয়ে নাচিয়ে এমন থিয়েটারি ভঙ্গীতে বলল যে সুশীলাবতী হেসে উঠলেন। রঙ্গ করে বললেন, "দেখো যেন সামান্য পুরুষকে কানু বলে ভুল কোরো না।" একটু থেমে, "তা তুমি করবে, জানি।"

উজ্জয়িনীর মনে পড়েছিল তার ভ্রান্তি। সুশীলাবতীকে নারীর ছদ্মবেশে কানু বলে বিভ্রম। সে রেগে উঠে বলল, "যান। সকালবেলা বাবা চলে গেলেন, সন্ধ্যাবেলা সংবাদ পেয়ে আমার বুদ্ধিও গেল চলে। অনিদ্রা, অনাহার, পদব্রজ—ওঃ এত কাণ্ডের পর আমার যদি কাণ্ডজ্ঞান

না থাকে, যদি আমার সঙ্কটতারিণীকে আমার প্রভু বলে ভুল করে থাকি তবে তা কি আমার জ্ঞানকৃত পাপ?”

এই মেয়েটির যে সদ্য পিতৃবিয়োগ হয়েছে তা জানতে পেয়ে সুশীলাবতী মর্মপীড়িত হয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও ক্ষ্যাপাতে ছাড়লেন না। বললেন, “তুমি বলতে চাও সেটা তোমার অজ্ঞানকৃত পাপ? কিন্তু পাপ কি আমি ঘুণাক্ষরেও বলেছি? ভালোবাসা কি জ্ঞানকৃত পাপ যে ভুল করলে সেটাকে বলবে অজ্ঞানকৃত পাপ?”

উজ্জয়িনী কোণঠাসা হয়ে বলল, “ভালোবাসা পাপ বই কি, তবে কানুকে ভালবাসা হচ্ছে সম্পূর্ণ অলৌকক, তা পাপপুণ্যের উর্ধ্বে।”

সুশীলাবতী ভ্রূভঙ্গী করে বললেন, “বটে!”

উজ্জয়িনী কতক কৌতুকে কতক ক্রোধে তাঁর অনুকরণ করল। প্রতিধ্বনি করল।

তিনি দুই হাত তুলে খোঁপা ঠিক করতে করতে বললেন, “খুব বই পড়েছ বুঝি! পুঁথির শিক্ষা নিশ্চয়।”

“কী রকম?” উজ্জয়িনী কৈফিয়ৎ তলব করবার সুরে বলল।

“কী রকম!” সুশীলাবতী সপ্রতিভভাবে শুধালেন, “স্বামীকে কোনোদিন ভালবেসেছিলে?”

উজ্জয়িনী লাল হয়ে কম্পিত স্বরে বলল, “সে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। ব্যক্তিগত বিষয়ে প্রশ্ন—” তা যে কী ভয়ানক, উজ্জয়িনীর ইঙ্গবঙ্গ সংস্কার তাকে শক পাইয়ে দিল, সে থেমে গেল।

সুশীলাবতী তামাসা করে বললেন, “মেয়ের এদিক নেই ওদিক আছে। বাল, এতক্ষণ যা হচ্ছিল তা কি তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়?” তারপর, “আহাহা! স্বামীকে ভালোবাস কি না জিজ্ঞাসা করলে স্ত্রীর হয়ে যায় অপমান!”

উজ্জয়িনী পরাস্ত হল। বলতে যখন আরম্ভ করেছে তখন সবটা বলা সঙ্গত। প্রসন্ন মনে বলল, "দিদির কাছে সঙ্কোচ কিসের? আর আপনি তো আমার সঙ্কটতারিণী।" দু-একবার ইতস্তত করে বলল, "হাঁ। তাঁকে ভালবেসেছিলুম।"

সুশীলাবতী দরদের সঙ্গে বললেন, "তা হলে তুমিই বল দেখি ভেবে, স্বামীকে ভালোবাসা ও কানুকে ভালোবাসা দুইয়ের মধ্যে এমন কী তফাৎ যার দরুন একটিকে বলতে পার পাপ, অপরটিকে পাপপুণ্যের উর্ধ্বে?"

উজ্জয়িনী ভেবে বলল, "আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।"

সুশীলাবতী স্নিগ্ধ হেসে বললেন, "কেবল পুঁথি আর পুঁথি। জ্বরের ঘোরে যত প্রলাপ বকেছ সমস্ত পুঁথির বিদ্যা। সেইজন্য আমার সন্দেহ হয় তোমার কৃষ্ণপ্রেম প্রত্যক্ষ অনুভূতি নয়। পুস্তকের রাজ্যের স্বপ্ন।"

উজ্জয়িনী যেন ধরা পড়ে গেল। ভীতভাব গোপন করে আমতা আমতা করে বলল, "কি যে বলেন! হুঁ, যত সব বাজে কথা।"

"আমার বয়সে," সুশীলাবতী অতীতমনস্ক হয়ে উদাসমধুর স্বরে বলে যেতে লাগলেন, "আমি উপন্যাস পড়তে পড়তে এমন তন্ময় হয়ে যেতুম যে মনে হত, উপন্যাসের রাজ্যই সত্য, আর আমি সেই রাজ্যে বাস করছি। আপনাকে আমি উপন্যাসের নায়িকা রূপে কল্পনা করে নায়কের সঙ্গে প্রেমে পড়বার ভান করতুম।" বর্তমান কালে প্রত্যাবর্তন করে বললেন, "কিন্তু সে তো সত্য নয়, সে ভান। যতই সুন্দর হোক, সে অন্তঃসারশূন্য।"

উজ্জয়িনী আগ্রহসহকারে বলল, "বলুন না, দিদি, আপনার বয়সের গল্প।"

"কী রকম?" তিনি কপট কোপে কৃত্রিম কণ্ঠে বললেন, "আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার—" তারপর হেসে ফেলে বললেন, "আমি সামান্য রমণী। হয়তো সামান্যেরও অধম। তোমার মতো পাপপুণ্যের উর্ধ্বে নই।"

৭

উজ্জয়িনী যতদিন অসুস্থ পড়ে রয়েছিল, ততদিন পুরী ছিল নিঝুম। যেই রাজকন্যার ঘুম ভাঙল, অমনি যেন হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, দেউড়ীতে দ্বারী, কারাগারে বৈতালিক—দিকে দিকে লোক লস্কর সৈন্য সামন্ত জাগল, কলরব করল মালঞ্চের পাখীরা, নহবত বাজল অভ্রভেদী মঞ্চে।

এ বাড়ী শহরের বাইরে নয়, তাই শহরের ধ্বনিতরঙ্গ এর পারে এসে ভেঙে পড়ছে, প্রতিহত হয়ে ফিরে যাচ্ছে। উজ্জয়িনী বারান্দায় আরামকেদারার কোলে শিশুর মতো শুয়ে নব জাগরণের সাড়া ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে অনুভব করল। আবার তার চরণে এল গতিবেগ, তার সাধ গেল বেরিয়ে পড়তে। বৃন্দাবনের পথে বিশ্রামের অবকাশ কই? কানু যে তাকে অহরহ আহ্বান করছে।

কিন্তু এখনো তার শরীরে বল সঞ্চিত হয়নি, সে চলতে গিয়ে টলে পড়ে। বিশ্রাম তাকে করতেই হবে। দিদিকে তার মন্দ লাগছে না, যদিও জানে না তিনি কে। মাতাজী মাসী বলেছিল, পথকে ভয় করিসনে, জয়ি! বিশ্বাস করিস। পথে পা দিলে দেখবি

পদে পদে বন্ধু, দু-চারটে শত্রু থাকলই .বা। সেই কথা উজ্জয়িনীর মনে পড়ল। সত্যই তো। একবার বেরিয়ে পড়তে পারলে তারপর সব সোজা, কেমন করে কি যে ঘটে যায়, কে যে সহায় হয়, কোথায় যে আশ্রয় জোটে! আশ্চর্য, আশ্চর্য। কেবল ভয়কে দিতে হবে বিসর্জন। উদ্বেগকে দিতে হবে বিদায়। উজ্জয়িনী আপন মনে বলল, আমার বেলা সে প্রশ্ন ওঠেই না, তার প্রয়োজনই নেই। কানুকে আমি সর্ব্বস্ব দিয়েছি, তারি মধ্যে দিয়েছি দ্বিধা লজ্জা ভয়। আমার কী আছে যে যাবে? যার খুশ সে আমাকে বলুক কুলটা, বলুক প্রগল্ভা, বলুক রূপলাবণ্যহীনা। সংসারী মানুষের বিচারে আমার কী আসে যায়? তারা নিজেরাই তো কৃপার পাত্র, বিচার করবার অধিকার কে তাদের দিল!

যতদিন সে অসুস্থ ছিল ততদিন এ বাড়ীতে গানবাজনা বন্ধ ছিল। আর বাধা নেই। সন্ধ্যাবেলা বৈঠকখানায় আসর বসল। উজ্জয়িনীকে কেউ ডাকল না, সে বারান্দায় শুয়ে শব্দই কেবল শুনতে পেল, মানুষের হাবভাব দেখল না। বুঝতে পারল গান করছেন তার দিদি একা, মাঝে মাঝে দুই-একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করছে অথবা ফরমাস করছে। কখনো কখনো কারুর মন্তব্যের পর হাসির রোল উঠছে। তবলার বোল, তম্বুরার রণন গানের সঙ্গে চমৎকার মিশে গেছে, কোনটা গান ও কোনটা বাদন তা বিচ্ছিন্ন করে বলা কঠিন। উজ্জয়িনী কোনোটাই বোঝে না, না ভাষা না রাগিণী, না তাল না ঠাট। তাই সে মেনে নেয় যে তার ভালো লাগছে তাই ভালো।

যখন দেখা হল সে অনুযোগের সুরে বলল, "দিদি, আমাকে ডাকলেন না যে?"

"ওমা, তুমি কী করতে যাবে!" তিনি গালে হাত রেখে বললেন, "ওরা সবাই যে পুরুষ।" ঈষৎ ব্যঙ্গ করে বললেন, "সত্যি বলছি, ওদের কেউ কাম্য নয়।"

উজ্জয়িনী ফস্ করে শুধিয়ে বসল, "পুরুষদের মধ্যে তুমি গেলে কী করতে?"

"গান করতে।"

"আমিও যেতুম গান শুনতে।"

সুশীলাবতী বারম্বার ঘাড় নাড়লেন। বললেন, "একে তো বাড়ী ছেড়ে এসে ভুল করেছ, তার উপর পুরুষদের পাল্লায় পড়লে মরবে।"

উজ্জয়িনী রুষ্ট হয়ে বলল, "নিজের উপর যতটা বিশ্বাস, পরের উপর ততটা থাকলে যুক্তিসঙ্গত হত।"

তিনি আহত হলেন। তার হাত ধরে বললেন, "তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ। তোমার পর রাগ করতেও হাসি পায়। তুমি এখনো বুঝতে পারনি আমি কে। বল তো আমি কে?"

উজ্জয়িনী বলল, "কেমন করে জানব কে?"

তিনি তার চোখে চোখ রেখে শান্তভাবে বললেন, "একজন বাঈজী।"

উজ্জয়িনীর মনে হল সে মাটিতে মিশিয়ে যাবে। লজ্জায় সে চোখ চাইতে পারছিল না। একজন বাঈজীর বাড়ী সে অতিথি। তার অধোগতি হল যে। কোথায় বৃন্দাবনের ভূস্বর্গ, কোথায় বেনারসের নরক। ছি ছি।

তিনি টের পেয়ে বললেন, "ঘৃণা করলে তো!"

উজ্জয়িনী নিরুত্তর।

তিনি তার হাত ছেড়ে দিয়ে বললেন, "ভয় নেই। তোমার কোনো ক্ষতি করিনি, কোনো ক্ষতি করব না। বরং সম্ভব হলে

তোমাকে নিবৃত্ত করে বাড়ী পাঠিয়ে দেব।” প্রত্যয়সহকারে বললেন, “আমি জানি তোমার কী দশা হবে, যদি কথা না শোন। এই শহরেই কত হতভাগিনী রয়েছে—চাও তো তাদের দেখাতে পারি—যারা তোমারি মতো সরল প্রাণে আশার ছলনায় চলে এসেছিল, মহৎ লক্ষ্যের পানে।”

উজ্জয়িনী বিশ্বাস করল না। সে কি সাধারণ স্ত্রীলোক? আত্মহত্যা করতে তার কতক্ষণ লাগবে যদি ধর্ষকের সম্মুখীন হয়?

“বোন,” তিনি গাঢ়স্বরে বলতে লাগলেন, “তুমি আমার কাহিনী শুনতে চেয়েছিলে। আজ বলতে পারিনি, পারব না। আর এক দিন শুনতে চাও তো বলব। যাও, ঘুমিয়ে পড়। অনর্থক ঘৃণায় জেগে থেকো না। মনে রেখো যারা এ পথে আসে তারা সব সময় স্বেচ্ছায় আসে না, আসে ঘটনাচক্রে, যেমন করে তুমি এসেছ, বোন। কে জানে তোমার কপালে কী লেখা আছে। যদি কথা না শোন।”

উজ্জয়িনীর প্রতিবাদ করতেও প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। কী জঘন্য জায়গায় সে আজ আপনাকে আবিষ্কার করেছে! বেশ্যালয়! তার সমস্ত সংস্কার এর সম্পূর্ণ প্রতিকূল। নিখিল বিশ্বে এর মতো বীভৎস আর কিছু নেই, রাক্ষস খোক্কস যদি থাকে তবে তাদের দেশও এর মতো বিভীষিকা নয়। এর নামটাকে পর্যন্ত তার পরিবারে অশ্লীল মনে করা হয়, এর সংশ্রব তো অকল্পনীয়। হায়, হায়, তার ফাঁসি হল না কেন?

প্রবল বিবমিষা কেবল তার উদর থেকে নয়, তার মনে হল তার পায়ের তল থেকে উঠে আসছে। দমন করে রাখে কার সাধ্য! কোনোমতে নিজেকে তুলে নিয়ে সে ছুটে চলল তার শোবার ঘরে। কিন্তু ঐ শয্যাও তো অশুচি। না জানি কারা সব কত রাত

কাটিয়েছে ওতে। ছুরি দিয়ে গা থেকে চামড়া ছাড়ালে যদি শরীরের গ্লানি দূর হয়। বাণবিদ্ধ প্রাণীর মতো আর্ত্ত হয়ে সে সারা কক্ষ আবর্ত্তন করল। এক ফোঁটাও কেরোসিন তেল নেই যে কাপড়ে ঢেলে অগ্নিস্নান করবে, ঘরের আলো যে বিজলির। তার হঠাৎ খেয়াল হল স্নানের ঘরে কল আছে। সেই কলে চব্বিশ ঘণ্টা জল আসে। তারি নীচে আজ সারারাত বসবে, কাল হবে নিমোনিয়া, পরশু মরে যাবে।

সুশীলাবতী থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। যে মেয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে আসতে পারে সে মেয়ে এমন কি সতী যে বাঈজীর উল্লেখ-মাত্র উন্মাদ হয়! ঢং, ঢং, ওটা একটা ঢং। বাড়াবাড়িতে ধরিয়ে দিচ্ছে ওর নাটুকেপনা। এই মেয়েটির প্রতি তাঁর স্নেহভাবের সঞ্চার হয়েছিল। এমনি মিষ্টি করে তাঁকে কেউ দিদি বলে ডাকেনি। কিন্তু একটুও সহবত শেখেনি! ঘৃণা করতে চায় করুক, কিন্তু তারও একটা ভদ্র প্রকাশরীতি আছে, মাত্রা আছে। আর তিনি কি যে-সে বাঈজী! তিনি সুশীলাবতী। তামাম্ হিন্দুস্থান তাঁর সঙ্গীতের আদর করে। কাশীতে যখনি কোনো রাজা মহারাজা শেঠ সওদাগর বিশ্বনাথের দর্শনপ্রার্থী হন তখন সুশীলাবতীর সঙ্গীতশ্রবণপ্রার্থীও হয়ে থাকেন। সেই সুশীলাবতীর প্রতি ঈদৃশ আচরণ! ধিক, ধিক সতীত্বাভিমানিনী। সুশীলাবতী উজ্জয়িনীর পরিত্যক্ত আরামকেদারায় দেহভার অর্পণ করলেন।

রাত তখন এগারটা বাজে। তাঁর খাবার দেরি হয়ে যাচ্ছে। দাসী এল ডাকতে। তিনি বললেন, "খাব না।"

উজ্জয়িনীর পথ্যাহার সন্ধ্যাকালে হয়েছিল। সকাল সকাল ঘুমতে না গিয়ে সে যে এতক্ষণ বারান্দায় বসে থাকবে তা কে জানত।

দাসী উপরোধ করে ব্যর্থ হল। তিনি মাঝে মাঝে লঙ্ঘন দিয়ে থাকেন। দাসী ঠাওরাল আজও তাই। দাঁড়াল না। তিনি সেইখানে একাকী পড়ে থাকলেন। অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে ভাবতে থাকলেন গৃহস্থের মেয়েদের কথা। কেন তাদের এহেন ঔদ্ধত্য? তারা কি বাস্তবিক কায়মনোবাক্যে সতী, লেশমাত্র আবিলতা নেই তাদের চরিত্রে, তাদের জীবনযাত্রায়? আর কী সংকীর্ণ তাদের জীবনযাত্রা! কী করুণ! বছরে বছরে সন্তানসম্ভাবনা, মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি, কায়ক্লেশে উদ্ধার। তারপর সে সন্তান মরতেও পারে, বাঁচতেও পারে, মূর্খও হতে পারে, চোরও হতে পারে। স্বামীর সোহাগই বা কয়জন পায়! কয়টা ক্ষেত্রে রাজযোটক ঘটে! অধিকাংশ স্থলেই তো অসামঞ্জস্য। কেন তবে তাদের এ অহঙ্কার!

সহসা তাঁর কানে গেল কলের জলের কল কল শব্দ। কান পেতে তাক করলেন। বুঝলেন এ শব্দ উজ্জয়িনীর স্নানের ঘর থেকে আসছে। এত রাত্রে জ্বরো রোগী স্নান করছে কী! তিনি শশব্যস্ত হয়ে ছুটলেন। শোবার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে হেঁকে বললেন, "আসতে পারি?" সাড়া না পেয়ে ধাঁ করে ঢুকে পড়লেন। দেখলেন বিছানায় বা কোথাও উজ্জয়িনী নেই, স্নানের ঘর থেকেই জলকোলাহল উত্থিত হচ্ছে। তার দ্বারে টোকা দিয়ে বললেন, "কলটা বন্ধ করে দাও।" দরজা কিছু ফাঁক ছিল, উজ্জয়িনী শুনতে পেল। তৎপরতার সহিত কল বন্ধ করে সে জলকোলাহলের কণ্ঠরোধ করল।

সুশীলাবতী রাগতভাবে বললেন, "তুমি আমার বন্দিনী! আমার আদেশ, ঘুমতে যাও।"

এই বলে তিনি এক মুহূর্ত তিষ্ঠলেন না। দ্রুত পদে প্রস্থান করলেন।

উজ্জয়িনীর বাস্তবিক স্নানের অভিলাষ ছিল না। স্নান করতে চেয়েছিল ঝোঁকের মাথায়। মাথায় ফোঁটাকয়েক জল পড়তেই বুদ্ধি ফিরে এল। কিন্তু বুদ্ধির চেয়ে প্রবল হল জেদ। দেখা যাক পারি কি না সারা রাত ভিজতে। হয়তো আর কয়েক মিনিট পরে আপনি ক্ষান্তি দিত। সুশীলাবতীর আদেশ তাই তার ইচ্ছার পোষক হল। সে বলল, কল না বন্ধ করে গতি আছে? যাঁর বাড়ী তাঁর হুকুম। কিন্তু বন্দিনী আমি তাঁর নই। আমার কানু থাকতে আমাকে বন্দিনী করে রাখবে কার এত ক্ষমতা।

শুকন কাপড় পড়ে উজ্জয়িনী শোবার ঘরে চলল। সেখানে দেখল তকতকে মারবেলের মেজের উপর আঁচল পেতে শোওয়া যায়। ঝাঁট দিয়ে তার একাংশ নির্ধূল করে পরমানন্দে গড়াগড়ি দিল। ঐ অশুচি শয্যার চেয়ে এতেই বেশি আরাম, মনকে স্তোক দিয়ে ঘুমকে ঘুষ দিল। কানুর নাম জপতে জপতে কখন এক সময় কানুকে স্বপ্নে দেখতে পেল।

য়্যালিসের য়্যাড্‌ভেঞ্চার উজ্জয়িনীর পড়া ছিল। ভোরে যখন তার ঘুম ভাঙল তার কি মনে হল, সে হাত তালি দিয়ে বলে উঠল, "বা, বা, কী মজা! আমি বন্দিনী! এ এক মন্দ য়্যাড্‌ভেঞ্চার নয়। এতে বিপদ আছে।"

কিন্তু তার মুখ শুকিয়ে গেল যখন জলখাবারের সময় হল, থালাভরা মিষ্টান্ন এল। সে আর এ বাড়ীর জল স্পর্শ করবে না, যায় যাক জীবন। সে বলল, "মৈ কুছ নহি খাঁউগি।"

দাসী গিয়ে রিপোর্ট করল। সুশীলাবতী ডেকে পাঠালেন।

তিনি ছিলেন তাঁর বিলিতী বৈঠকখানায়। একখানা ইংরেজি চিত্রপত্রিকা খুলে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলেন। উজ্জয়িনীকে দেখে বললেন, "মনে আছে তো তুমি আমার বন্দিনী।"

উজ্জয়িনী ফূর্তি করে বলল, "হুজুর!"

"তবে যে শুনলুম তুমি কিছু খাবে না।"

"হুজুর!"

"যারা বন্দী তারা খেতে বাধ্য। মনে কর জেলখানায় আছ।"

"হুজুর জোর করে খাওয়ালে কী করতে পারি, কিন্তু স্বেচ্ছায় খাব না।"

"তবে তাই হবে।" হেসে বললেন, "এখন এখানে বস।"

উজ্জয়িনীর দাঁড়াবার সমর্থ্য ছিল না। বসল, কিন্তু আণ্ডার প্রোটেস্ট। তার মনে পড়ে হাসি পাচ্ছিল একজনের গল্প। তাঁর সংকল্প ছিল তিনি মেম বিয়ে করবেন, কালো মেয়ে বিয়ে করবেন না। কিন্তু বাদলেরই মতো তাঁরও বিয়ে দেওয়া হল একটি কালো মেয়ের সঙ্গে, তার মানে দেশী মেয়ের সঙ্গে। তিনি বললেন, আমি এ বিয়ে করেছি বটে, কিন্তু আণ্ডার প্রোটেস্ট।

"এবার বল," সুশীলাবতী আদেশ করলেন, "তোমার নাম কী?"

"আমার নাম," উজ্জয়িনী সময় নিয়ে বলল, "অনামিকা।"

"বিশ্বাস করলুম না।"

"আমার দুর্ভাগ্য।"

"যাক, আসল নাম নিয়ে কী হবে। আমি তো পুলিশ নই। তোমাকে ঐ নামে ডাকলে যদি তুমি সাড়া দাও, যদি রাগ না কর, তবে ঐ তোমার নাম।

উজ্জয়িনী বিদ্রোহ করতে এসেছিল, ব্যবহারে প্রসন্ন হয়ে

পতাকা তুলল না। সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করল, "আপনার নাম কী।"

"যদি বলি," তিনি মুচকি হেসে বললেন, "আমার নামও অনামিকা?"

"তা হলে আমিও বিশ্বাস করব না।"

"থাক তবে ভাঁড়িয়ে কাজ নেই। আমার নাম রক্ষাকালী কিম্বা দিগম্বরী নয় যে লজ্জায় পাল্টে দেব। আমার নাম সুশীলাবতী।"

উজ্জয়িনী মনোযোগ করে বলল, "সুশীলাবতী। ও নাম আমার অজানা নয় বোধ হয়।"

"তাই নাকি! আমার সৌভাগ্য।"

উজ্জয়িনী বলল, "কিন্তু ও নাম তো বাঙালীর হয় না।"

"আমি তো বাঙালী নই।"

"তবে এত ভাল বাংলা বলেন কেমন করে?"

"ভাল বাংলা বলি? আরো সৌভাগ্য।"

"সত্যি আমার তো ধারণাই ছিল না যে আপনি হিন্দুস্থানী।"

"শুনেছি আমার মা বাবা ছিলেন গুজরাটী, তীর্থ করতে এসে কলেরায় মারা যান।"

"আহা: তাই নাকি।" উজ্জয়িনী বিগলিত হয়ে বলল, "তখন আপনার বয়স কত?"

"তা যদি জানতুম তবে মা বাবাকে মনে থাকত। শুনেছি তখন আমি শিশু।"

উজ্জয়িনী ভুলে গেছল যে এগুলিও ব্যক্তিগত বিষয়। জিজ্ঞাসা করল, "তবে আপনাকে মানুষ করল কে?"

"আমাদের কি তোমরা মানুষ বলে গণ্য কর!" তিনি

অভিমানের স্বরে বললেন। "মানুষ নয়, বাঈজী করল কে। এই তো তোমার জিজ্ঞাসা ?"

উজ্জয়িনী চুপ করে রইল।

"বাঈজী করলেন একজন বাঈজী। আমাকে কুড়িয়ে পেয়ে পালন করলেন।"

উজ্জয়িনী প্রক্ষেপ করল, "তা হলে আর আপনার দোষ কী ?"

তিনি তাকে জেরা করলেন, "কেন, বাঈজী হওয়া বুঝি দোষের ?"

উজ্জয়িনী আমোদ পেয়ে বলল, "না। গুণের।"

তিনি যেন এতক্ষণ এরই একটা হেস্তনেস্ত করবার সুযোগ খুঁজছিলেন। বললেন, "তুমি তো বাঈজী নও। তুমি এমন কি সুখী ?"

"আমার কথা," উজ্জয়িনীর মনে পড়ল প্রশ্নটা বড় ব্যক্তিগত, মুখ ফুটে বলল, "আলাদা।"

"বেশ। তোমার কথা না হয় আলাদা, কিন্তু বল দেখি সত্য করে, ক-জন গৃহস্থের বউ সুখী।"

উজ্জয়িনী নিশ্চয় করে বলতে পারছিল না। তবু দৃষ্টান্ত দিল বীণার, মীরা ব্যানার্জীর।

সুশীলাবতী হাসলেন। বললেন, "নারী তো। তা হলেই দুঃখিনী। খোঁজ নাও। খোঁচাও। বাইরে থেকে কতটুকু বোঝা যায় !"

উজ্জয়িনী মেনে নিল। হয়তো ওদের কোনো গভীর দুঃখ আছে, যা ভাষাযোগে ব্যক্ত হয় না। ওদের সঙ্গে সে আলাপ করেছে মাত্র, একত্র বাস করেনি। ওরাও তো ভাবতে পারে সে সুখী, তার সাংসারিক অভাব নেই, তার স্বাস্থ্য ভালো।

"অতএব," সুশীলাবতী বিজয়ীভাবে বললেন, "বাঈজী হওয়া দোষের নয়। যদি শুধুমাত্র সুখের দিক থেকে বিচার করা যায়।" উজ্জয়িনী

কী বলবে তা অনুমান করে বললেন, "জানি। সুখই সব কথা নয়। ধর্মাধর্ম আছে। পরলোকে সুখীরা দুঃখ পায়, দুঃখীরা সুখ পায়।"

"তাছাড়া পরজন্ম আছে।" উজ্জয়িনী স্মরণ করিয়ে দিল। "পাপীদের হীনযোনি, পুণ্যাত্মাদের কৈবল্য।"

তিনি সায় দিয়ে বললেন, "তা হোক। তার বিচার তো মানুষে করবে না। বিধাতা করবেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ! তাই ভরসা হয় তোমার মতো তিনি আমাকে ঘৃণা করবেন না, তিনি দেবেন না সরাসরি দণ্ড। তিনি বিবেচনা করবেন, যে অবস্থায় আপনাকে আমি পেয়েছি সেই অবস্থায় যতটা মহৎ হওয়া সম্ভব ততটা আমি হয়েছি কি না। আমি তুমি হইনি বলে আমার অপরাধ হয়নি, কারণ আমি তুমি নই।"

উজ্জয়িনী অত্যন্ত অনুতপ্ত বোধ করছিল। বলল, "দিদি, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি এখনো সংস্কারমুক্ত হতে পারিনি।" তারপর বলল, "যদিও সংসারমুক্ত হয়েছি।"

সুশীলাবতী চুপ করে কী ভাবলেন। উজ্জয়িনী চুরি করে তার সুপরিচিত "ইলাস্ট্রেটেড উইকলি"র ছবি দেখতে লাগল। সুশীলাবতীর কাছে যখন ধরা পড়ল তিনি খিল খিল করে হেসে উঠলেন। বললেন, "সংসারমুক্ত হয়েছ বটে!"

উজ্জয়িনী রঙিন ছবির মত রঙিন হয়ে বলল, "আপনি তো সব জানেন, দিদি। কেন রহস্য করেন?"

তিনি ব্যথিতভাবে বললেন, "আমি যদি বিধাতা হয়ে থাকতুম সকলের সুখের ব্যবস্থা করে থাকতুম।" গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে প্রগাঢ় স্বরে বললেন, "কিন্তু বিধাতারই বা ত্রুটি কোথায়! মানুষ পরস্পরকে অসুখী করবে বলে যেন শপথ করে ভূমিষ্ঠ হয়েছে।"

এ কথা উজ্জয়িনীর মনঃপূত হল। সে উচ্ছ্বসিত স্বরে বলল, "ঠিক, ঠিক। বিশেষ করে পুরুষই ষড়যন্ত্র করেছে নারীকে অসুখী করতে।"

সুশীলাবতী বললেন, "পুরুষরা তো আমাদের ঘৃণা করে না, কেন তাদের বিশেষ করে দুষব? ঘৃণা কর তোমরা গৃহস্থের বউরা। ঘৃণা তো নয়, তলে তলে সেটা হিংসা।"

উজ্জয়িনী একটু আগে যেমন মোহিত হয়েছিল এবার তেমনি লোহিত হল। হিংসা! বাঈজীকে করবে হিংসা! গৃহস্থের মেয়েদের এ অতি অলীক অপবাদ। এ অতি অমার্জ্জনীয় অপমান। এর পরও কি এ বাড়ীতে থাকা উচিত?

সুশীলাবতী লক্ষ করলেন না, অন্যমনস্কভাবে বলে যেতে লাগলেন, "কিন্তু আমাদের হিংসা করে যে কোনো লাভ নেই তা, ভাই, আমি ওদের বোঝাতে পারলুম না। ওদের বলি, তোমরাও কলাবিদ্যা শেখ, রসের অনুশীলন কর, মনটাকে নিত্যকর্মের খুঁটিনাটির উপরে রাখ, স্বামীর কাছে নালিশ কোরো না, পরিমিত সন্তানের জননী হও, শরীরের তত্ত্ব নাও, পরিধানে ও প্রসাধনে বাহুল্য ছেড়ে সুরুচির পরিচয় দাও। তবে তো তোমাদের স্বামীরা তোমাদের মধ্যে মুক্তি পাবে।"

উজ্জয়িনী ইতমধ্যে উৎকর্ণ হয়েছিল। শুনে যেতে লাগল; "ওরা কি জবাব দেয় বলব? ওরা বলে, আমরা সতী স্ত্রী, আমরা ওসব ছলাকলার আশ্রয় নেব কেন। আমরা ব্রত করব, মানৎ করব, প্রতীক্ষা করব, আমাদের তো এক জন্মের সম্বন্ধ নয়। যারা আমাদের স্বামীদের অন্যায় করে বশ করেছে, অনিত্য রূপ দিয়ে ভুলিয়েছে, যদি ধর্ম থাকে তো তারা নরকের কীট হবে, বিষ্ঠার কৃমি হবে।" উজ্জয়িনীর শ্রুতি পীড়িত হল।

"যাক গে।" তিনি উদাসভাবে বললেন, "হয়তো আমি তাদের প্রতি অবিচার করছি। হয়তো আমি পত্নী হবার, জননী হবার সুযোগ পাইনি বলে তাদেরকে মনে মনে হিংসা করি। তাই আমার কথায় আন্তরিকতার সুর বাজে না। হয়তো তারা ভাবে, আমি লাঙ্গুলহীন শৃগাল, তাদেরকে দলে টানবার ফন্দী করেছি।" এই বলে তিনি হাসির তরঙ্গ তুললেন। উজ্জয়িনীর বিরাগ সেই তরঙ্গে ভেসে গেল।

"আমার মনে হয়," উজ্জয়িনী চিন্তাশীলের মতো বলল, "হিংসাটা উভয় পক্ষেই। তাইতে নারীকে একযোট হতে দিচ্ছে না। নারী হয়েছে পুরুষের পায়ের দাসী। যেমন আপনারা তেমনি আমরা। পুরুষের সুখের জন্যে আমি বেশ্যা হতেও চাইনে, পুরুষের সুবিধার জন্যে আমি সতী হতেও চাইনে। যেদেশে পুরুষ আছে সেদেশে আমি থাকব না বলেই আমার বৃন্দাবনযাত্রা।" সুশীলাবতী বুঝতে পারছেন না আন্দাজ করে বলল, "জানেন না? বৃন্দাবনে পুরুষ নেই। সকলেই নারী। কেবল কানুই একমাত্র পুরুষ। আর কানুর কথা আলাদা।"

ফল খেয়ে উজ্জয়িনী এক বেলা কাটাল। ও বেলা এল পাণ্ডার বাড়ী থেকে খাবার। তারপর কয়েকদিন শেষোক্ত ব্যবস্থা চলল।

ওদিকে সুশীলাবতীও বাড়ীতে পুরুষকে আসতে দিলেন না, তাঁর গানের আসর স্থগিত রইল। সন্ধ্যা হলে উজ্জয়িনীর কাছে বারান্দায় বসে বলেন, "একটা কীর্তন গাও না ভাই অনামিকা। আমার শুনতে ইচ্ছা করে।"

উজ্জয়িনী বলে, "আপনার মতো গায়িকার সাক্ষাতে আমার গান।"

তিনি হেসে বলেন, "আমি তো তোমার পরীক্ষা নিচ্ছিনে। তুমি যেমন করে খুশি তেমনি করে গাও।"

"না, দিদি। আপনি হাসবেন।"

"তুমি তো আর গায়িকা নও, তুমি ভক্ত। তোমার গানে ভক্তির সুর থাকলে হাসি আসবে কেন? গাও, গাও, লজ্জা কোরো না।"

উজ্জয়িনীর মনে পড়ে যায় পাটনায় দাস মহাশয়ের বাড়ীর এক সন্ধ্যা। কলকাতা থেকে এসেছেন কীর্তনকলানিধি। এক একটি পদের কত রকম আখর, সেই সব আখরের কী প্রগাঢ় ভাবলালিত্য। থেকে থেকে চোখ দিয়ে বা হাত দিয়ে বিদ্যুদ্বেগে ইশারা করেন, তাঁর সহকারীগণ ঐ ইশারাটুকুর জন্যে আগে থেকে তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছিল, যেই পেল অমনি তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিল, খোলসহযোগে ধ্বনির ঝড় বইয়ে দিল। ওদিকে তিনি নয়ন মুদে বাহু তুলে বিভোর হয়ে ঘুরে ঘুরে নাচছেন। ঝড় যখন থামল, তখন তিনি স্বাভাবিক গদ্যে ব্যাখ্যান করলেন, "শ্রীমতী তো মান করে রয়েছেন, শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জে আসেননি। ভাবছেন, এলেও আসতে দেব না। কিছুতেই আসতে দেব না। কুঞ্জদ্বারে পাহারা বসাব। দেখি তিনি কেমন করে আসেন। এমন সময় এক সখী এসে হেসে হেসে কথা কন।

"আহা, হেনক সময়ে এক সখী আসি হাসি হাসি কহে কথা। বলেন, ও চাঁদবদনি, ও ধনি, ও রাই কমলমুখী, ওঠ ওঠ।

উঠ উঠ ধনি ও চাঁদবদনি ঘুচাহ মনের ব্যথা।

তখন শ্রীমতী মুখ তুললেন। ভাবলেন, কী কথা? তিনি কি সত্যই

আসছেন? এত সৌভাগ্য হবে আমার! ভাবলেন, কিন্তু মানময়ী মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করলেন না। সখী বলেন, তোমার দুর্দ্দিন যে দূর দিন হল গো। দূরে গেল তোমার দুখ।

আহা, তব দূর দিন সব দূরে গেল উঠিয়া বৈসহ রাই।

রাই উঠে বস। অমন শয়ন করে থাকলে চলবে কেন। ওঠ, অভ্যর্থনা কর।

ঐ যে, তোমার মাধব নিকট আওল দেখল নয়ন চাহি।"

তারপর সেই পদটির কত রকমফের, তাতে কত প্রকার আখর সংযোগ। "রাধে, চেয়ে দেখ। চেয়ে দেখ। কমলনয়নে চেয়ে চেয়ে, চেয়ে দেখ। ও যে, তোমার মাধব, আর কারো নয়, চেয়ে দেখ। আর কারো নয়। তোমারি, আর কারো নয়। রাধামাধব সবাই বলে, রাধার মাধব। চন্দ্রাবলীর মাধব নহে, রাধার মাধব। আহা, রাধার রাধার রাধার মাধব, রাধামাধব রাধামাধব।" আবার ঝড় উঠল। আবার তিনি দুলে দুলে ঢলে ঢলে নাচলেন।

উজ্জয়িনী চোখ মুছে বলল, "দিদি, আমাকে গাইতে বোলো না। সেই স্বর্গীয় সুধা আমার মতো অভাজনের কণ্ঠে হলাহল হবে। সেই স্বর্গসঙ্গীত হবে বিস্বর কোলাহল। নিজের জন্যে লজ্জা নেই, তাঁরই জন্যে লজ্জা।"

সুশীলাবতীর প্রথম বয়সে এই লজ্জানুভূতি ছিল। তিনি কোমল স্বরে বললেন, "আচ্ছা, তুমি চাপা গলায় আপন মনে গুন গুন কর, যেন কেউ শুনতে পাচ্ছে না, এমনি।" উজ্জয়িনী পথে এসেছে দেখে আরো কোমল স্বরে বললেন, "দ্বিধা কিসের! এ যেন দেবতার সমীপে ভক্তের গান। তিনি অদৃশ্য থেকে ভাবগ্রহণ করছেন। তিনি যে ভাবগ্রাহী।" উজ্জয়িনী দুই হাত জোড় করল, আরম্ভ করল

নারায়ণং নমস্কৃত্য। তিনি উৎসাহ দিয়ে বললেন, "তোমার বেশ মিষ্টি গলা। তোমার স্বরমিষ্টান্ন তাঁর উপযুক্ত ভোগ।"

উজ্জয়িনী তার স্মৃতির গায়ে দাগা বুলিয়ে গেল, যে গানটি তার মনে পড়েছিল একটু আগে সেইটি গাইল। স্থলে স্থলে পরিবর্তন করল। মাধব যে একা রাধার হবেন তা সে অন্তরে স্বীকার করতে পারছিল না। আর কারো নয়, রাধারি। এটুকু সে এড়িয়ে গেল। তারপর তার জ্ঞান রইল না, কী গাইতে কী যে গেয়ে গেল, তা অন্যের কানে গেল, তার কানে নয়।

সুশীলাবতী সজল চক্ষে তার তন্ময়তা নিরীক্ষণ করছিলেন। কীর্তন সারা হলে বললেন, "কে বলে তোমার গীতপ্রতিভা নেই? তুমি স্বভাব-গায়িকা, তুমি আমাদের শীর্ষে।"

উজ্জয়িনীও আবিষ্কার করল যে কীর্তন তার আসে। আশ্চর্য। কেউ তাকে তালিম দেয়নি, কোনোদিন সে অভ্যাস করেনি, তার দ্বারা কীর্তন হতে পারে কখনো সে কল্পনা করেনি, তবু কেমন অবলীলাক্রমে মূলের সঙ্গে আখর যোজনা করে ব্যাখ্যান করতে করতে চলল, দমল না, থামল না, জড়াল না, তাড়াতাড়ি করল না।

সুশীলাবতীর প্রশংসাবাদ তার আনন্দবর্ধন করল। প্রসিদ্ধ গায়িকার প্রশংসাবাদ, এ যদি সত্য হয় তবে তার এখন থেকে এক বিষম আপদ জুটল। সবাই ফরমাস করবে কীর্তন। তাদের সন্তোষ বিধান করাই হবে তার সাধনা। উজ্জয়িনী বহু কষ্টে উল্লাস সম্বরণ করতে পারল। সহজভাব আয়ত্ত করে সহাস মুখে বলল, "দিদির প্রশংসা পেয়েছি এ আমার চিরকাল স্মরণ থাকবে।"

পর দিন সকাল দুপুর বৈকাল আপন মনে কীর্তনের সুর ভেঁজে উজ্জয়িনী কাটাল। সন্ধ্যা হলে সুশীলাবতী সাধলেন আর একটি

কীর্তন গাইতে। না সাধলেও চলত। কেননা উজ্জয়িনীর নেশা লেগেছিল। সে আপনি চাইছিল গাইতে ও শোনাতে। এবার সে কীর্তনকলানিধির কাছে শোনা গানের আবৃত্তি করল না। না শোনা গান নিজের সুরে নিজের আখর দিয়ে গাইল। সুশীলাবতী রায় দিলেন, "কালকের চেয়ে উৎকৃষ্ট।"

তার পরের দিন উজ্জয়িনী সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত একাদিক্রমে কণ্ঠ চালনা করল। নামমাত্র কিছু মুখে দিল। তার ক্ষুৎপিপাসা ছিল না। থাকতে পারে না। মানুষ যখন আনন্দে অথবা বেদনায় নিমগ্ন থাকে তখন জঠরের অগ্নিরও নির্ব্বাণ দশা।

সন্ধ্যায় সুশীলাবতী তাকে অনুরোধ করতে কেন জানি বিলম্ব করলেন। তখন উজ্জয়িনীই উপযাচিকা হয়ে কণ্ঠের ভার অবতারণ করল। সুশীলাবতী বললেন, "অত বড় প্রতিভা আমার গৃহপ্রাচীরে আবদ্ধ থাকলে আমারি প্রত্যবায়। যদি অনুমতি দাও তো কাল কয়েক জনকে আসতে বলি, শুধু তোমার কীর্তন শুনতে।"

উজ্জয়িনী সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, "না, না, না। দোহাই তোমার, সুশীলাদি!"

"সংস্কার!" তিনি মুচকে হাসলেন।

আরো কয়েক দিন পরে আবার তিনি সেই প্রসঙ্গ পাড়লেন। বললেন, "সমাজে তোমার প্রতিভার সমাদর হবে, তবে তো হবে তোমার প্রতিভা সার্থক। অত বড় প্রতিভার সৃষ্টি কি একা আমার জন্যে!"

"তা কেন?" উজ্জয়িনী তৎপরতার সহিত বলল, "কানুও কান পেতেছেন যে। তিনি আমার অদৃশ্য শ্রোতা এবং তিনিই আমার অভীষ্ট শ্রোতা যে!"

"হ্যাঁ।" তিনি অবিশ্বাসের ভ্রূভঙ্গী করে বললেন, "গুণী যখন গান করে তখন সে অদৃশ্য শ্রোতার প্রতি লক্ষ্য রাখে বটে!"

"তুমি না বিশ্বাস করলে আমি কী করব দিদি!" উজ্জয়িনী অনুযোগ করল। "আমি চাই কানুর তারিফ। তা আমি শুনি তোমার মুখ দিয়ে এবং আমার প্রাণে। বাজে লোক জুটে হাততালি দেবে সে আমি বরদাস্ত করতে পারব না।"

"আমি কি বাজে লোকের কথা বলেছি? সমাজের দশ জন সমঝদার বুঝি বাজে লোক। গুণীমাত্রেরই সমঝদারের সমালোচনা দরকার। ওটাতে গুণীকে সজ্ঞান করে। আমার আন্তরিক অভিপ্রায় এই যে তুমি প্রকাশিত হও।"

নবীন লেখক যেমন সমালোচকের সম্মুখীন হতে আতঙ্ক বোধ করে, আপনার উত্তম রচনা সম্বন্ধেও সন্দিহান হয়, নাম গোপন করে সম্পাদকের কাছে লেখা পাঠায় ও আশানিরাশায় দিন গণে, উজ্জয়িনীরও সেই দশা। নবীন লেখকের এক আধ জন উৎসাহক থাকেন, সুশীলাবতী উজ্জয়িনীর তাই। কিন্তু বাইরের সমঝদার! বাপ রে! তারা নখী না শৃঙ্গী না দন্তী, কী ভাববে কী বলবে কী রকম হাসবে! না, না, না।

এর পর উজ্জয়িনী নিজেই কীর্তনের কথা বানাল, সুর তো দিচ্ছিলই। বিস্তর পদাবলী তার মুখস্থ ছিল। তাদেরি ভাবে অনুভাবিত হয়ে তাদের থেকে শব্দ চয়ন করে সে যা তৈরি করে তুলল তা মৌলিক না হলেও শ্রুতিসুখদ। যারা নতুন চায়, অথচ যাদের রুচি পুরোনো, উজ্জয়িনী অজ্ঞাতসারে তাদেরি উপভোজ্য প্রস্তুত করে চলল। একটির পর একটি সমাপ্ত হয় আর উজ্জয়িনী অধীর হয়ে ভাবে, কখন দিদির সন্ধ্যা হবে। সকালে তিনি গলা সাধেন, দুপুরে তিনি বিশ্রাম

করেন, বৈকালে তিনি বেড়াতে যান, তাঁর নাগাল পাওয়া যায় না। অদৃশ্য শ্রোতাকে গান শুনিয়ে উজ্জয়িনীর প্রকাশবাসনা পূর্ণ হয় না, যিনি অদৃশ্য শ্রোতা তিনি অবাক শ্রোতাও! তিনি তো স্বাদ নিয়ে বলেন না কেমন লাগল। রেঁধে লাভ কী যদি খাবার লোক চুপ করে হাত ধুয়ে সরে পড়ে, একবার জানিয়ে যায় না রান্নার গুণাগুণ।

"দিদি, শুনবে একটা নতুন গান? অনামিকা দাসীর ভণিতা।"

"বটে? চণ্ডীদাসের অন্ন গেল। জ্ঞানদাসও বেকার।"

"ছি ছি। গুরুজনের সঙ্গে তুলনা কোরো না। ওঁরা মহাজন, আমি খাতক।"

"তবে শোনা যাক তুমি ঋণের টাকায় কী দিচ্ছ।"

উজ্জয়িনীকে দু বার বলতে হল না। সে ধীরে ধীরে স্বরবিস্তার করল।

"যাহার সহিত যাহার পিরীতি সেই তার রীতি জানে। তোমরা তাহায় কিবা জান, তোমরা। কিই বা জান, তোমরা। ওগো তোমরা। তোমরা তাহারে পাগলিনী বল সে কি তাহা লয় কানে। পাগলিনী? শ্যামসোহাগিনী পাগলিনী? যদি শ্যামসোহাগিনী পাগলিনী হয় তোমরাও হও পাগলিনী। পিরীতির রীতি পিরীতিয়া বুঝে অপরের লাগে ধন্দ। ধাঁধাঁ লাগে। পিরীতিরে বলে পাগলপনা। ধাঁধাঁ লাগে। পিরীতি হেরিলে চিনিতে না পারে নয়ন থাকিতে অন্ধ। আহা, নয়ন থাকিতে অন্ধ। নয়ন রয়েছে দৃষ্টি নাই, তাই তারে কহি অন্ধ।"

আরো ছিল। উজ্জয়িনী হাঁপিয়ে উঠেছিল। দম নিল।

সুশীলাবতী বললেন, "চিনতে পারি গো পারি। কিন্তু তোমার এ পিরীতি নয়। তাই একে বলি পাগলপনা!"

উজ্জয়িনী দুর্জয় ক্রোধে ঝড়ের পূর্বে বায়ুমণ্ডলের মতো স্তব্ধ রইল।

# মনের খুশি

## ১

ওয়াইটদ্বীপ থেকে ফিরে সুধী শুনল কে একটি মেয়ে তাকে বার বার টেলিফোনে চেয়েছে। নিজের নাম দেয়নি ঠিকানা দেয়নি, শুধু বলেছে আবার খোঁজ করবে। সুধীকে জিজ্ঞাসু দেখে সুজেৎ বলল, "ইংরেজ বলে মনে হল না। সম্ভবত আপনার স্বদেশিনী।"

কিন্তু সুধী যা জানতে চাইছিল তা মেয়েটির বয়স। "ঠিক বলতে পার, একটি গার্ল?"

প্রগলভা সুজেৎ বলল, "হাঁ, মশাই। হাঁ। দিব্যি গেলে বলতে পারি এ আপনার বুড়ী মেলবার্ণ-হোয়াইট নয়। কত দিন লুকিয়ে রাখবেন?"

সুধী চিন্তাকুল ভাবে তার চেনা মেয়েদের তালিকা করল। তাদের মধ্যে কে এ জন। যে তাকে চিঠি লিখেছিল সেদিন নয় তো? অশোকা তালুকদার? ডলি মিটার? ভাবল সুজেৎকে জিজ্ঞাসা করবে কেমনতর তার হাবভাব। কিন্তু একে তো সুজেৎকে এমন ধারা অন্তরঙ্গ প্রশ্ন করা যাবে না, তা ছাড়া টেলিফোনে হাবভাব কতটুকু ধরা পড়ে।

যাক, সেই রাত্রেই—রাত্রেই বা কী করে বলি—এগারোটার আগে ইংলণ্ডের মধ্যনিদাঘে অন্ধকার নামে না, গোধূলিকাল—সেই গোধূলিতেই টেলিফোনের এলার্ম বেজে উঠল। সুধী সুজেতের দিকে চাইতেই সে হেসে ফেলল। যেন চোখ দিয়ে বলতে চায়, ইনি

সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়। তারপর যথানিয়ম উঠে গিয়ে ফোন ধরল, "ওহ্। মিস্টার চক্রবর্তী। ইওর ফ্রেণ্ড।"

সুধী শেষ কথাটিতে ঈষৎ আরক্ত হয়ে গম্ভীর ভাবে গিয়ে সুজেতের হাত থেকে ফোন নিল। কথাটা বোধ হয় অপর প্রান্তেও পৌঁছেছিল। তরুণীর সঙ্কোচ কাটছিল না। সে অনেকক্ষণ সুধীকে উৎকর্ণ ভাবে দাঁড় করিয়ে রাখল। তারপর এক সময় বলল, "আমার চিঠি পেয়েছিলেন ?"

স্বর শুনে সুধী চিনতে পারল কে। বলল, "পেয়েছি বই কি।"

"কী করে টের পেলেন আমার চিঠি ?"

"তা কেন ফাঁস করব ?"

"ডলিদি বলছিলেন আপনি মন্তর জানেন, সে তা হলে সত্য ?"

"আপনার কী মনে হয় ?"

"আমার মনে হয় সম্ভব। চেহারা যে সাধুসন্ন্যাসীর মতো।"

তিন মিনিট হয়েছিল। সুধী বলল, "আপনাকে থামিয়ে দিচ্ছে না ?"

উত্তর এল, "না। আমার যতক্ষণ খুশি কথা বলতে পারি।"

সুধী বলল, "ওঃ!"

অশোকা বলল, "কোথায় ছিলেন এত দিন ?"

"ওয়াইটদ্বীপে গেছলুম।"

"আমি দেখিনি। দেখবার মতো ?"

"দেখে আসুন না।"

"আপনি আবার যান তো আমিও যাই।"

এর পর সুধী কী বলতে পারে। অশোকা বলল, "মিস্টার নাগের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি বলছিলেন বটে আপনি ওয়াইটদ্বীপে রওয়ানা হয়েছেন। কিন্তু কোন শহরে কোন ঠিকানায় ওসব বলতে

পারলেন না। তাই চিঠিখানা লণ্ডনের বাসার ঠিকানায় পাঠালুম। যাক, পেয়েছেন তা হলে!"

"হাঁ।"

"কেমন আছেন?"

"ভালোই আছে।"

"কখন এলেন?"

"বৈকালে।

এই ধরনের কথাবার্তা চলল ঝাড়া পনেরো মিনিট। অশোকা কিন্তু সহজে ফোন ছাড়তে চায়? প্রতি পাঁচটা প্রশ্নের অন্তর পুনরুক্তি করে, "কেমন আছেন?" "চিঠিখানা তা হলে পেয়েছিলেন?"

অবশেষে সুধীই তাকে নিরস্ত করল। বলল, "এইবার মাফ করুন।"

"ওহ্। আপনাকে বহুক্ষণ আটকে রেখেছি। আমারই ক্ষমা চাইবার কথা।"

"নমস্কার।"

"নমস্কার।

সুধী রিসিভার নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিল। শুনল, "কিছু মনে করলেন না তো?"

"না। মনে করব কেন?"

"চিঠি পড়ে কিছু মনে করেননি?"

"কী মনে করব?"

"কে জানে। তাই তো জানতে ইচ্ছা করে।"

"আচ্ছা। আসি।"

"আসি। ক্ষমা করবেন কিন্তু।"

ড্রইং রুমে ফিরে সুধী লক্ষ্য করল সবাই হাসি চাপছে। মঁসিয়ে,

মাদাম, সুজেৎ। কেবল বোকা মার্সেল শুধাল, "দাদা, ও কী বলছিলে? 'আসি' মানে কী? ওটা বুঝি তোমার ভাষা। তোমার ভাষায় কথা বলছিলে? যেমন বল মঁসিয়ে স্থ সরকারের সঙ্গে। মিস্টার নাগের সঙ্গে।"

সুধী তার জন্যে অনেক রকম খেলনা এনেছিল। তাই নিয়ে এতক্ষণ সে চুপচাপ ছিল। কিন্তু পনেরো মিনিট কাল টেলিফোনের রহস্যময় লোকের সঙ্গে অবোধ্য ভাষায় বাক্যালাপ তারও মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল।

সুজেৎ তাকে ধমক দিয়ে বলল, "এই মার্সেল! তোকে না বারণ করেছিলুম অমন প্রশ্ন করতে? অসভ্য!" সুজেতের চোখ চকচক করেছিল হাসির কিরণে।

মার্সেল মুখ ভার করলে সুধী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "হাঁ রে। ও আমার ভাষা। তুই তো জানিস ও ভাষা। বল দেখি এটা কী?"

"হাত।"

"এটা কী?"

"পা।"

"আর এটা কী?"

"মাতা।"

সুধী হেসে বলল, "এটা মাথা। আর ঐ যে ওখানে বসেছেন, উনি মাতা।"

এই সূক্ষ্ম প্রভেদ মার্সেল কেন মার্সেলের মাও বুঝতে পারলেন না। বাবাও না। সুজেৎ দুই-এক বার চেষ্টা করে আশা ছেড়ে দিল। সবাই বলাবলি করল, "বড় কঠিন ভাষা।" ত্রে দিফিসিল। কিন্তু সকলে তখনো ভাবছিল, হলো কী! পনেরো মিনিট ধরে টেলিফোন!

আমাদের সবার সাক্ষাতে ত্রে দিফিসিল ভাষায় প্রেমালাপ স্থধীর কি স্বভাবপরিবর্তন ঘটল!

পরের দিন স্থধী তার পুরোনো অভ্যাসমতো ঘণ্টাকয়েক মিউজিয়ামে কাটিয়ে লণ্ডনের বাইরে অথচ বৃহত্তর লণ্ডনের বাইরে নয়, এমন এক জায়গায় পাড়ি দিল, গেল রিচমণ্ড। যতক্ষণ আলো থাকল ততক্ষণ পায়চারি করল, দাঁড়িয়ে রইল, বসতে বসতে অর্ধশয়ান হল। মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে কিছু মুখে দিয়েছিল, তদতিরিক্ত আহারচিন্তা ছিল না। তার চিন্তাস্রোতের অন্তঃস্রোত ছিল উজ্জয়িনীর জন্যে উদ্বেগ. বাদলের সঙ্গে দেখা না হওয়ার দরুণ খেদ। বহিঃস্রোত তার অধীত বিষয়ের রোমন্থন। প্রকৃতির সান্নিধ্য তার ভিতর বাহির আপ্লুত করেছিল অনির্বচনীয় প্রীতিরসে। প্রকৃতিই তার স্ত্রী, অন্য কেউ নয়। অন্য কেউ হতে পারে না। অশোকার কথা ভেবে তার হাসি পাচ্ছিল। করুণ হাসি।

অশোকা কী চায়? চায় একটুখানি রোমান্স। তার নিজের সেটের থেকে এই মানুষটি স্বতন্ত্র, একে সহজে চোখ পড়ে। এর প্রতি কৌতূহল ও বিস্ময় তাকে দুঃসাহসী করেছে। নিকট-পরিচয়ের দ্বারা সেই কৌতূহলবিস্ময়ের ক্ষয় হলে অশোকা তার পূর্ব ব্যবহারের দরুণ লজ্জিত হবে। সেটের বাইরে সে বাঁচবে না। সে খাঁচার পাখী, বনের পাখীর প্রতি তার মোহ কখনো নিষ্ঠায় পরিণত হবে না।

দশটার সময় বাসায় ফিরে স্থধী শুনল, তার সেই বন্ধু তাকে আটটার সময় ফোন করেছিলেন। স্থধী তার সংবাদদাত্রীর বচনে প্রচ্ছন্ন পরিহাস ভেদ করল। মুচকি হাসল। তারপর স্নান করছে এমন সময় ভিতর থেকে শুনতে পেল টেলিফোনের ক্রিংকার। স্থজেৎ কাকে বলছে, "হেলো। মিস্টার চক্রবর্তী ফিরেছেন, কিন্তু স্নান করছেন।"

স্নানের অব্যবহিত পরে আবার টেলিফোনের আমন্ত্রণ। এবার সুধীই মৃদু হেসে এগিয়ে গেল। সুজেৎ অর্ধেক পথ এসেছিল, পিছু হটল। তার খিলখিল করে হাসার উপর ড্রইংরুমের দরজার খিল পড়ল।

"কখন ফিরলেন?"

"এই, একটু আগে।"

"আমি ফোন করেছিলুম শুনেছেন?"

"শুনেছি—একটা স্বকর্ণে, অন্যটা পরের মুখে।"

"কোথায় ছিলেন?"

"আমি বাসায় থাকিনে অন্ধকারটুকু ছাড়া।"

"কোথায় যান?"

"যেদিকে দু চোখ যায়। সারা শীতকালটা, বসন্তটাও, একরকম চোখ বুজে সয়েছি। কেবল সইব, কিছু ভোগ করব না? তাই নিদাঘে আমি ভবঘুরে।"

"আচ্ছা, আপনি কী পড়েন? কোন কলেজে পড়েন?"

"পড়ি আমার যা পড়তে মন যায়। দর্শন, সাহিত্য, একটু আধটু বিজ্ঞান। কলেজে পড়িনে, পড়ি ব্রিটিশ মিউজিয়ামের লাইব্রেরীতে।

"কী চমৎকার! আমাদের সেই বই মুখস্থ করতে করতে লেসন করতে করতে জীবন গেল। আমার কোন্ কলেজ জানেন না বুঝি? বেডফোর্ড।"

সুধী বুঝতে পারছিল আজকেও আলাপের শেষ নেই, পনেরো মিনিট কি পঁয়ত্রিশ মিনিট কে জানে। ওদিকে তার খাবার—গরম দুধ—জুড়িয়ে যাচ্ছিল। শোবার সময় যাচ্ছিল পেছিয়ে। অনিয়ম তার পছন্দ হয় না।

"একদিন শোনা যাবে আপনার কথা।" সুধী উৎকোচ দিয়ে নিষ্কৃতি আশা করল।

"শুধু আমার কথা শুনবেন? নিজের কথা শোনাবেন না?"

"তাও হবে।"

"তা হলে দিন ধার্য করুন।"

"রবিবার।"

"তার দেরি আছে। কাল সময় হয় না?"

"সব সময় আমার সময়।"

"ওকথা অবশ্য আমার বলা চলে না। আমরা হলুম বন্দিনী। আচ্ছা, কাল ডিনারের পর আসুন। বেড়ানো যাবে। তারপর আপনি বাসায় ফিরবেন। আমিও ফিরব বাড়ী। আজ আমার দেরি করিয়ে দিলেন। কপাল আছে বকুনি। তা হলে সেই কথা রইল। কাল আসছেন সওয়া আটটায়।"

"আপনাদের বাড়ীতে আসব কী?"

"না, না, না, না। বলিনি বুঝি? হ্যামস্টেড হীথে আসুন। আপনিও টিউবে করে আসবেন। আমি টিউব স্টেশনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করব। আর যদি আপনি আগে এসে পড়েন তবে কিন্তু অপেক্ষা করার পালা আপনার।"

সুধী এই গরমে টিউবে চড়ে না। ওকথা জানিয়ে আর কী হবে! বলল, "তথাস্তু।"

## ২

অশোকা স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে থরে থরে সাজানো রঙিন পত্রিকার উপর চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিল। সুধী কখন এসে অলক্ষিতে তার পাশে

জায়গা নিয়েছে। চোখাচোখি হতেই অশোকা সরমে ও পুলকে স্নিগ্ধ হেসে দৃষ্টি অবনত করল।

একখানা দামী কাগজ কিনে সেখানাকে পাখার মতো ভাঁজ করে ধরে অশোকা সুধীর দিকে চাইল। সে চাউনির মানে, চলুন। সুধীও একখানা "স্পেক্‌টেটর" কিনে কার্যত সে চাউনির উত্তর দিল। চলল।

স্টেশনের বাইরে এসে তারা হীথের পথ ধরল। একটিও কথা কইল না কেউ। অশোকা ছিল টেলিফোনে বাক্যবাগীশ, মুখামুখিতে মূক হল। সুধী ভাবছিল কেমন করে সুরু করা যায়। সে খুঁজে পাচ্ছিল না কী বলে আপনার মৌনভঙ্গ করবে।

আলো আছে বটে, সূর্য নেই। স্তিমিত থমথমে আকাশ। পাখীদের কলরব মন্থর হয়ে আসছে। কত লোক বেড়াতে বেরিয়েছে, কত লোক ঘাসের উপর শুয়ে পড়েছে, আবার কোথাও কোথাও লোকনৃত্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অশোকা ও সুধী অন্যমনস্ক ভাবে চলতে থাকল। অন্যমনস্ক হলেও সতর্ক।

"দেখুন, দেখুন," অশোকা হঠাৎ নিম্ন স্বরে চিৎকার করে উঠল, "ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। ঠিক দেশের মতো। না?"

ছোকরাদের ঘুড়ি ওড়ানো সুধী এর আগে লক্ষ করেছে। বলল, "এ বিদ্যার দেশ নেই।"

"আপনি কখনো ও বিদ্যার চর্চা করেছেন?"

"করিনি?" সুধী মৃদু হেসে তার দিকে চাইল।

"আপনাকে দেখে তো আমার প্রত্যয় হয় না। আপনি কোনোকালে বালকবয়সী ছিলেন। যে গম্ভীর।"

সুধী হেসে বলল, "সাক্ষী প্রমাণ রয়েছে। আমার বাল্যসাথীরা তো এখনো কৌত হয়নি।" তারপর স্মরণ করে বলল, "গাছে উঠে চোর

চোর খেলেছি, জলে নেমে ডুবোজাহাজ খেলেছি, বঁড়শি নিয়ে মাছ ধরেছি, বল্লম দিয়ে বাদুড় মেরেছি, ঢিল ছুঁড়ে জাম পেড়েছি, লাঠি চালিয়ে দাঙ্গা করেছি—কেমন এই যথেষ্ট হবে, না ফর্দ বাড়াব ?”

অশোকা মুগ্ধ কটাক্ষপাত করে বলল, “অনুতপ্ত ভাঁ ভাল্ ভাঁ। আমার কিন্তু অনুতপ্তদের বিশ্বাস হয় না। বৃদ্ধ ব্যাঘ্র।”

“প্রবাদ আছে যে, যারা বাল্যকালে দুরন্ত হয় তারাই উত্তরকালে শান্ত হয়ে থাকে।” বলল সুধী।

“কিন্তু আমি তো কোনদিন দুষ্ট ছিলুম না।”

“ছিলেন না? তবে তো আরো ভয়ানক। প্রবাদ আছে, যারা ছোটবেলায় শিষ্ট থাকে তারা বড় হলে উগ্র হয়।”

“বা, আমি কি বড় হইনি? আমার বয়স কত হয়েছে, জানেন?” অশোকা চক্ষু আয়ত করে মাথা কাৎ করে বলল।

“হবে তিন-চার কুড়ি।”

“নেহাৎ ভুল বলেন নি। তিন-চার বাদ দিলে বাকী যা থাকে তাই।”

এর পর তারা এক জায়গায় বসল। একবার মুখ খুলে গেলে কথার জন্যে ভাবতে হয় না। কথা আপনি বেরিয়ে আসে। অশোকা বলল তার কলেজের কাহিনী। দু বছর কাটল। আরো এক বছরের কোর্স। দেশে যেতে ভারি ইচ্ছা করে। এ দেশ ভালো লাগে না। এদের হৃদয় নেই, আছে সভ্যতা। এরা যতই অন্তরঙ্গ হোক না কেন ধরাছোঁয়া দেয় না। বিদেশীকে বিশ্বাস করে বুকের কথা বলে না, সব এদের মুখের কথা। আর কী বিশ্রী শীত, বাপু। দিনের বেলা সূচীভেদ্য অন্ধকার। এর চেয়ে আমাদের দেশ শত গুণে ভাল।

দেশে যেতে চায় বিশেষ করে ঠাকুমাকে দেখতে। ঠাকুমা সেই

সেকেলে মানুষ, তাঁর ছেলে হাইকোর্টের জজ হয়েছেন বলে তিনি কি বিলেতে এসে পরকাল খোয়াবেন? অশোকা, তার মা ও ছোট ভাই বিলেতে। অশোকার বাবা ও তাঁর মা দেশে। প্রতি বছর বাবা এসে দেখে শুনে যান। প্রতি বছর আর কি, মোটে তো দু বছর এ দেশে বাস। আরো কত কাল থাকতে হবে কে জানে। ভাই পাব্লিক স্কুলের পড়া শেষ করে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবে ও যথাবয়সে আই সি এস পরীক্ষা দেবে। অশোকাকে বি এর পর অন্য কিছু পড়তে হবে।

"মিস্টার চক্রবর্তী, দেশের জন্যে আপনার মন কেমন করে না? আপনি কবে দেশ ছেড়েছেন?"

"প্রায় বছর খানেক।"

"তা হলে মন কেমন করবে কেন?"

"তা হলেও করে।" সুধী উজ্জয়িনীর কথা ভাবছিল।

"কার জন্যে করে, বিশেষ কার জন্যে?"

"তা কী করে বলব?"

"এই যেমন স্ত্রীর জন্যে, যদি আপনার স্ত্রী থাকেন।"

"স্ত্রী আছে বই কি। কিন্তু তার জন্যে মন কেমন করবে কেন?"

সুধী লক্ষ করল অশোকার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। সে আত্মসম্বরণ করে সপ্রতিভভাবে বলল, "বেশ মানুষ তো! স্ত্রীর জন্যে মন কেমন করে না?"

সুধী বলল, "আমার স্ত্রী সর্বত্র ব্যাপ্ত, সমস্ত পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট। বস্তু থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সত্যের সহগামিনী সে মায়া।"

অশোকা একবিন্দু বুঝল না। তবু ঠাহর করল কী একটা তত্ত্বকে রূপক আকার দেওয়া হচ্ছে। বলল, "তাঁর নাম কী?"

"প্রকৃতি।"

অশোকা হি হি করে হেসে ফেলল। বলল, "আপনি সাধুসন্ন্যাসীর মতো দেখতে, কিন্তু কবিপ্রাণ। প্রকৃতি! হি হি হি হি।"

সুধীও হেসে বলল, "তা হলে বলুন মন কেমন করবে কেন ?"

অশোকা এত খুশি হয়েছিল যে মনের আহ্লাদে বলল, "আসুন, একটা কিছু পাতানো যাক।"

"তার মানে কী ?" সুধী জিজ্ঞাসু হল।

"এই ধরুন, আপনাকে আমি ডাকব একটা পেটেণ্ট নামে। আপনিও আমাকে সেই নামে ডাকবেন।"

"বুঝেছি। যেমন চোখের বালি। হাতের ঝাঁটা। পায়ের কাঁটা।"

উচ্ছ্বসিত হেসে অশোকা বলল, "কে জানত আপনি একজন রসিক ব্যক্তি ? বাপ রে, তাস খেলতে বসে সেদিন আমার কী ভয় !"

"আপনিই তবে একটা নীরস নাম খুঁজে বার করুন।"

মনের খুশিতে অশোকা বলল, "মনের খুশি।"

সুধীর মনে খুশির আমেজ ছিল না। তা নাই থাক। নামটি খাসা। সে বলল, "থামুন। একটি কথা কইবেন না। আমিই সর্ব-প্রথম ওর প্রতিষ্ঠা করি।" এই বলে সে ডাকল, "মনের খুশি।"

"বা, তা হতে যাবে কেন! আমি ওর উদ্ভাবক। আমিই ওর প্রতিষ্ঠা করেছি যে মুহূর্তে উচ্চারণ করেছি।" এই বলে সেও ডাকল, "মনের খুশি।"

অশোকা বলে গেল সে যে সুধীকে ফোন করে তার মা তা জানেন না। তার মা ও বাবা প্রত্যেক সন্ধ্যায় কোথাও না কোথাও নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যান, সপ্তাহে একদিন পাল্টা নিমন্ত্রণ করেন একসঙ্গে সবাইকে। যেদিন তাঁরা বাড়ীতে থাকেন সেদিন সে

তাঁদের অলক্ষিতে রাস্তার মোড়ে গিয়ে পাব্লিক টেলিফোনের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে। আর যেদিন তাঁরা বাইরে যান সেদিন সেও বাইরে যেত, কিন্তু সম্প্রতি অসুখের ভান করে একলা বাড়ী থাকে। কাল তাঁরা বাড়ী ছিলেন, সে গেছল রাস্তার মোড়ে তিন বার, শেষবার পার্টি ভাঙবার মুখে, ফিরে দেখে কেউ নেই। মা বললেন, "বিদায়ের সময় কোথায় ছিলে তুমি?" একটা ঘোরতর মিথ্যা সাফাই দিতে হল। আজ তাঁরা কেনসিংটন গেছেন। ফিরে যেন দেখতে পান যে মেয়েকে যেমন অসুস্থ রেখে গেছলেন তেমনি আছে।

সুধী বলল, "তা হলে আর দেরি করা উচিত নয়।" গম্ভীর মুখে বলল, "লুকোচুরির কী দরকার? আপনিও সাবালিকা। আমিও সাবালক।"

অশোকা কোন মুখে বলবে যে সুধী ধনবান নয়, অতএব সুপাত্র নয়। অভিনয়ের স্বরে বলল, "এই কি আপনার বিচার যে সর্বদা আমি নজরবন্দী থাকব?"

সুধী বলল, "হয়তো আপনার পক্ষে নজির আছে। কিন্তু আমার পক্ষে তা কই? আমি যে কায়মনোবাক্যে ক্লাসিক। কেমন করে আমি রোমাণ্টিক হব?" অশোকা আঁচতে পারছে না অনুমান করে আরো বলল, "মনের খুশি, আমি গোঁড়া নীতিনবীশ নই। দরকার দেখলে আমি কুণ্ঠিত হতুম না। কিন্তু অদরকারকে কল্পনার রঙ্গে রাঙিয়ে লোভনীয় করা, নিকটকে দূর ও আঙুলভ্যাকে দুর্লভ করা এর নাম রোমান্স। আপনার জীবনে এর সার্থকতা থাকতে পারে, আপনাকে বিচার করবার স্পর্ধা রাখিনে। কিন্তু, মনের খুশি, আমার জীবন অন্যরূপ।"

৩

অশোকা অপমানিত বোধ করছিল। যেন সুধী তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তবু তার কৌতূহল উদগ্র হল। সে শুধায়, "শুনতে পাই কী রূপ?"

সুধী বলল, "নিজের বিষয়ে গুছিয়ে বলা শক্ত। এলোমেলো ভাবে কিছু বলা আবার আমার রুচিবিরুদ্ধ। ওঠা যাক। ফেরার পথে সংক্ষেপে দু-চার কথা বলব।"

চলতে চলতে সুধী বলল, "আমাকে সাধু-সন্ন্যাসীর মতো দেখায়। কিন্তু তা যে আমি নই আপনিই ভালো জানেন। আপনার সঙ্গে আমি তাস খেলেছি। আলাপ করেছি। রঙ্গ করেছি। মনের খুশি সম্পর্ক পাতিয়েছি। বয়স্যদের সমাজে আমি আড্ডা দিয়ে থাকি। কাউকে উন্নত করবার সংকল্প আমার নেই ও সঙ্কেত আমি জানিনে। সত্য বলে যাকে বুঝি তার প্রচার আপাতত চাইনে, তার ব্যতিরেকে সংসার অচল হয়েছে বা হবে এ ধারণা আমার নেই। অপরে যাকে সত্য বলে বোঝে তাকে আমি গ্রহণ করতে পারি কি না ভেবে দেখি, নির্বিচারে উপেক্ষা করিনে।" অশোকা শুনেছে কি না জানবার জন্যে সুধী বলল, "কী বললুম বলুন তো।"

অশোকা মুচকি হেসে বলল, "নির্বিচারে উপেক্ষা করেন না।"

"ঠিক। নীতি সম্বন্ধেও সেই কথা। রোমান্টিক নীতি না থাকলে অনেক লোকের জীবন হয়তো একঘেয়ে হত। দুর্বহ হত। দে সরকারের বিশ্বাস জীবনে একাধিক বার প্রেমের আবশ্যক আছে। অনাবশ্যককে আবশ্যক ভেবে তাঁর যে আনন্দ তার অনুমোদন না করে পারিনে।"

অশোকা জানতে চাইল দে সরকার কে। সুধী বলল, "বা, সেদিন .য তিনি আপনাদের ওখানে তাস খেলেছেন। আর তিনিই তো আমাকে আপনাদের বাড়ীর নিমন্ত্রণ দেন।"

"বোধ হয় তাঁকে দেখেছি। মার সঙ্গে কত ছেলের পরিচয়। আমাকে তো সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন না।" অশোকা ব্যথিত ভাবে বলল।

"এই দেখুন। সকলের সঙ্গে আলাপের যে আবশ্যক আছে এইটি রোমান্টিক অভাববোধ। এর থেকে ব্যথা এবং ব্যথালাঘবের জন্যে আমাকে স্মরণ।"

অশোকা তখন কিছু বলল না। বিদায়কালে বলল, "ডলিদি ভুল বলেছিলেন। আপনি মন্তরটন্তর কিছু জানেন না।"

সুধী একটু আশ্চর্য হল। বলল, "জানি বলে কি আমি দাবী করেছি ?"

অশোকা রাগত ভাবে বলল, "না। না। আপনি কিচ্ছু জানেন না। আপনি কিচ্ছু বোঝেন না।"

সুধী স্তম্ভিত হয়ে এর অর্থ চিন্তা করল। অশোকা বলল, "নমস্কার।"

দিন চার-পাঁচ পরে সুধী একখানা চিঠি পেল। অশোকার। তাকে এক রকম ভুলে গেছল, সে যেন মনে করিয়ে দিতে লিখেছে। খুলে পড়ল।

"মনের খুশি,

আপনার জয় হল। দেখলুম পাষাণের উপর রাগ করলে সে টলে না। জানেন তো আমাদের ঠিকানা। একখানা চিঠি লিখলে এমন কি রোমান্টিক হত ?

যাক, তর্ক করতে চাইনে। আমি রোমান্টিক নীতির উদাহরণ

নই। আমি নারী। নারীর অন্তর জানার মন্তর আপনার অজানা।

এই কথাটা ফোনে বলতে পারতুম। কিন্তু ফোন তো এক তরফা নয়। আপনার স্বর শুনলে কথাটা কিছুতেই মুখের উপর আসত না।

আশা করি এই পদ্ধতির নাম লুকোচুরি নয়। চিঠির উত্তরে চিঠি লিখলে ক্লাসিক নীতি ক্ষুণ্ণ হবে না। চিঠি লেখা হয়তো অনাবশ্যক, কিন্তু চিঠির উত্তর দেওয়া ভদ্রতার অনুরোধে আবশ্যক নয় কি?

বাড়াতে পারতুম। কিন্তু আপনাকে ভয় করে। অতএব আসি। ইতি।

মনের খুশি

চিঠিখানা বারকয়েক পড়ে সুধী মাথায় হাত দিয়ে বসল। নারীর দান ফিরিয়ে দেবার মতো ধনী সে নয়, সে পূর্ণবয়স্ক পুরুষ, নারীকে তার সত্তার নিগূঢ় প্রার্থনা। কিন্তু সে যে স্বপ্নে অঙ্গীকার করেছে উজ্জয়িনীর বৈরাগ্য গ্রহণ করতে। স্বপ্ন তার কাছে নিতান্ত নিরর্থক নয়। কোনো বাঁধাধরা ব্যাখ্যায় অবশ্য তার আস্থা নেই। প্রাচীন ও আধুনিক কুসংস্কার সে অগ্রাহ্য করে। কিন্তু স্বপ্ন কোনো কোনো ক্ষেত্রে চেতনার রূপান্তর। ইনটুইশনের দ্বারা তার অর্থবোধ হয়। এমনি একটি স্বপ্নে সে বৈরাগিণী উজ্জয়িনীর সঙ্গে ভাগ্য বদল করেছে। এখন অশোকাকে কী উত্তর দেয়?

সেদিন খুড়ী জিজ্ঞাসা করছিলেন, "উজ্জয়িনীর কোনো খবর এসেছে?"

সুধী বলল, "না, আণ্ট এলেনর।"

তিনি পরামর্শ দিলেন, "তুমিই একবার দেশে গিয়ে খোঁজ কর না কেন, সুধী।"

সুধীর এ কথা মনে হয়নি তা নয়। কিন্তু বাদলের অজ্ঞাতবাস তাকে বিলেত ছাড়তে প্রবৃত্তি দিচ্ছে না। ভারতবর্ষের উপর সুধীর অগাধ বিশ্বাস। ভারতবর্ষে উজ্জয়িনী যেখানে যাবে সেখানে আশ্রয় পাবে। তার অসহায়তার সুযোগ নিয়ে কেউ যদি তার উপর বল প্রয়োগ করে তবে তার ধর্ম তাকে রক্ষা করবেন। এদিকে বাদল যে বাহ্যজ্ঞানবিহীন, কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত। কোথায় কী বিপদে পড়বে, বিদেশ বিভূঁই, কে তার দুর্দিনের ডাক শুনবে। এই তো সে দিন একটি ছেলে হঠাৎ টিউবারকুলোসিস হয়ে মারা গেল। বাড়ীর লোক টাকা পাঠিয়ে দিতে পারল মাত্র, অসময়ে ছুটে আসতে পারল কি ?

"যেতে কি আমার অনিচ্ছা! কিন্তু কেমন করে যাই। বাদল যে কী চিজ তা তো আপনি কল্পনা করতে পারবেন না, আণ্ট। ওর বাবা যে ওকে আমার জিম্মা দিয়েছেন, আমারি সঙ্গে তাঁর চিঠিপত্র। আমি যদি যাই তবে তাঁর চিঠির জবাব পর্যন্ত পাবেন না। একমাত্র সন্তানের জন্য তাঁর উৎকণ্ঠা কি সাত হাজার মাইল দূরে তাঁর মৃত্যুর কারণ হবে না ?"

তখন খুড়ী প্রস্তাব করলেন, "বেশ। আমিই তাঁকে চিঠি লিখব।"

সুধী খুশি হল। তারপর চিন্তিত হয়ে বলল, "ধন্যবাদ, কিন্তু আপনিই বা তার খবর দিতে পারবেন কী করে ?"

"তুমি যে করে দিয়ে থাক। টাইম্‌স্ কাগজের বিজ্ঞাপন পড়ে।"

টাইম্‌স্ কাগজে সুধী বাদলের নূতন বিজ্ঞাপন পড়েছিল। লিখেছে, BADAL TO SUDHIDA: CHANGED RETREAT.

সুধী বলল, "না, আণ্ট। শুধু তাই করলে চলবে না। যে কোনো

মুহূর্তে বাদল সাহায্য চেয়ে পাঠাতে পারে। স্বয়ং এসে উপস্থিত হতে পারে অসুখ বাধিয়ে। আপনি কেন অত ঝক্কি পোহাবেন? আর সেই বা কেন অপরিচিতাকে উত্ত্যক্ত করতে রাজী হবে?"

তিনি গম্ভীর ভাবে মৌন অবলম্বন করলেন। সুধী অন্য প্রসঙ্গ পাড়ল। ওয়াইটদ্বীপের সেই দুঃখিনী জননীর কাহিনী। মিস মার্শ তাকে যা বলেছিলেন।

কিন্তু আণ্ট এলেনর তাতে বিচলিত হলেন না। বললেন, "ওটা একটা সমস্যাই নয়। সে নালিশ করলে ছেলেকে নিজের কাছে রাখবার অধিকার পেতে পারত। তার দরুন যা খরচ তাও আদায় করতে পারত।"

"কিন্তু, আণ্ট এলেনর," সুধী তাঁর ভুল দেখাল, "দেশীয় রাজারা ইংরেজের আদালতের অধীন নয়। ছেলে যদি ইংলণ্ডে জন্মাত তবে কথা ছিল। ছেলের জন্ম দেশীয় রাজ্যে। মামলা করতে হলে সেই রাজ্যের আদালতে করতে হত। সেখানে পরাভব ধ্রুব। তা ছাড়া জানাজানি যা হত তা একজন ভদ্র মেয়ের পক্ষে অসহনীয় লজ্জা।"

তিনি অসহিষ্ণু ভাবে বললেন, "থাক গে ওসব আন্তর্জাতিক জটিলতা। আইনের মারপ্যাচ। মেয়েটি ভদ্র ঘরের হলে ওর মধ্যে পা দিত না। আমি আন্তর্জাতিক বন্ধুতার পক্ষপাতী, কিন্তু এই সব গণ্ডগোল দেখে শুনে আন্তর্জাতিক বিবাহের বিরোধী।"

সুধী বলল, "আমিও।"

"দেখ সুধী," তিনি এতক্ষণ বাদে মনের ভাবনা বাইরে আনলেন, "তুমি বাদলকে আমার হাতে রেখে যাও, আমি তোমাকে ভরসা দিচ্ছি ওর বিপদে আপদে মানুষের পক্ষে যা সম্ভব তা আমি করব। যাবার আগে ওর ব্যাঙ্কের ঠিকানায় একখানা চিঠি লিখে ওকে আমার

পরিচয় দিলে তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারবে। চিঠিখানার এক প্রস্থ নকল তোমার বাড়ীওয়ালীর কাছে রেখে যেতে পার, ওটা না পায় তো এটা পাবে।"

সেই কথা সুধী ঘুরে ফিরে ভাবছিল। বাদলের সঙ্গে একবার না দেখা করে যাবে? তা কি হয়? দেখা হলে খুড়ীর সঙ্গে মোকাবিলা করে দিয়ে যেত। কে জানে শ্রীমদ্ বাদলচন্দ্র খুড়ীকে পছন্দ করবেন কি না। মতবাদ নিয়ে বিসম্বাদ না ঘটে।

এমন সন্ধিতে অশোকার চিঠি।

উত্তরে এর কী যে লিখবে সুধী ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। তার আবার আর একটি চিন্তা ছিল। উপনিষদের বাণীর সহিত সে মধ্যযুগের ভারতীয় সাধকদের বাণী তুলনা করছিল। তার ইচ্ছা ছিল, প্রাচীন গ্রীকদের বাণী সম্বন্ধে ডকটর মেলবোর্ণ-হোয়াইটকে জিজ্ঞাসা করবে। তুলনাটা শেষপর্য্যন্ত খ্রীস্টীয় সাধনার বাণীপর্যন্ত প্রসারিত হবে। উপনিষদ থেকে সে একটি শ্লোক তুলে নিয়েছিল।

"যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতাণি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥"

যখন সবকিছুকে আত্মা বলে জানি তখন মোহই বা কি, শোকই বা কোথায়। মধ্যযুগের ভারতীয় সাধকরা এর পরিবর্তন করে বলেছেন যখন সবকিছুকে ভগবানের লীলা বলে জানি তখন দুঃখই বা কি, দায়িত্বই বা কিসের? আত্মার স্বরাজ্য ক্রমে আত্মসমর্পণে পরিণত হয়েছে।

হাঁ, অশোকার চিঠি। এর উত্তর লিখতে হবে। কিন্তু কী লেখা

যায় ? বাদলকে যদি পাওয়া যায় তবে সুধীর ভারত যাত্রা অবধারিত। অশোকাকে আশা দিয়ে কী ফল ?

৪

দীর্ঘসূত্রিতা করে অশোকার চিঠির উত্তর সুধী দিয়ে উঠতে পারল না। তখন অশোকা তাকে ফোনে পাকড়াও করল।

"আমার চিঠি পেয়েছিলেন ?"

"পেয়েছিলুম।"

"উত্তর দিলেন না কেন ?"

"দেব।"

"কবে দেবেন, প্রলয়ের পরে ?"

"না, অত দেরি হবে না।"

অশোকা অভিমান ভরে বলল, "হুঁ। ততদিন আমি বাঁচলে হয়।"

সুধী বলল, "আমাকে মাফ করবেন।"

"কেমন আছেন ?" অশোকা প্রফুল্ল হয়ে বলল।

"মন্দ কী ? আপনি কেমন আছেন ?"

"মন্দ কী ?"

"আমি বোধ হয় আর বেশি দিন এদেশে নেই।"

অশোকা চমকে উঠে বলল, "ওমা, সে কী! য়াঁ! সত্যি বলছেন !"

"সম্ভব হয় তো ফিরে আসব। অন্তত ফিরে আসতে চাই।"

অশোকা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, "তবু ভালো। কিন্তু যেতে কি হবেই ?"

সুধী কারুণ্যের সহিত বলল, "না গেলে যদি হত তবে যেতুম না।" তারপর আরো বলল, "কিন্তু যাবারও বাধা আছে।"

অশোকা ভাবল বাধা হয়তো নেই। খুশি হয়ে খুশির খানিকটা ফোনের এপারে পাঠাল।

সুধী একটু দ্বিধার সঙ্গে বলল, "আপনাকে আমার বলবার ছিল এই যে, আপনি ও আমি যেন পরস্পরের মনের খুশি হয়ে থাকি। পদ্মপাতায় জল।"

অশোকা নিম্নস্বরে বলল, "বুঝতে পারলুম না।"

"পদ্মপাতার থেকে জল হয়তো গড়িয়ে পড়ে, হারিয়ে যায়। ভারতবর্ষে গিয়ে আমি হয়তো নাও ফিরতে পারি। যদি ফিরি তো একজনকে সঙ্গে নিয়ে ফিরব।"

"শুনতে পারি কে তিনি ?"

"আমার এক আত্মীয়া।"

অশোকা খুব খুশি হল না। বলল, "বেশ তো। তা হলে তো বড় ভালো হয়। তিনিও পড়বেন তো ?"

সুধী এর উত্তর দিল না, দিতে অপরাগ হল। অশোকা বলল, "কবে যাবেন বলে মনে হয় ?"

"সবই নির্ভর করছে আমার এক আত্মীয়ের উপর। সে লণ্ডনে নেই, এলে তার কাছে বিদায় নিয়ে যাব।"

অশোকা সন্তুষ্ট হল না। বলল, "আচ্ছা, তা হলে আসি।"

সুধী ভাবল প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়েছে। অশোকা এখন থেকে সরে সরে যাবে। কিন্তু অশোকা তাকে অবাক করে দিয়ে বলে গেল, "আপনি যখন এত কম দিন থাকবেন, কবে ফিরবেন ও ফিরবেন কি না ঠিক নেই, তখন আপনার এই কয়টা দিন মনের খুশির সঙ্গে কাটুক। কেমন ?" খিল খিল করে হেসে ফোন বন্ধ করে দিল।

পর দিন সকালবেলা সুধী খবর পেল একটি মহিলা তার সঙ্গে দেখা করতে চান। বসবার ঘরে গিয়ে দেখল অশোকা মার্সেলের সঙ্গে ভাব করছে।

"গুড মর্নিং।" বাড়ীর লোক পাছে কিছু মনে করে সেই জন্যে অশোকা কেতাদুরস্ত ভাবে বলল, "আপনাকে বোধ হয় বিরক্ত করলুম।" ইংরেজীতে।

সুধী পরিচয় করিয়ে দিল। দুষ্টু সুজেৎ টিপে টিপে হাসছিল, অশোকাকে না দেখিয়ে। বুড়ী চায়ের প্রস্তাব করলে অশোকা আভিজাত্যের দৃঢ়তার সহিত বলল, "আপনি কষ্ট করবেন না।" সুধী যে এই রকম একটা বাড়ীতে থাকে তা সে কল্পনা করেনি। যেমন সংকীর্ণ তেমনি রিক্ত। সুধীকে বলল, "যদি কাজ না থাকে আমার সঙ্গে আসবেন?"

সুধী চলল। এই সময় মার্সেল তার সাথী হয়। অশোকার অনুমতি নিয়ে মার্সেলকে দলে নিল। ঈষৎ দূরে অসমতল ময়দান, উজ্জ্বল সবুজ কচি ঘাস দিয়ে ছাওয়া। সুধী অশোকা ও মার্সেল বেড়াতে বেড়াতে কত দূর চলে গেল। যারা তাদের দেখল তারা কৌতূহলী হয়ে ভাবল এমন স্বামী-স্ত্রীর অমন সন্তান কী করে হয়।

সুধী বলল, "মনের খুশি, আমার এই বোনটিকে আমি বিশেষ ভালোবাসি। এরই জন্যে ওবাড়ীতে বাস করা।"

অশোকা যেন এতক্ষণে একটা ধাঁধার জবাব পেল। "তাই বলুন।"

"এরই জন্যে", সুধী বলে গেল, "লণ্ডনে নিদাঘ অতিবাহন। নতুবা ওয়াইটদ্বীপে বা অন্যত্র প্রকৃতির আরো নিকটবর্তী হতুম।"

অশোকা হেসে বলল, "তা হলে একে আমার ধন্যবাদ দিতে হয়।"

"কেমন করে যে একে রেখে ভারতবর্ষে যাব তা আমি ভেবে

ভেবেছি। অবশেষে স্থির করেছি, ভাবনা বৃথা। কারুর জন্তে কারুর কিছু আটকায় না। মা বাপ মারা গেলেও শিশু বেঁচে থাকে, বড় হয়, সাধারণত অমানুষও হয় না।"

মার্সেল চুপ করে বিদেশী বুলি শুনছিল। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে উঠছিল, ওটা কী পাখী, এটা কী গাছ। প্রজাপতি দেখলে নেচে অস্থির হচ্ছিল।

অশোকা মুচকি হেসে শুধাল, "এর উপর এত মায়া?"

"হাঁ। পূর্ব্ব জন্মে কেউ ছিল।" সুধী রহস্ত করে বলল।

অশোকা রহস্তকে সত্য ঠাওরাল। বলল, "ঠিক। তা নইলে এত মায়া।"

তারা এক জায়গায় ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে দিয়ে বসল। অশোকা বলল, "সেদিন আমরা পিকনিক করে এলুম। মোটরে করে খুব ঘোরা গেল। আপনার অবশ্য মোটর নেই।"

সুধী বলল, "থাকলে?"

"থাকলে আজ আপনার সঙ্গে কোথাও ঘুরে আসা যেত।"

"আপনি বুঝি মোটরে করে বেড়াবার পক্ষপাতী?"

"হাঁ। আপনি?"

"আমি পায়ে হাঁটি। দরকার হলে টিউব ছেড়ে বাসে চড়ি।"

অশোকা সুধীর বাসায় এসেছিল ট্যাক্সি করে। বাসে চড়তে কেমন লাগে তাই পরখ করার জন্ত সে যা দু-এক বার বাসে চড়েছিল। আশ্চর্য হয়ে বলল, "বাসে চড়তে ভালো লাগে?"

"পায়ে চড়তেই সবচেয়ে আরাম।" দুজনেই হেসে উঠল। মার্সেল না বুঝতে পেরে দু জনের মুখের দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে ভাবল হাসির কারণ কী ঘটল।

"এই মার্সেল," অশোকা তার গাল টিপে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আমার কাছে থাকবি? না? আমি অনেক খেলনা দেব, খাবার দেব, ভালোবাসব। থাকবি? তবু বলে, না!" মার্সেল তার দাদার দিকে ঘেঁষে বসল। তার ভয় হল, সত্যিই তাকে অশোকা ধরে নিয়ে যাবে। অশোকাও ছোট ছেলেমেয়ের সঙ্গে ভাব করার বিষয়ে আনাড়ি। তাদের খুশি করতে গিয়ে কাঁদিয়ে তোলে। মার্সেলকে টানতে শুরু করে দিল। মার্সেল যে কাঁদবে তার আভাস পেয়ে সুধী তাকে জড়িয়ে ধরল। সেই সূত্রে অশোকার হাতে তার হাত ঠেকল। অশোকা হাত সরিয়ে নিল। সুধীও সঙ্কুচিত হল। অশোকার চোখে বিদ্যুৎ। সুধীর চোখে লজ্জা। দুজনেই চোখ নামাল।

অশোকা কৃত্রিম স্বরে বলল, "তা হলে সেই কথা রইল। আপনি যতদিন না ফিরছেন আমি একে কাছে রাখব।"

সুধী বলল, "ওর পালক পিতামাতা ওকে এক দিনও ছেড়ে থাকতে পারে না। ওরা কেন রাজী হবে?"

"আমি যে ওকে খুব যত্নে রাখব।"—তার মানে আমরা বড়লোক, ওর পালক পিতা মাতা গরীব।

সুধী পাশ কাটিয়ে গেল। বলল, "এখন আসল মানুষকে রাজী করান। মার্সেল, ইনি তোর দিদি।"

অশোকা অশোক ফুলের মতো আরক্ত হয়ে ভাবল, দাদার বন্ধু বুঝি দিদি হয়। যাক, পরে শিখিয়ে নিতে পারবে, দিদি নয়, বৌদিদি। হঠাৎ সুধীকে বলল, "কই মশাই, আমার চিঠির উত্তর কই? কবে পাব? ইহজন্মে, না, জন্মান্তরে? আপনি তো জন্মান্তর মানেন।"

সুধী বলল, "কখন বললুম জন্মান্তর মানি ?"

"ওমা, বলেননি ?"

"বলেছি নাকি ?" সুধীর মনে ছিল না। বিস্মিত হল। "যদি বলে থাকি তবে বুঝিয়ে বলিনি। প্রচলিত অর্থে আমি জন্মান্তর মানিনে। পৃথিবী ছাড়া গ্রহনক্ষত্র আছে, এ জগৎ ছাড়া অন্য জগৎ আছে, মানুষ ছাড়া জীব আছে, জীব ছাড়া সত্তা আছে। কী যে হব কিছুই জানিনে, জানা যায় না। কর্মফলে ব্রাহ্মণ হয়েছি, কর্ম দোষে চামার হব, এমনধারা জন্মান্তরবাদী নই।"

অশোকা কী বুঝল সে-ই জানে। বলল, "আমরাও ব্রাহ্মণ।"

সুধী হেসে বলল, "ঠিক জানেন ?"

অশোকা চকিত হয়ে বলল, "শুনেছি।" তারপর সপ্রতিভভাবে বলল, "জানব কেমন করে বলুন, হাইকোর্টের জজ হবার আগে বাবা ছিলেন জেলা জজ। কত ঘুরতে হয়েছে। কত মিশতে হয়েছে। কে কী জাত তা নিয়ে চিন্তা করবার সুযোগ পাইনি। ঠাকুমার আচারনিষ্ঠা থেকে বুঝি আমরা ব্রাহ্মণ। কিন্তু মার সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য। আমাদের বাড়ী থাকেন না। বলেন, তোদের সাহেবী আচার। আমার পোষাবে না। কিন্তু "অশোকা চাউনি দিয়ে ইঙ্গিত করে বলল, "ওই যে বলেছি, মার সঙ্গে আদৌ বনে না।"

মিসেস তালুকদারকে সুধীর তেমন মনে ধরেনি। মিস্টার তালুকদারকেও। যেন ওঁরা ভুঁইফোঁড় কাঞ্চনকুলীন। না সৎব্রাহ্মণ, না পাকা ইঙ্গবঙ্গ। শুনেও ছিল কার কাছে যে মিস্টার তালুকদার বুড়ো বাপ মাকে বাড়ীতে আসতে দেন না, পাছে সাহেব বন্ধুদের সমঝাতে হয় যে তাঁরা তার বেয়ারার মা বাপ, তাঁর নয়। সেই দুঃখে বাপ গেলেন মরে। মা ছেলের কাছ থেকে মাসোহারা পান, দেশে

থাকেন, কদাচিৎ এক-আধ বার তীর্থ করতে যাবার সময় পথে পড়ে বলে কলকাতায় জজ সাহেবের বাড়ী হয়ে যান। সুধী এসব শুনে ভেবেছিল উড়ো গুজব। বড়লোক মাত্রেরই নামে অমন রটে। তারপর বিলাতে তাঁদের চাক্ষুষ করে তার একটু খটকা বেধেছিল।

"কুক্ উ।"

কাছে কোথায় কু-কু ডেকে উঠল। অমনি মার্সেল তার প্রতিধ্বনি করল, "কুক্ উ।" তা শুনে অশোকা তার সঙ্গে পাল্লা দিল, "কুক্ উ।"

কিছুক্ষণ তিনটি কু-কু পাখীর ধ্বনি প্রতিযোগিতা চলল। তিন জনেই ক্ষেপে গেল। মার্সেল অশোকার দিকে চায়, অশোকা চায় মার্সেলের দিকে সোজা চোখে আর সুধীর দিকে আড় চোখে। আর তুজনে যুগপৎ কু-কু পাখীর পুনরুক্তি করে। কু-কু যেই "কুক্" করছে, অমনি মার্সেল তার মুখ থেকে রা কেড়ে নিয়েছে, অশোকাও পেছিয়ে থাকেনি। অবশেষে এমন হল যে কু-কু "কুক্" না করতে এরা অগ্রিম "কুক্" করে ওঠে, "উ" করতে গিয়ে দেখে কুকু মূক। সুধী হাসে।

মার্সেলকে অশোকা অপ্রতিভ করল দৌড়ের উপক্রম সত্ত্বে না দৌড়িয়ে। মার্সেল দেখল সে একাই "কুক্" করছে, অশোকা তার সঙ্গে "কুক্" করবার অভিপ্রায়ে মুখ বাড়িয়ে অমনি নিরস্ত হচ্ছে। ঠোট ফুলিয়ে ফোঁপাতে যাবে, এমন সময় সুধী বলল, "মার্সেল জিতেছে। সাবাস মার্সেল! হুরে। হুরে।" সুধী ও তার অনুকরণে অশোকা তালি দিল।

৫

জার্মানী থেকে একখানা চিত্র পোস্টকার্ড পাঠিয়ে দিয়ে দে সরকার তার পিঠে লিখেছে তিন ছত্র গদ্য কবিতা, পড়তে পদ্যের মতো।

জার্মান ললনা সুন্দরী নয়—এ কথা যে বলে সে রাইন তরুণী দেখেনি।

জার্মান জাতি বীয়ার খায়—এ কথা যে বলে সে রাইন সুরা চাখেনি।

রাইন নদী দেখল না যে—বিধাতা তার কপালে রসিক শব্দ লেখেনি।

সুধী এতদিন দে সরকারের খোঁজ নিতে পারেনি, খেয়াল হয়নি। সে যে ছুটিতে রাইনলণ্ড যাবে তার পূর্বাভাস দেয়নি। কবে ফিরবে কে জানে। ইতিমধ্যে সুধীর স্বদেশপ্রত্যাবর্তন সম্ভবপর। দে সরকারের কাছে বিদায় নেওয়া বোধ করি হল না।

সুধী ভাবল একবার বিভূতির খবর নিলে হয়। এক কানা গলিতে বিভূতির বাসা। ল্যাণ্ডলেডি সুধীকে চিনত। খাতিরও করত খুব। দরজা খুলে দিয়ে দুই হাত তুলে বলল, "আ আ আ! কাকে দেখছি! মিসতের চাক্ চাক্ চাক্রাবর্তী!" তার উচ্চারণের বাহার সুধীকে রোমাঞ্চিত করল।

"আসুন, বসুন। হাঁ। মিশতের নাগ আছেন। তাঁর ঘুম ভাঙেনি, আমাকে বলেছেন দশটার সময় জাগাতে।" বুড়ী বড্ড বাচাল। বলে চলল, "সেই আড়াইটার সময় ডান্স হল থেকে ফিরেছেন। তখন থেকে আর টুঁ শব্দটি নেই। নয়টা বাজল। ডাকব তাঁকে? অকালে ঘুমটা ভাঙাব? না, আপনি একটু ঘুরে আসবেন?"

বিভূতি যে ডান্স হলে যাতায়াত শুরু করেছে এ সংবাদ সুধীকে চটিত করেছিল। সে বলল, "আমাকে উপরে নিয়ে চল, মিসেস রসেলি। আমি ওঁকে জাগাব।"

সুধী একটু জোরে ধাক্কা দিতেই ভিতর থেকে বিভূতি হাঁকল, “হু’স ত্যাট্ ?” সুধী ধাক্কার মাত্র বাড়িয়ে দিল। বিভূতি রুখে বলল, “আই সে, ডোণ্ট্ নো আই য়্যাম ইন বেড ?”

সে ঠাওরেছিল মিসেস রসেলি। কিন্তু সুধী যখন শুধু বলল “ওঠ হে,” তখন সে এক লাফে দরজার কাছে এসে সেটাকে ফাঁক করে দেখল সুধীই। গদগদ স্বরে বলল, “কার মুখ দেখে উঠেছি! কী সৌভাগ্য! আসুন আসুন।” গায়ে ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে সে সুধীকে ভিতরে নিয়ে গেল। বলল, “আনতে বলি দু পেয়ালা গরম গরম ?”

সুধী আপত্তি করল না। বিভূতি দাঁতে ব্রাশ চেপে ফরমাশ করতে বাইরে গেল। সেই অবকাশে সুধী লক্ষ করল বিভূতির স্ত্রীর ফোটোর পাশে আর এক রমণীর ফোটো।

“তারপর দাদা,” বিভূতি সোল্লাসে বলল, “পায়ের ধুলো পড়ল যে আজ এমন সময়।

“হাঁ হে,” সুধী গম্ভীর মুখে বলল, “তুমি ডান্স হলে যাচ্ছ—”

সুধীর কথা শেষ না হতে বিভূতির কথা বেরিয়ে এল সবেগে, “আপনি কী করে জানলেন ?”

“তুমিই বলতে পার আমি কী করে জানি ?”

“না, না, আমি বলতে পারিনে। সত্যি কী করে জানলেন ?”

“আমার অলৌকিক ক্ষমতা আছে—”

“ঠিক, ঠিক, যথার্থ।” বিভূতি ঘাবড়ে গিয়ে বলল, “দাদা সবই তো জানেন। দোষ কি আমার ? আমাকে নিয়ে যায়, না গিয়ে পারি ? ধরতে গেলে কী এমন অন্যায়! আমি তো পান করিনে। কেবল নাচি, প্রকারান্তরে ব্যায়াম করি।

সুধী প্রত্যক্ষ করল এরই মধ্যে বিভূতির মেদক্ষয় হয়েছে, তার শরীরে আর তৈলচিক্কণ নধর ভাব নেই। বলল, "অন্যায় কিছু নয়। তবে বাড়ীতে তোমার স্ত্রী রয়েছেন। তাঁর মনে আঘাত লাগবে।"

বিভূতির মুখ শুকিয়ে আর এক পোঁচ কালো হয়ে গেল। "তাকে কি আপনি জানাবেন, দাদা!"

"না, ভাই। আমার অমন পরোপকার প্রবৃত্তি নেই। তবে তুমি তাঁর স্বামী। তুমি তাঁকে না জানালে অন্যায় হবে।"

"তবে," বিভূতি অম্লান বদনে মিনতি করল, "আপনিই অনুগ্রহ করে দু লাইন লিখে দিন, আপনার চিঠি পেয়ে খুশি হবে। ওকে আপনার বিষয় এত লিখেছি যে ও আপনাকে আপনার লোকের মতো চেনে!"

সুধী হেসে বলল, "কী লিখতে হবে?"

"লিখবেন নাচ বড় নির্দোষ ব্যায়াম। যস্মিন্ দেশে যদাচার। বিলাতে বাস করতে হলে বিলাতী আচার মানতে হয়। আমার হাত নেই। এই সব।"

সুধীর বিষম হাসি পাচ্ছিল। কোনো মতে সম্বরণ করে বলল, "পড়াশুনা কত দূর?"

"হুঁ, পড়াশুনা!" বিভূতি তাচ্ছিল্য সহকারে নাসিকা কুঞ্চিত করল। "নো হোপ। বৃথা, বৃথা। আত্মাকে কষ্ট দিয়ে কেন পাপ করি? ক্যাপিটালিস্‌ম্ যত কাল থাকবে, আনএমপ্লয়মেণ্ট থাকবে তত কাল।"

বিভূতি যে রবিবারে হাইড পার্কে যায়, সেখানে কমিউনিস্টদের বক্তৃতা শোনে, সেই হয় তার চিন্তার রসদ। সুধী এত জানত না।

"চল তা হলে এক সঙ্গে দেশে ফিরি।" সুধী প্রস্তাব করল।

বিভূতি বিশ্বাস করতে পারছিল না। বলল, "যান।"

"সত্যি হে। আমি হয়তো দু-এক মাসের মধ্যে রওনা হচ্ছি।"

বিভূতি ভেবে বলল, "আমারও ইচ্ছা করে যেতে। গিয়ে সবাইকে দেখে শুনে আসি। কিন্তু টাকা—বুঝলেন কিনা—সেই ঘুরে ফিরে কমিউনিস্‌মে পৌঁছতে হয়। কী তত্ত্বই বানিয়েছে মার্ক্‌স্।"

বিভূতিকে সুধীর দরকার ছিল। সুধী উজ্জয়িনীকে দেখেনি, দেখলে চিনতে পারবে না হয়তো। ফোটো থেকে মানুষ চেনা অসাধ্য না হোক, নিশ্চিত নয়। পক্ষান্তরে বিভূতি উজ্জয়িনীকে এক মুহূর্তে চিনবে। তাকে সঙ্গে নিয়ে ভারত ভ্রমণ সুধীর কল্পনায় স্থান পেয়েছিল।

"টাকার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না যদি আমার সাথী হও।" সুধী আশ্বাস দিল।

বিভূতি বিরাট হাঁ করে বিশ্বরূপ দর্শন করাল। "আপনি দেবেন টাকা! বাই জোভ! দিন, দিন, হাতটা দয়া করে বাড়িয়ে দিন। কন্‌গ্রাচুলেশন্‌স্।" চুপ করে থেকে ফোয়ারার মতো ফুকরে উঠল। "দাদা, টাকাই যদি দেবেন আপনার সাথী হলে তবে ওদিকে কেন, চলুন স্কটলণ্ড যাই। ডলিরা গেছে গল্‌ফ্‌ খেলতে। আপনি ও আমি পার্টনার হয়ে য্যায়সা কুদরৎ দেখাব যা দেখে ডলিদের তাক লাগবে। তা নয় তো ভারতবর্ষ! করবেন কী ওখানে গিয়ে, সময় কাটবে কী নিয়ে?"

"কী করে কাটছে শুনতে পাই?"

"জানেন তো সবই। ঐ যে ভাল্ জিনিষটা, দাদা, পেয়ে বসেছে। কী উন্মাদনাই যে অনুভব করি যখন দেখি সারি সারি বাতি ঝলমল করছে, ঝুড়ি ঝুড়ি নরনারী সমবেত হচ্ছে, বিচিত্র বেশ সুতীব্র গন্ধ,

চপল চাউনি, তরল হাস্ত, যখন কণ্ডাক্টরের ইশারায় অর্কেস্ট্রায় বাজে প্রেলুড, প্রত্যেক যুগল আসন ছেড়ে আসরে দাঁড়ায়, সঙ্গী তার সঙ্গিনীর কটি বেষ্টন করে ও সঙ্গিনী করে তার সঙ্গীর স্কন্ধে করস্থাপন, তখন কি আমার জ্ঞান থাকে যে আমি একটি নারীর স্বামী, দুটি সন্তানের জনক ?"

সুধী নিরুত্তর। বিভূতি বলতে থাকল, "তখন মনে হয় আমি আত্ম কালের নবীন নর, সত্ত পৃথিবীতে এসেছি, আমার নেই অতীত স্মৃতি। যে আমার সঙ্গিনী রূপে বর্তমান তারই সঙ্গে আমার বিশ্বভোলা নৃত্য।

চা এসে পড়ল।

সুধী বলল, "আমি কেন যাচ্ছি জান ?"

"কেন ?"

"ভারতের বৃহৎ অভ্যন্তরে একজন নিরুদ্দেশ হয়েছে। তার অন্বেষণে।"

বিভূতি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, "কে ? কে ?"

"এখন বলব না। যদি আমার সঙ্গী হও তা হলে দেখবে উন্মাদনার অভাব নেই, তার সূচনা দিলুম।"

বিভূতির ঔৎসুক্য তিরোহিত হল না। কী ভাবে নিরুদ্দেশ হয়েছে ? কেউ কি ধরে নিয়ে গেছে ?"

"তা যদি ফাঁস করি তবে কি তুমি সাথী হতে রাজী হবে ? অ্যাডভেঞ্চারের বই এত পড়েছ, অ্যাডভেঞ্চারের ছবি এত দেখেছ, কেউ কি তোমার মতো ঘরে বসে নিশানা পায় ? ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে তবে তো পাবে পায়ের দাগ কি রক্তের দাগ কি রক্তের ছাপ ? শার্লক হোম্‌স্ কেমন করে তাঁর ক্লু আবিষ্কার করতেন ?"

বিভূতির চোখ কপালে উঠে চুলের গোড়ায় ঠেকেছিল। "য়্যাঁ! তবে খুন বলুন!...না? কিডন্যাপিং? . না? যাই হোক, এ রহস্যের শেষ কোথায় তা বিভূতি নাগ খুঁজে বার করবে।"

"আসছ তো?" সুধী মুচকি হেসে শুধাল।

"নিশ্চয়।" বিভূতি সুদৃঢ় স্বরে বলল। "তবে ঘটনাটা ওদেশে না ঘটে এদেশে ঘটলেই পারত। য়্যাডভেঞ্চারও হত, ডাম্পও চলত, গল্‌ফ্‌ও বাদ যেত না। যাক, শার্লক হোম্‌স্‌ হতে আমার ভারি সাধ। এই আবিষ্কারটা যদি করতে পারি আমারও নাম ডাক হয়ে যাবে। ভেবে দেখলুম, দাদা, ঐ আমার প্রকৃত পেশা। আমি প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভই হব। তবে ওদেশে নয়, ওদেশে পয়সা নেই, গুণের আদর নেই, ওদেশে আমার কদর বুঝবে না। এই অভিজ্ঞতাটা ওদেশে অর্জন করে যশ ও অর্থ এদেশে অর্জন করব।"

## ৬

প্রায় প্রতিদিনই অশোকার সঙ্গে সুধীর সাক্ষাৎ ঘটতে থাকল। অভ্যাসবশত ব্রিটিশ মিউজিয়ামে প্রত্যহ পড়তে আসে সুধী, অশোকা এ বার্তা জেনেছিল। তার তো পাঠাগারে প্রবেশের অনুমতি নেই, সে বাইরে পায়চারি করত আর ছবি কিনত। পাঠাগার থেকে সুধী নিষ্ক্রান্ত হলে অশোকা তার সম্মুখীন হত। সুধী বলে উঠত, "আপনি যে।" অশোকা সাফাই দিত ছবিগুলি দেখিয়ে। সুধী বুঝত। অশোকাও বুঝত যে সুধী বুঝেছে।

তারপর কোনো উদ্যানে বা উপবনে বসে বিশ্রম্ভালাপ।

কথায় কথায় সুধী তার পারিবারিক কাহিনী জেনেছিল। তার দাদা বছর তিন আগে মেনিনজাইটিসে মারা যায়। স্যাণ্ডহার্স্টে ফেল করে ভাঙা শরীরমন নিয়ে দেশে ফিরেছিল। আবার নূতন করে শুরু করবার উদ্যম ছিল না। তার মৃত্যুর পর মা বায়না ধরলেন মেয়েকে ও ছোট ছেলেকে নিয়ে বিলাতে বাস করবেন। তিনি বিলাতে থাকলে তাঁর বড় ছেলে কখনো ফেল করত না। ছোটটি এখন তাঁর আশাভরসা, তার যেন অমন দুর্গতি না হয়। কাজেই অশোকা এসেছে এক রকম ফাউ। এ দেশের চেয়ে ও দেশই তার ভাল লাগে। তার ঠাকুমাকে তার বাবা বাড়ীতে এনেছেন, তাঁর ভারি অনুতাপ হল ছেলে হারিয়ে, তিনি জানলেন ছেলেকে ছেড়ে মাবাপের কত কষ্ট। আহা, অশোকা যদি দেশে যেতে পেত তা হলে কি মজাই হত। তার মনের খুশি তো চললেন, সে-ই থাকল পড়ে। বাবাও হাইকোর্ট খোলার আগে ফিরবেন। অশোকার কলেজ খুলে যাবে। তখন সে কিছু আমোদ পাবে বটে, সহপাঠিনীদের সাহচর্যে। কিন্তু আর ভালো লাগে না।

অশোকা পরিহাসের সুরে বলে, "আমাকে শুদ্ধ নিয়ে চলুন না, মনের খুশি।"

সুধীর মতো স্থিতধী পুরুষেরও সলজ্জতা সঞ্চার হয়। বলে, "ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ছোট সে তরী। বিভূতি নাগের ভারে রয়েছে ভরি।"

বিভূতিকে অশোকা চিনত। বিভূতি তাদের ওখানে কল করেছে কয়েকবার। বিভূতিরই কাছে সে সুধীর ঠিকানা পায়। অশোকা জিজ্ঞাসা করল, "সে কী রকম?"

"বিভূতি ও আমি একসঙ্গে যাচ্ছি। দুজনে মিলে ভারতভ্রমণ

করব। তারপর ওকে ওর বাড়ীতে দিয়ে ওর বাবাকে বলব আর যেন ওকে এদেশে না পাঠান।"

অশোকা প্রশ্ন করতে চায়, কেন? কিন্তু হয়তো কোনো গোপন হেতু থাকবে, সুধীকে বিব্রত করা হবে। প্রশ্ন করল চাউনি দিয়ে। সুধী বলল, "পড়াশুনা করে না, করবেও না। মিশুক স্বভাবের ছেলে। মিলে মিশে আড্ডা দিয়ে নেচে ও ঘুমিয়ে সময় কাটায়। বাড়ীর লোক কত প্রত্যাশা করে, ওদের অবস্থাও স্বচ্ছল নয়।"

অশোকা জানতে চাইল সুধীর নিজের কথা। "কই, আপনি তো আপনার কথা কিছু বলেন না, আপনি বড় চাপা।"

"আমার কথা অতি সামান্য।" সুধী একটি বাক্যে শুরু ও সারা করে। "পিতৃমাতৃহারা, একজনের চলে যাবার মতো বিষয় সম্পত্তি আছে, গ্রামে বসে তাই দেখাশুনা করব, তার আগে নিজেকে তৈরি করে নিচ্ছি।"

আই সি এসও নয়, ব্যারিস্টারও নয়, নয় ডি লিট কি পি এইচ ডি। সুধী তবে কিছু নয়। অশোকা মনে মনে নিরাশ হল। আশা করল, হয়তো জমিদার। বিনয়বশত বিষয়সম্পত্তিকে বলছে একজনের মতো।

"আপনিই সুখী।" অশোকা বলল, "স্বাধীন স্বায়ত্ত জীবন। নির্ঝঞ্ঝাট দিনযাপন। আমার তো খুব লোভ হয়।" দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "কিন্তু আমি জানি আমার কী হবে।"

সুধীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "কী?" এ তার অনধিকারচর্চা।

"কী?" অশোকা হেসে উড়িয়ে দিতে চাইল। "কী? ডলিদিকে তো দেখেছেন। মা আমাকে তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করতে বলেন। ছেলেদের যেমন আদর্শ ছেলে থাকে, মেয়েদেরও তেমনি আদর্শ

মেয়ে। ডলিদি আমাদের সেই আদর্শ। তবে সবাই অতুল চাটুজ্যে হয় না, লর্ড সিন্‌হাও একক। আমি ফেল করতে পারি, দাদার মতো।"

প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিয়ে সুধী শুধাল, "ডলিকে যখন আপনি এত ভালো করে জানেন তখন তাঁর বোন উজ্জয়িনীকেও জানেন আশা করি।"

"উজ্জয়িনী!" অশোকা বিস্মিত হয়ে বলল, "না তো! ওরা তিন বোন—লিলি ডলি ও বেবী।"

সুধী বলল, "তবে সেই বেবীই হচ্ছে উজ্জয়িনী। চেনেন তাকে?"

"উহুঁ।" অশোকা মাথা নাড়ল। "দেখিছি বটে। কিন্তু ওর সঙ্গে আলাপ হয় নি। ওটা তো একটা পাগলী। ওর নাকি বিয়ে দেওয়া হয়েছে ওকে শোধরানোর জন্যে।"

সুধী হেসে বলল, "হাঁ। যার সঙ্গে দেওয়া হয়েছে সেও পাগল। রাজযোটক হয়েছে।"

"ও ছাড়া আর কী হত?" অশোকা হেসে বলল, "কোনো ভালো মানুষ কি ওকে বিয়ে করতে রাজী হত?"

"যা বলেছেন।" সুধীর স্বরে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ। "কিন্তু সেই পাগলীর পাগলটি কে শুনবেন? সে আমার অনুজোপম, সে আমার প্রিয়তম বন্ধু। সেই সূত্রে উজ্জয়িনীও আমার পরমাত্মীয়া।"

অশোকা বিস্ময়বিমূঢ় হল। প্রকৃতিস্থ হয়ে বলল, "বেশ বেশ। একটা পাগলাগারদ খুলুন। গ্রামে বসে জমিদারি করেও হাতে অনেক সময় থাকবে।"

"যা বলেছেন। আপনি ওদের সম্মত করাতে পারেন?"

অশোকা মাথা হেলিয়ে বলল, "আমার মাথাব্যথা পড়েছে কি-না!"

দুজনে চুপ করে থাকল, নূতন কোনো প্রসঙ্গের ধ্যানে।

অশোকা হঠাৎ হাসির তরঙ্গ তুলে বলল, "আমার চিঠির জবাব কই, মশাই ?"

সুধী ভুলে গেছল। দরকারই বা কী। রোজ দেখা হয়। বলল, "মৌখিক জবাব দিলে গ্রাহ্য হবে ?"

অশোক বলল, "কেন বলুন তো ? শতং বদ মা লিখ। এই ভয়ে ?"

সুধী বলল, "এ ভয় কি একেবারে নেই ? আপনার মা যদি পড়েন ?"

"কী করে পাবেন ? আমি যে পিয়নের পায়ের শব্দ চিনি।"

"রোমান্স একেই বলে।"

"তা যদি হয় তবে সব মেয়েই রোমান্টিক।" অশোকা আরো বলল, "শুনবেন ? আমি এমন কোনো কোনো মেয়েকে জানি যারা কখনো কারুর চিঠি পায় না বলে নিজের নামে চিঠি লিখে ডাকে দেয়।"

একদিন সুধীকে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে না পেয়ে অশোকা অপ্রস্তুত হল। দীর্ঘ ও ব্যর্থ প্রতীক্ষার পর ফোন করল সুধীর বাসায়। শুনল সুধীর অসুখ করেছে। অমনি চলল তাকে দেখতে। যদিও তার বাসা অশোকার বিরুচিকর।

সুজেৎ ছিল না। মাদাম বলল, "বসুন। খবর দিচ্ছি।"

সুধী নিজেই নেমে এল। অশোকা জিজ্ঞাসা করল, "কী অসুখ, মনের খুশি ?"

"বুঝতে পারছিনে।" সুধী বলল। "বোধ হয় কাল রাত জেগেছি বলে গা মেজ-মেজ করছে। শুয়ে শুয়ে টোমাস মান পড়ছিলুম। অসুখও সত্য, সেও আদিম তথা অন্তিম। তাকে বাদ দিয়ে ভাবা যায় না।"

অশোকা এসবের ধার ধারে না। না ভাবুকতা, না কল্পনা, না আবেগ—কোনোটা তার স্বভাবে নেই। কমনসেন্সের সহায়তায় জীবন-সংসার চালায়, পাকা গৃহিণীর মতো। তার ঘুম ভালো হয়, হজম ভালো হয়, শরীরে গ্লানি নেই, আলস্য নেই। সাধারণ বুদ্ধিতে যা করতে বলে তাই সে করে। তার উচ্চাভিলাষ বা আত্মাভিমান নেই। 'যে পথ দিয়া চলিয়া যাব সবারে যাব তুষি' নারীসাধারণের যা ফিলসফি তারও তাই। সাড়ে পনেরো আনার থেকে আলাদা করে দেখতে তার সাহস হয় না, প্রবৃত্তি হয় না। ভাগ্যক্রমে ধনী হয়েছে, দরিদ্র হলেও তার স্বভাবের ব্যত্যয় হত না। তবে ধনের আনুষঙ্গিক সুরুচি ও স্বাচ্ছন্দ্য সে প্রাণপণে ভালোবাসে। দরিদ্র হয়ে থাকলে সে এ দুটির অর্জনচেষ্টা করত, হাল ছাড়ত না। আদর্শবাদ কি খোশখেয়াল তার মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না। তত্ত্ব কি তর্ক যেখানে সেখান থেকে সে শত হস্ত দূরে।

"কী প্রলাপ বকছেন? দেখি, জ্বর আছে কি না!" অশোকা সুধীর কপালে হাত রাখল। "আছে। তবে বেশি নয়। কে বলল আপনাকে নামতে? আমি কি পারতুম না সিঁড়ি বেয়ে উঠতে?" অশোকা শাসন করল।

এর উত্তর দিতে পারত, দিল না সুধী। বলল, "বাড়ী যান। নইলে চিঠিখানা পর-হস্তগত হবে।"

"কী চিঠি?...ওহ্। আপনি লিখেছেন আমাকে! সত্যি? না, না। সত্যি? কী লিখেছেন শুনি?... আচ্ছা, কত বড় চিঠি লিখেছেন?"

"চিঠি ছোট। কিন্তু লিখতে পুরো পাঁচ ঘণ্টা লেগেছে।"

"ওমা! পাঁচ ঘণ্টায় একখানা পুঁথি লেখা যায়।"

"আবার একটি কবিতার চার পংক্তিও লেখা যায় না।"

অশোকা উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, "চিঠিখানার জন্যে ছুটতে ইচ্ছা করছে অথচ রোগীকে একা রেখে যেতেও মন সরে না। কী সঙ্কট। চিঠি লিখলেন তো একদিন আগে লিখতে কী ক্ষতি হত! ...জানি কী বলবেন। তা হলে একদিন আগে অসুখ করত।"

সুধী বলল, "চা খাবেন?"

অশোকা এ বাড়ীর পেয়ালাপিরিচ কেমন হতে পারে তা আন্দাজ করে বলল, "না।"

সুধী বলল, "অসুস্থ হলে ইনটুইশনের একটা দিক খুলে যায়। অস্বাস্থ্য মানে কী? মানে, আমাদের শরীরে যে লক্ষ লক্ষ প্রাণী আছে তাদের সঙ্গে নবাগতদের সামঞ্জস্য হতে পারছে না। সেই বিক্ষোভের নাম জ্বর। হয় এ পক্ষ জিতবে, নয় ও পক্ষ জিতবে। তারই উপর আমাদের দেহযাত্রার ভাগ্য নির্ভর করে। আশ্রিতপোষণই আমাদের ধর্ম। আমাদের আহার থেকে ওরাও ভাগ পায়।"

"আবার আবোল তাবোল!" অশোকা মিষ্টি করে বলল। "শোন্ একটু।" এই বলে সুধীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।

"আশ্চর্য আমাদের শরীররহস্য। যা নেই শরীরে তা নেই জগতে। ভাণ্ডের ভিতর ব্রহ্মাণ্ড। সাধকরা তবু একে অবজ্ঞা করেছেন, ঘৃণা করেছেন। কী এর অপরাধ! এর বিকার আছে। এই?"

"চুপ, চুপ।" অশোকা তার কপালে থাপড় দিয়ে বলল, "আর একটিও কথা না।"

এমন সময় বেল বেজে উঠল! মার্সেল ছুটল দ্বার খুলে দিতে। মাদাম বেরিয়ে এল কে এসেছে দেখতে। জ্যাকি ঘেউ ঘেউ করে শিকলের বাধা পেয়ে আনুনাসিক স্বরে চেঁচাতে থাকল!

৭

"কে? বাদলা?" বাদল ঘরে ঢুকতেই সুধী বলে উঠল।

অশোকার দিকে দৃক্‌পাত না করে সুধীর কথায় কর্ণপাত না করে বাদল হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "সুধীদা, ফ্রী উইল না ডিটারমিনিস্‌ম্‌?"

সুধী অশোকাকে বলল, "ইনিই আমার বন্ধু বাদল সেন, এক নম্বর পাগল। বাদলকে বলল, "আর ইনি আমার মনের খুশি, অশোকা তালুকদার।"

নবপরিচিতদের সম্ভাষণপর্ব সমাধা হলে সুধী বলল, "চা আনতে বলি। কেমন?"

বাদল বুভুক্ষায় মারা যাচ্ছিল। সায় দিল। অশোকা বিদায় নিতে উঠল। "আজ আসি। এখন একটু ভালো বোধ করছেন তো?"

বাদলকে পেয়ে সুধী চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। বলল, "চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিই।" বাদল ততক্ষণে গভীর ভাবনায় তলিয়ে গেছল। সুধী দুজনে কখন ঘর থেকে গেল তাও রইল তার অলক্ষিত।

অশোকার ট্যাক্‌সি এবার আটক ছিল। অশোকার ইঙ্গিতে স্টার্ট দিল। অশোকা বলল, "ঘরে বন্ধু না থাকলে ও গায়ে জ্বর না থাকলে আজ আপনাকে মোটরে করে লুট করা যেত। যাকে বলে মোটর রবারি।"

সুধী স্মিত হাসল। "কষ্ট করে এসেছিলেন, যত্ন করে গেলেন। যদি সম্পর্ক অন্তরকম হত অজস্র ধন্যবাদ দিতুম।"

তারপর বাদলের কাছে ফিরে তার হাত দুটাকে টেনে নিজের

হাতে ভরল। কী বলবে, বাণীহারা হয়েছিল। সারাদিন লঙ্ঘন দেওয়ায় দুর্বল বোধ করছিল। আনন্দের অশ্রু সংযত করতে পারল না। "বাদল!" এই পর্যন্ত বলে রুদ্ধ কণ্ঠে রইল।

"আমার মাথা খারাপ করে দিয়েছে, সুধীদা।" বাদল নালিশ করল, কিন্তু কার নামে তা বোঝা গেল না। সে কি কোনো মানুষ, না, একটা জিজ্ঞাসা?

"আচ্ছা, সুধীদা, তুমি কখনো এ বিষয়ে চিন্তা করেছ? ইতিহাস বলতে আমি বুঝেছিলুম বেহিসাবী বিবর্তন। দেখছি, আমার ব্যাঙ্কের জমা যেমন করে ফুরিয়ে গেছে তেমনি করে মানবজাতি একদিন ফুরিয়ে যেতে পারে।"

"ব্যাঙ্কের জমা ফুরিয়ে গেছে নাকি।"

"হাঁ, ভাই। কিছু টাকা দিতে পার?"

সুধী রাজী হল। বাদল যা বলছিল সেই প্রসঙ্গে ফিরে গেল। "অপচয়ের হিসাব রাখতে হবে মানবকে। নইলে একদিকে যেমন সুদের অর্থাৎ বিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে অন্য দিকে তেমনি রয়েছে আসল পর্যন্ত লোপের—অবর্তনের—সম্ভাবনা। আমার ধারণা বদলে গেছে, সুধীদা।" করুণ স্বরে বলল, "আমার স্বতঃস্ফূর্ত আশাবাদ কবে কোথায় কেমন করে হারাল খুঁজে পাইনে, সুধীদা।"

বাদলকে খেতে বসিয়ে সুধী বলল, "শুধু তোর আশাবাদ নয় রে, তোর আরো কিছু হারিয়েছে। তারও খোঁজ মিলছে না।"

বাদল উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, "কই, আমি তো জানিনে। কী? কী হারিয়েছে?"

"উজ্জয়িনী বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে।"

বাদল নিরুদ্বেগ হলো। বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে তো কী হয়েছে! তার কি স্বাধীনতা নেই!

"বলে যায়নি কোথায় গেল। চিঠি লিখে রেখে যায়নি। মার কাছে যায়নি। বোনদের কাছেও না। কাজেই ভারি ভাবনার কথা।"

"হুঁ।" বাদল অন্যমনস্ক ভাবে বলল।

"তুই যাবি তাকে উদ্ধার করতে?"

বাদল সদ্যোত্থিতের মতো বলল, "আমি! উদ্ধার! কোথায়!"

"ভারতবর্ষে।"

"কী যে বল!" বাদল বিরক্ত হয়ে বলল। সে যে কখনো ভারতবর্ষে ফিরতে পারে এ তার অভাবনীয়। সুধীদারও জানা উচিত বাদল যা সাব্যস্ত করেছে তার উপর আপীল চলে না।

"তবে কে যাবে?"

"আমি কী করে বলব?"

"তোর বউ হারিয়ে গেছে। তোর কর্তব্য নেই?"

বাদল উত্তেজিত ভাবে বলল, "আমার বউ কাকে বল? আমি স্বেচ্ছায় বিয়ে করিনি। একজন মানুষের আর এক জন মানুষের সঙ্গে আলাপপরিচয় করতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময় আমাকে দেওয়া হয়নি। ওঁর চেয়ে তোমার মাদামকে আমি ভালো চিনি।"

সুধী মর্মাহত হলো। তখনকার মতো ও বিষয় বন্ধ রইল।

পরদিন সুধী বাদলকে জানাল তার অভিপ্রায়। বাদল হৃষ্ট হয়ে বলল, "এই তো কেমন চমৎকার সমাধান! কাল আমাকে তুমি পাগল করে তুলেছিলে। ভাবলুম উজ্জয়িনীর জন্যে আমাকে তোমরা দায়ী

করছ। কী একটা প্রাগৈতিহাসিক প্রথা। দায়ে ঠেকে তার ভিতর দিয়ে গেছি। এক রাত্রের মামলা। তার দরুন দায়িত্ব নিতে হবে আর এক জন স্বাধীন ব্যক্তির! তাও যাবজ্জীবন দায়িত্ব। যে লোকটা ফাঁসি কাঠে ঝোলে সেও সারা জীবন ঝোলে না। হাঃ!"

বাদলের এসব উদ্ভট মত সুধীর পরিচিত ছিল। এত বড় দুর্যোগেও অনুৎপাটিত রইল, বিচলিত হল না, এমনি বদ্ধমূল এই সব মত। তর্ক না করে সুধী বলল, "চল, তোকে মেলবোর্ণ-হোয়াইটদের বাড়ী নিয়ে যাই।"

বাদল জানতে চাইল তাঁরা কে। সুধী বলল, "ভাই গ্রীক সাহিত্যের অধ্যাপক, বোন সমাজসেবিকা। আলাপ করে আনন্দ পাবি, কিন্তু তর্ক করিসনে।

দুই বন্ধু বেসওয়াটার চলল। যাবার আগে ফোন করে খবর নিল ভাই-বোন দুজনেই বাড়ী আছেন। বাদলকে পেলে উৎফুল্ল হবেন।

পথে যেতে যেতে বাদল কেবল বলতে থাকল, "দেখ, দেখ, ঠিক তেমনি আছে। কিছু বদলায় নি। খুব আশ্চর্য। না?"

সুধী হাসে। "হাঁ। ঠিক তেমনি আছে বাদল। কিছু বদলায় নি।"

মিস মেলবোর্ণ-হোয়াইট বাদলের হাতে হ্যায়সা ঝাঁকানি দিলেন যে তার কবজি মট মট করল। "তোমাকে যদি বাদল বলে ডাকি তোমার আপত্তি আছে, মিস্টার সেন?"

বাদল আপ্যায়িত হল। বার্ট বলে ডাকলে বোধ হয় উল্লসিত হত।

খুচরা কথাবার্তার পর সুধী বলল, "বাদল যেতে পারছে না, আমারই যাওয়া স্থির।"

"কবে যাচ্ছ?"

"সম্ভব হলে কালই।"

"হাঁ। সেই ভালো। আর দেরি করা চলে না।"

"তা হলে বাদলকে একটু দেখবেন, আণ্ট।"

বাদল ভাবল, কেন, আমি কি নাবালক নাকি? আণ্ট বললেন, "বাদল যদি আমাকে পর না ভাবে।" তখন বাদল আর একবার আপ্যায়িত হল। বলল, "না, না, আপনি আমারও আণ্ট।"

ডক্টরের সঙ্গে পরিচয় হতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কিসের ব্যাপারী?"

বাদল ধরতে পারল না। সুধী তার হয়ে উত্তর দিল, "মানববিবর্তনের।"

তিনি দুই কাঁধ উঠিয়ে বললেন, "লীগ অফ নেশন্‌স্‌। ডিসার্মামেণ্ট। গিলবার্ট মারে।"

বাদল ভেবাচাকা খেয়ে সুধীর দিকে তাকাল। সুধী তাকে রক্ষা করল। বলল, "আমার বন্ধু শান্তিবাদী নন। জীবনসংগ্রামে আস্থাবান। আরামের প্রতি তাঁর বিরাগ।"

ডক্টর মেলবোর্ণ-হোয়াইট প্রসন্ন হলেন। কথাবার্তায় বাদলেরও ঠাহর হল যে তিনি নিষ্ঠাবান গ্রীক। জীবনটা তাঁর কাছে ভীষণ, গম্ভীর, নিয়তিনির্ভর, দুর্জ্ঞেয় রহস্য। লীগ অফ নেশন্‌স্‌ প্রভৃতি তার মহিমা খর্ব করে। বিবর্তনও সাবলাইম নয়। আবর্তন বা বিপ্লব তো রিডিকুলাস। ট্রাজেডীর পাত্রপাত্রী হওয়াই মনুষ্যত্ব, মানবের পরম ভাগ্য। বাদল অবগত হল তিনি বিশুদ্ধ ফেটালিস্ট্‌।

যাত্রার দিন সুধী কোনোমতে মার্সেলকে বুঝ করিয়ে নিজের জায়গায় বাদলকে বদলি দিয়ে বাসার লোকের কাছে সাময়িক বিদায় নিয়ে ভিক্টোরিয়া স্টেশনে চলল। বাদল চলল তাকে তুলে

দিতে। কথা ছিল বিভূতি যথাসময়ে সেইখানে যোগ দেবে।

প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করছিল অশোকা। সুধীর সঙ্গে বাদলকে লক্ষ্য করে তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। মনের হাসি তো মিলিয়ে গেছলই সুধী সত্যি এত শীগ্‌গির যাচ্ছে শুনে। সুধী তার দিকে এগিয়ে গিয়ে তাকে নমস্কার করল। সে আড়চোখে চেয়ে দেখল বাদল আপন মনে সামনে চলেছে। সুধীর প্রতি কটাক্ষ পাত করে বলল, "সত্যি যাচ্ছেন আজ?"

"পুনর্দর্শনায় চ।" সুধী করুণ হেসে বলল। "আমি যদি না ফিরি আপনি তো ফিরবেন। দেখা একদিন হবেই।"

সময় বেশি ছিল না। বাদল সুধীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। অশোকা গুণছিল ঘড়ির কাঁটার উল্লম্ফন। সুধী ভাবছিল বাদলের কথা। হঠাৎ তার চোখে পড়ল গেটে বিভূতিকে নিয়ে গোলমাল বেধেছে। যাক, বিভূতিকে ঢুকতে দিল। বিভূতির পরনে প্লাস্‌ফোর্স, মাথায় ক্যাপ। তার এক হাতের বগলে এক রাশ বই, অন্য হাতে বুলডগের শিকল। এক গাল হেসে বিভূতি বলল, "এই যে, সুধীদা। গুড মর্নিং, মিস টালুকডার।" সুধী বাদলের সঙ্গে বিভূতির পরিচয় করিয়ে দিল।

অশোকা জিজ্ঞাসা করল, "এ কে, মিস্টার নাগ?"

বিভূতি বলল, "এর নাম ড্রামণ্ড্। বুলডগ ড্রামণ্ড্। ড্রামণ্ড, ড্রামণ্ড, ড্রামি।" এই বলে বিভূতি তাকে তার নাম ধরে ডাকতে লাগল। বোঝা গেল নামটা নূতন দেওয়া। সাড়া পাওয়া গেল না। বিভূতি তখন তার প্রশংসা করে বলল, "যে সে কুকুর নয়। খাঁটি বুলডগের বাচ্চা। তুমি যত বড় চোর ডাকাত খুনী হও তোমাকে এ জন্তু

পাকড়াবেই।” বাদল তা শুনে চার পা পেছিয়ে গেল। চোর ডাকাত খুনী বলে নয়, বুলডগের গুণপনায় বিশ্বাস করে। চেহারাই বিশ্বাস করিয়ে দেয়।

বিভূতি ওটাকে ব্রেকে দেওয়ায় অশোকা শুধাল, “আপনিও কি যাচ্ছেন?”

বিভূতি বলল, “আজ্ঞে হাঁ। প্রোফেসনাল কল। না গিয়ে পারি! দেখছেন না এসব এডগার ওয়ালেসের বই। এতে অনেক সঙ্কেত আছে আমাদের ডিটেকটিভ বিদ্যার। আর ঐ কুকুরই আমার মূলধন। স্কটলণ্ড ইয়ার্ডের একজনের কাছ থেকে সস্তায় বাগিয়েছি।”

বিভূতি ওটিকে কিনেছিল লণ্ডনের চোর বাজারে, এক চোরের কাছ থেকে।

অশোকা তাজ্জব বনল। বিভূতি যে প্রোফেসনাল ডিটেকটিভ তা কে জানত! না জানি কত গুপ্ত তথ্য তার খাতায় টোকা আছে। তাদের বাড়ীতে যে সে যেত তা কি এই উদ্দেশ্যে?

গাড়ী ছাড়তে যাচ্ছে এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে আণ্ট এলেনর এসে পড়লেন। “গুড বাঈ, সুধী। আশা করি তোমার কার্যসিদ্ধি হবে।

সুধী উপস্থিতদের কাছে বিদায় নিয়ে উঠে বসল। বিভূতিও। অশোকা সুধীর মুখের উপর সতৃষ্ণ দৃষ্টি রক্ষা করে উদ্‌গত অশ্রুর নিকট হার মানল। দৃষ্টি নামাল, একফোঁটা জল অন্যের অলক্ষ্যে ঝরল। সে প্রত্যাশা করেছিল সুধীকে একা পাবে, কত কথা বলবে। কিছুই বলা হল না। সঙ্গে করে এনেছিল একটি সুন্দর ফাউণ্টেন পেন। মনের খুশিকে উপহার দিয়ে বলবে এই কলমের লেখা চাই সপ্তাহে সপ্তাহে। এত লোকের সাক্ষাতে সে অক্ষম।

গাড়ী ছেড়ে দিল। যারা গেল ও যারা রইল তারা অনেকক্ষণ ধরে রুমাল নাড়তে থাকল। তারপর পরস্পরের অদৃশ্য হলে মলিন মুখ ফিরিয়ে নিল। বাদলের দিকে ফিরে আণ্ট এলেনর বললেন, "এস, বাদল।" অশোকার দিকে ফিরে বাদল বলল, "আসি মিস তালুকদার।"

অশোকা স্টেশনে বসে রইল। সুধীর ট্রেন যে মুহূর্তে ডোভারে পৌঁছবে সেই মুহূর্তে ফোন করল, "এই ট্রেনে দুজন ভারতীয় ভদ্রলোক নামবেন। যাঁর পরনে ভারতীয় পোষাক তাঁর নাম মিস্টার চক্রবর্তী। তাঁকে দয়া করে ফোনে আসতে বলুন।"

সুধীর গলার স্বর শুনে অশোকা অধীর হয়ে বলল, "মনের খুশি, একটি কলম এনেছিলুম, দিতে পারলুম না। তবু যেন প্রত্যেক সপ্তাহে চিঠি লেখেন।"

"কী দিয়ে লিখব? কলম যে পেলাম না!"

"যা খুশি তা দিয়ে লিখবেন। আমার হাতে আপনার হাতের স্পর্শ যেন পাই।"

"আচ্ছা!"

"আর কী বলব? যেখানেই থাকুন, মনে রাখবেন।"

"নিশ্চয়।"

"আর আটকাব না, আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

"কল্যাণী ভব।"

# ইতিমধ্যে

## ১

সেই দিন বিশ্বনাথের আরতি দর্শন করতে গিয়ে একদল বাঙালী যাত্রীর সঙ্গে উজ্জয়িনীর আলাপ হয়ে গেল। তিন জন পুরুষ, তেরো জন নারী। তারা প্রয়াগ বিন্ধ্যাচল ইত্যাদি হয়ে বৃন্দাবন যাবে। উজ্জয়িনী বলল, "আমাকে আপনাদের সঙ্গে নিয়ে চলুন না। আমার আপনার বলতে কেউ নেই, ভগবান ব্যতীত।"

গৃহিণী আমতা-আমতা করছিলেন। তাঁর বিধবা মেয়েটি উজ্জয়িনীর সমবয়সিনী। সে বলল, "আমাদের আর অসুবিধা কী? ষোলর জায়গায় সতেরো।"

কর্তা এ কথা শুনে তাঁর ঘন গোঁফের ফাঁক দিয়ে বাঘা হাসি হেসে বললেন, "অসুবিধা যে কার তা তুই কী করে বুঝবি। ভায়া হে," তিনি তাঁর শ্যালককে সম্বোধন করে বললেন, "শুনছ তো বিন্নুর কথা।"

শ্যালক অবজ্ঞার স্বরে বললেন, "হুঁ্যাঃ। মেয়েমানুষ। তাদের একটা কথা।" এঁর রক্ষিতা সৌদামিনী দাসী এই দলের একজন। সে শুনতে পেয়ে ফিক করে হাসল। অন্যান্যদের মধ্যে এই নিয়ে কলরব চলল। তারা কেউ গৃহিণীর আত্মীয়া, কেউ আশ্রিতা, কেউ প্রতিবেশিনী, কেউ গ্রাম সম্পর্কে মাসীপিসী। তাদের বয়সও রকমারি। ষোল থেকে ষাট। তাদের দাবির অন্ত নেই। কেউ কাশীতে চুল ফেলবে। কেউ বিন্ধ্যবাসিনীর কাছে মানৎ করেছে।

কেউ খুব রাবড়ি খেতে চায়, কেননা এ জন্মের মতো রাবড়ি ছাড়তে হবে। কেউ জর্দা কিনতে চায়, কেননা কাশীতে নাকি ও জিনিস সস্তা। কেউ দেখল বড় বড় পেয়ারা বিক্রী হচ্ছে। অমনি তার মনে হল দেশে এ জাতের পেয়ারা পাওয়া যায় না। যদিও অনেক ঘুরে দেশে ফেরার দেরি আছে তবু দেশের জন্যে এক ঝুড়ি পেয়ারা কিনে ফেলল। পেয়ারা যখন পচতে শুরু করল তখন কী আর করে, নিজেই তার সদ্ব্যবহার করল। দিল সহযাত্রীদের দুটো-একটা।

বিধবা মেয়েটির কথা তার মা ঠেলতে পারেন না। উজ্জয়িনীকে বললেন, "তবে তাই হোক, বাছা। তীর্থ করতে বেরিয়েছি, সুবিধা অসুবিধা ভাবলে চলবে কেন ?"

সুশীলাবতীকে উজ্জয়িনী জানাল একদল যাত্রীর সঙ্গে তার যাওয়া স্থির হয়েছে, তাদের ধর্মশালায় সে উঠে যেতে চায়। তিনি চুপ করে কী চিন্তা করলেন। বললেন, "সেই বেশ।" তারপর উজ্জয়িনীকে এনে দিলেন একটি থলি, তাতে ছিল আড়াই শ টাকা। "তোমার সেই হীরা বিক্রীর টাকা। আমার পাওনা আমি কেটে রেখেছি, এর সবটা তোমার।"

উজ্জয়িনী দুঃখিত হয়ে বলল, "আংটিটা বেচে ফেললেন, দিদি ?"

তিনি মৃদু হেসে বললেন, "তোমার হয়ে বেচেছি, আমার হয়ে কিনেছি।"

বিদায় নেবার ক্ষণে উজ্জয়িনী আর্দ্র স্বরে বলল, "খুব জ্বালাতন করে গেলুম। ভুলে যাবেন আমাকে।"

"তুমি কিন্তু আমার ঠিকানাটা ভুলো না। মুশকিলে পড়লে খবর দিও।" সুশীলাবতী আবেগ ধারণ করে বললেন।

বিন্থু জিজ্ঞাসা করল, "আপনার নাম কী, ভাই ?"

উজ্জয়িনী উত্তর দিল, "অনামিকা।"

"তা হলে আসুন এক কাজ করি। আমি আপনাকে ডাকি, অনু। আর আপনি আমাকে ডাকুন, বিন্থু।"

দুজনের ভাব হতে দু মিনিট লাগল না। "আপনি" অতিক্রম করে ওরা "তুমি"তে পৌছাল। বিন্থু বলল, "অনু ভাই, তুমি কী করে কাশীতে এলে ?" উজ্জয়িনী বলল, "বিন্থু ভাই, সে অনেক কথা। আর এক দিন বলব।"

থার্ড ক্লাসে বেহারা ও বাবুর্চিরা চড়ে এই ছিল উজ্জয়িনীর জ্ঞান। তাদের কোলে বসে সে ছোটবেলায় থার্ড ক্লাসে চড়েছে—মনে পড়ে। এরা থার্ড ক্লাসে হৈ হৈ করে উঠল। উজ্জয়িনী করে কী। বিন্থুর খাতিরে বিন্থুদের কামরায় উঠে বসল।

এ এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। সরু সরু কাঠের বেঞ্চিতে মানুষ ঠেসাঠেসি করে বসেছে। বাঙ্কের উপরেও মানুষ। কোথাও নয়। কেউ কাশছে, কেউ হাসছে, কেউ পানের পিচ ফেলছে। মেজে এত ময়লা যে তার উপর পা ফেলতে ঘেন্না করে। বিশ্রী দুর্গন্ধ আসছে একটি বিশেষ স্থান থেকে।

"তীর্থ করতে বেরিয়েছি। সুবিধা অসুবিধার কথা ভাবলে চলবে কেন ?" উজ্জয়িনী এই বলে মনকে স্তোক দিল। চেষ্টা করল এরই ভিতর আনন্দ আবিষ্কার করতে। আমরা সবাই মিলে চলেছি। আমরা পরস্পরের সহযাত্রী। বিন্থু, আমি, বিন্থুর মা, বিন্থুর দিদিমা, দিদি, মাসিমা, বিন্থুর মামাত বোন ননী, বিন্থুর মামার রাঁধুনী পরিবার—তার মানে কী ? উজ্জয়িনী বুঝতে পারে না—বিন্থুদের ঝি মঙ্কবালা, মঙ্কবালার বোন মোক্ষদা, বিন্থুদের বামুন

ঠাকরুন, ঠাকরুনের সই, বিনুদের গ্রামের তেলী বুড়ী, গয়লা বুড়ী, গয়লা বুড়ীর মেয়ে। এছাড়া বাইরের লোক। আমরা সবাই চলেছি। আমরা যাত্রী। যাত্রার উল্লাস আমাদের মাতিয়ে রেখেছে। কোন স্টেশন রে এটা। ঐ দেখ কত লোক নামছে, কত লোক উঠছে। কত রকম বুলি।

এমনি করে উজ্জয়িনী পথের অস্বাচ্ছন্দ্য উপেক্ষা করল। পথের মাঝে মাঝে যেখানে বিশ্রাম, যেখানে তীর্থ, সেখানে যা বোধ করল তা অস্বাচ্ছন্দ্যের অধিক। তা প্রাইভেসীর অভাব। তাকে উপেক্ষা করা তার সাধ্যাতীত। হয় তাকে স্বীকার করতে হবে, নয় তার প্রতিকার করতে হবে। সতরঞ্চির উপর চাদর পেতে একটা ঢালা বিছানার উপর যে যেখানে পারে গড়িয়ে পড়ে। একটি ঘরে চোদ্দটি মানুষ। ঘুমের ঘোরে একজনের পা আর এক জনের গায়ে ওঠে, একজনের মাথা আর একজনের কোলে। কে কোথায় ছিটকে পড়ে, ভোরবেলা দেখা যায় আকাশের সপ্তর্ষি মণ্ডলের মতো বিপরীত সংস্থিতি। যারা ছিল সমান্তরাল, তারা জ্যামিতির ত্রিভুজ চতুর্ভুজ বৃত্ত অর্ধবৃত্ত অঙ্কন করেছে। শুধু তাই করলে রক্ষা ছিল। কিন্তু অধিকাংশই স্খলিতবসন স্রস্তকেশ। উজ্জয়িনী যখন ঘুমতে যায় তখন তার এক পাশে ছিল বিনু অন্য পাশে ননী। ঘুম থেকে উঠে দেখে বিনু তার পায়ের নীচে কালীর পায়ের নীচের শিবের মতো পড়ে রয়েছে আর ননী একেবারে তল্লাট ছেড়ে পালিয়েছে, তার জায়গায় সৌদামিনী, সৌদামিনীর মাথা উজ্জয়িনীর কাঁধে।

উজ্জয়িনী লক্ষ্য করল এরা প্রাইভেসী বলতে এই পর্যন্ত বোঝে, মেয়েরা পুরুষদের থেকে আলাদা থাকবে। মেয়েদের মধ্যে

পরস্পর পরস্পরের থেকে আলাদা থাকলে ভালো হয় এরা কল্পনাও করতে পারে না। জাতের বিচার থেকে, স্পৃশ্যাস্পৃশ্যভেদ থেকে, যেটুকু প্রাইভেসী আসে সেটুকুও এরা তীর্থক্ষেত্রে মানে না। তিন-চার জন মিলে এক থালায় খেতে বসে। উজ্জয়িনীর বমনোদ্রেক হয়। কিন্তু উপায় কী। তীর্থ করতে বেরিয়ে সুবিধা অসুবিধার কথা ভাবলে চলবে কেন। অগত্যা উজ্জয়িনী দলের ভিতর দল পাকায়। বিনু, ননী ও সে অন্যান্যদের থেকে যথাসম্ভব পৃথক থাকে। তিনজনের একত্র স্নান একত্র আহার একত্র বিহার। রাত্রে উজ্জয়িনী একেবারে এক টেরে শোয়, তার এক ধারে দেয়াল অন্য ধারে বিনু ও ননী। ডবল পাহারা। ব্যূহ ভেদ করে অসমবয়সিনীরা তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

তবে বিনু ও ননীর মাঝখানে রেষারেষি, কে উজ্জয়িনীর পাশে শোবে। শোবার সময় কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। বাহুবলের মীমাংসায় ননী সন্তুষ্ট হয় না। কাঁদে, অভিমান করে। মা-মরা মেয়ে। এই দলের একমাত্র কুমারী। কেউ তার ব্যথার ব্যথী নেই। উজ্জয়িনী তার প্রতি পক্ষপাত করলে বিনু রাগ করবে, আর এটা বিনুর মায়ের দল।

একায় চড়ে উজ্জয়িনী আতঙ্কে ও আনন্দে রোমাঞ্চবোধ করল। এক মুহূর্তকাল অসতর্ক হলে মক্কাপ্রাপ্তি অবধারিত। তিন বন্ধুতে খিল খিল করে হাসে। তাদের সঙ্গে চড়ে গয়লা বুড়ীর মেয়ে এলোকেশী। সে বেচারির প্রাণ নিয়ে অসামাল অবস্থা। ভাবে সেই বুঝি হাসির পাত্র। ভারি রাগ করে।

গাছতলায় যেদিন তারা আঁচল পেতে বসে প্রসাদ সেবা করে সেদিন উজ্জয়িনীর কী উল্লাস। তার ইচ্ছা করে শুয়ে পড়তে। কত

লোক গাছতলায় জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে, সার্থক তাদের জীবন। শিশিরকে তারা ভয় করে না, সাপকে ডরায় না। তাদের মাথার উপর আকাশ নুয়ে পড়ে, বাতাস তাদের নিশ্বাসে নিশ্বাস মিশিয়ে দেয়, ঘাস বয়ে আনে ভূগর্ভের বিদ্যুৎ। মা গো, কেমন করে মানুষ চায় দেয়াল দিয়ে আপনাকে ঘিরে ছাদ দিয়ে আপনাকে ঢাকা দেয়। কেন যে মানুষ সংকীর্ণ গণ্ডী ভালোবাসে!

নদীতে সকলের সঙ্গে ও সামনে স্নান করতে উজ্জয়িনীর সংস্কারে বেধেছিল। কিন্তু চিরকাল তার এর প্রতি ছিল লোভ। নদী দেখলে তার ঝাঁপ দিতে সাধ যেত, যা থাক কপালে—ভাসা কি ডোবা। প্রয়াগে স্নানার্থীর সংখ্যা হয় না, তাদের ভিড়ে আপনাকে হারিয়ে দিয়ে উজ্জয়িনী জলের কোলে সারা দেহ সঁপে দিল। তুলনা নেই সে উন্মাদনার। যেন একাধারে জননীর স্নেহ, প্রেমিকের আলিঙ্গন। জল থেকে উঠতে কি সে চায়। ওরা ডাক দিয়ে তাগিদ করে। তাই উঠতে হয়। নিজকে ভিজে কাপড়ে সকলের দৃষ্টিতে দেখতে তার কী বেপথু। প্রাইভেসী নেই বলে এক্ষেত্রে তার ক্ষোভ নেই। গোপীরাও তো যমুনায় স্নান করত।

অবশেষে তারা এক দিন সত্যি সত্যি বৃন্দাবনে পৌঁছে গেল।

বৃন্দাবন। মর্ত্যের বৈকুণ্ঠ। মানবমানবীর রূপ ধরে দেবদেবীরা এখানে বিচরণ করছেন। স্বর্গের বৈকুণ্ঠে তো তাঁদের সকলের প্রবেশ নেই। উজ্জয়িনীর আশ্চর্য লাগছিল সে বৃন্দাবনে এসে গেছে সামান্য একখানা রেলটিকিটের জোরে।

বিদুরা তীর্থ করতে বেরিয়েছে, তাদের কাছে যেমন কাশী যেমন প্রয়াগ তেমনি বৃন্দাবন। তারা ব্রজবাসী পাণ্ডার সাহায্য নিয়ে দর্শন করে বেড়াল। অমন করে দর্শন করতে এত দিন উজ্জয়িনীর

উৎসাহের অন্ত ছিল না, এই বার সে কুণ্ঠিত হলো। সে তো দুদিনের জন্যে আসেনি। কানুর সঙ্গে তার চিরকালের সম্বন্ধ। বৃন্দাবন তার স্বধাম। বিদেশীর মতো বুড়ী ছুঁয়ে বেড়াবে কেন? তবু যেতে হল তাকে দলের সঙ্গে। বিনু ও ননী ছাড়বে কেন।

বন নয়। শহর। অন্যান্য শহরের মতো যথেচ্ছ গঠিত, এলোমেলো, শ্রীহীন। বানরের কিচিমিচি, ব্রজবাসীর খিচিমিচি, দোকানদারের হাঁকডাক, ফিরিওয়ালার উপরোধ, ভিখারীর অধ্যবসায় আর দলের লোকের সমস্ত ক্ষণ কে কী কিনবে তার ফর্দ। উজ্জয়িনীর প্রথমে মনে হল, তার স্বপ্ন ভেঙে গেছে। তারপর প্রত্যয় হল এইটেই স্বপ্ন। এই যে শীর্ণ মলিন স্রোতে কচ্ছপ কিলবিল করছে, এটা তার ভ্রম। প্রকৃত সত্য পাপীর দৃষ্টিগম্য নয়, তীর্থযাত্রীরা পাপী বলে তাদের পরীক্ষার জন্যে এই ধাঁধাঁ।

২

বিনুদের যাওয়ার সময় হল, পুষ্কর যাবে। উজ্জয়িনী বলল, "আমি আর কোথাও যাব না, ভাই। এইখানে থেকে যাব।"

এই কয় দিনে উজ্জয়িনী দলের অঙ্গীভূত হয়েছিল, তাকে বাদ দেওয়ার কথা কেউ ভাবতে পারে না। তেলী বুড়ী গয়লা বুড়ীও প্রতিবাদ করল। বঙ্কুবাবুর বাঘা গোঁফ তাঁর বিমর্ষ বদনকে হাস্যকর আকার দিল। বিনুর মা বললেন, "ছেলেমানুষ, একা থাকতে পারবে কেন?"

"একা," উজ্জয়িনী হেসে বলল, "একা থাকতে হবে কেন? যেমন

আপনাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল, তেমনি আর কারুর সঙ্গে হওয়া বিচিত্র নয়। চারি দিকে এত মানুষ থাকতে একা?"

ননী ফিস ফিস করে তার কানে কানে বলল, "অনুদি, আমাকে রাখতে চাও তো আমি থাকি, বলে দেখ না বাবাকে।"

"যাঃ!" উজ্জয়িনী তেমনি ফিস ফিস করে বলল, "ওদিকে তোর জন্যে কে না জানি তপস্যা করছে। বিয়ের ফুল ফুটল বলে।"

দলের সব মেয়েকে উজ্জয়িনী এক একটা উপহার কিনে দিল। বলল, "আমাকে যেন কেউ মনে রাখে না।"

কেউ কেউ চোখের জল মুছল। বিনু গম্ভীর ভাবে বলল, "এই জন্যে আমি জীবজন্তু পুষিনে। হারিয়ে যায়, পালিয়ে যায়, মরে যায়। মনটা কেমন করতে থাকে।"

উজ্জয়িনী পরিহাস করল। "এই জন্তুটি হারিয়েও যাচ্ছে না, পালিয়েও যাচ্ছে না, মরতেও রাজী নয়। বছর দুই পরে এসে দেখো বিনু, এইখানেই আছে।"

বিনুদের ব্রজবাসীকে উজ্জয়িনী বলল, "আমার একটা ব্যবস্থা করে দিতে পার?"

সে বলল, "তা কেন পারব না?"

এক বাঙালী গৃহস্থ পরিবারে উজ্জয়িনী আশ্রয় পেল। একখানা ঘর নিয়ে থাকবে, তিন টাকা ভাড়া দেবে। প্রসাদ আনিয়ে নেবে নিজের খরচে। এঁরা বহুকাল ব্রজে বাস করছেন। কর্তা, গৃহিণী, বিধবা কন্যা সুরধুনী। তাঁর বয়স ত্রিশের কোটায়। আরো দুটি একটি পোষ্য। উজ্জয়িনীরই মতো ঘর নিয়ে আছে এঁদের দেশের জন দুই বিধবা। শশীবালা ও বিবসনা। এরাও মধ্যবয়সিনী।

উদ্ধারণ ঠাকুরের মতো গোলগাল চেহারা। মুণ্ডিত মস্তক। গুম্ফ

শ্মশ্রু উদ্‌গত হয়নি কোনোদিন। ললাটে ও নাসায় তিলক। হাতে মায়াঝুলি। নাম জপ করতে করতে যাবতীয় কাজ করেন, মালা গড়ালেই জপ করা হয়। ইনিই উজ্জয়িনীর বাড়ীর মালিক বনমালী গোস্বামী। ইনি গোস্বামী বলে এঁর স্ত্রীটি যে গোরু একথা বললে নারীর অবমাননা হয়। অগত্যা বলা যেতে পারে, যিনি স্বামী তিনিই গো। এ সমাস ব্যাকরণসিদ্ধ। বনমালীবাবুর স্ত্রী যামিনী দেবীর কিন্তু এতে দেখতে গেলে লাভ নেই। স্বামী যাঁর গো তিনি গোহালে থাকেন, গো—হালে। কিন্তু গোস্বামী পরিবারকে নিয়ে পরিহাস করে কী হবে। আমরা পৃথিবীর স্বামীস্ত্রীরা পরস্পরকে আদর করে ডাকি, "ওগো।" অর্থাৎ ও গো।

যামিনী দেবী সর্বাঙ্গে ভক্তির টিকা নেননি, তিনি স্বভাবস্বচ্ছ সাধারণ মানুষ। উজ্জয়িনীকে অভ্যর্থনা করে বললেন, "এস, মা। এস। মনে কর এ তোমারি বাড়ী, তোমারি সংসার।"

সুরধুনীর চোখে চশমা। তিনি বিস্তর পড়াশুনা করেন, পড়েন ও শোনান। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, নারদপঞ্চরাত্র, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। রুগ্ণ গম্ভীর কঠোর তাঁর আকৃতি। উজ্জয়িনীর সাহস হয় না তাঁকে বলতে, আমিও পড়াশুনা করেছি, করতে ভালবাসি। আত্মপরিচয় দিতে তার সঙ্কোচ বোধ হয়। লোকে তাকে মূর্খ ভাবুক, অবোধ ভাবুক, তার মাথাব্যথা নেই। সে লজ্জিত নয়—অশিক্ষার অগৌরব বহন করতে, অশিক্ষিতদের সঙ্গে মিশতে।

উজ্জয়িনী শশীবালা ও বিবসনার সঙ্গে মিত্রতা করল। তারা একটি কুঞ্জে নাম সংকীর্তন করতে যায়, তাদেরি মতো নিরাশ্রয়াদের সঙ্গে মিলে একই কথা এক লক্ষ বার আওড়ায়, "হরি হরি হরি বোল। হরিবোল। হরিবোল।" বাঁশের কঞ্চির মতো ছুলে

দুই হাতে করতাল বাজিয়ে তুলসী পরিক্রমা করতে করতে এক লক্ষ বার হরিনাম করলে পর কুঞ্জের কর্তৃপক্ষ প্রত্যেককে একখানি করে মালপোয়া দেন।

উজ্জয়িনীকে ওরা মালপোয়ার লোভ দেখিয়ে বলল, "এস গো, কী তোমার নাম অন্নদা, না, অনুরাধা।"

"শুধু অনু বলেই ডাকলে চলবে।" উজ্জয়িনী বলল।

"এস গো অনুবালা, নাম করলে পুণ্য হবে, ইহজন্মে তরে যাবে। এ বেলা কুঞ্জে চল, ও বেলা গোবিনজীর আরতি দেখিয়ে আনব।"

উজ্জয়িনী গেল তাদের সঙ্গে। পুণ্য নাই হোক, মালপোয়া না জুটুক, প্রিয়নাম মুখে নেবার যে আনন্দ সেই তো নামক্রিয়ার পুরস্কার। আর মুক্তির বাসনা যে তার ছিল না তা নয়। মালপোয়ার সাধও সে হেসে উড়িয়ে দিতে পারছিল না। তার লজ্জা লাগছিল এই ভেবে যে, এখনো তার পার্থিব ভোগস্পৃহা রয়েছে।

বাপ রে। এক লক্ষ হরি নাম কি কথার কথা। "হরি হরি হরি বোল। হরি বোল। হরিবোল।" এতে পাঁচটি হরি শব্দ আছে। বিশ হাজার বার এই ধুয়ার আবৃত্তি করতে কমসে কম সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা লাগে। ততক্ষণে ক্লান্তিতে সকলে গতাসু। ঘটি ঘটি জল খেয়ে তারা প্রাণ ফিরে পায়। তারপর আসে মালপোয়া। আঃ। কী পুলক। এতক্ষণ ভাবছিল, জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো কেমনে পাইব সই তারে। এই বার তাকে পেয়ে বিহ্বল হলো।

উজ্জয়িনীও।

সকলের সঙ্গে আপনাকে অভিন্ন করবার অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারিণী সে। যতদিন তীর্থযাত্রীর দলে ছিল ততদিন তীর্থযাত্রীর

মতো বোধ করেছিল, কাটিয়ে উঠেছিল প্রাইভেসীর সংস্কার। শশীবালা প্রভৃতির সঙ্গে তাদেরি একজন বলে বোধ করতে তার বাধল না। এরা সরল অবোধ গ্রাম্য মেয়ে, বড় সহজে খুশি হয়। মালপোয়া না হলেও এদের চলত, কিন্তু যদি অদৃষ্টে জোটে তবে মন্দ কী। কঠিন পরিশ্রমের পর চেখে চেখে খায়, এক কামড়ে শেষ করে ফেলতে চায় না। সকলে মিলে হাসে, খোশগল্প করে। উজ্জয়িনীর ভাল লাগে শুনতে। ভালো লাগে প্রখর ক্ষুধার সঙ্গে খেলা করতে, দাঁত দিয়ে এক এক টুকরা মালপোয়া ছিঁড়তে।

গোবিনজীর আরতি দেখতে যেসব মেয়ে দল বেঁধে যায় উজ্জয়িনী তাদের দলভুক্ত। তাদেরি মতো তার সরল কৌতূহল, সহজ উপভোগ। সেও নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে দেখে বিগ্রহের সাজসজ্জার রাজসমারোহ। আরতির আনুষঙ্গিক বাদ্যকোলাহল তার দেহ-তন্ত্রীতে ঘা দিয়ে কী যে ঝঙ্কার তোলে, তার সাধ যায় সে এই মসৃণ মেজের উপর দুই বাহুর পাল মেলে দিয়ে ভেসে যাবে ভেসে আসবে। রাজহংসীর মতো। তার অর্ঘ্য তার দেবতাকে দিলে সে মুক্ত হবে। সকলের মুক্তি কি ভজনে পূজনে? না। কারুর কারুর মুক্তি কীর্তনগানে মন্দিরনৃত্যে। যার যা স্বভাবজ তাই তার নৈবেদ্য।

"কানু," উজ্জয়িনী মনে মনে বলে, "গ্রহণযোগ্য হবার স্পর্ধা রাখিনে, কিন্তু দানপরায়ণ না হলে মুক্তি কই? আমার গান যদি তোমাকে তৃপ্তি দেয়, আমার নৃত্য যদি তোমাকে মুগ্ধ করে, তবে তো আমার পরম ভাগ্য, কিন্তু সানুরাগ স্বরবিস্তারে ও পদক্ষেপণে যে স্ফূর্তি সেই আমার দানলীলা।"

"কানু," সে আরো বলল, "এক লক্ষ বার তোমার নাম করলে

তুমি খুশি হও, তা মানি। কেউ যদি আমার নাম করে আমি কি খুশি হইনে? কিন্তু যে পরের নাম করে তার নিজের বৈশিষ্ট্য কোথায় রইল? আমি চাই তার বিশিষ্ট নিবেদন। তেমনি তুমিও নিশ্চয় প্রত্যাশা করেছ আমার বিশিষ্ট উৎসর্গ। আমি কীর্তন গাইতে পারি, কানু। সুশীলাদির ওখানে আবিষ্কার করলুম যে আমি পারি। এতদিন তুমি অদৃশ্য থেকে শুনেছ। এখন তো দৃশ্যমান হলে. এখন তুমি শুনবে আর আমি দেখব। কেমন?"

কিন্তু কে কী মনে করবে। এ লজ্জা তার ঘুচল না। তাই আরতির সমাপন হলে সে মুখ ফুটে বলতে পারল না যে সে একটা কীর্তন গাইতে চায়, কারুর কোনো আপত্তি আছে?

সাধনার শেষ কথা লজ্জা বিসর্জন। উজ্জয়িনী শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারল না, তার অন্তর ভরে গেল গ্লানিতে। কত দুর্বল সে। সকলের সঙ্গে ধেই ধেই করে হরিনাম করতে মালপোয়া খেতে তার লজ্জা নেই, অথচ একাকিনী একঠাঁই বসে গোবিনজীকে তার স্বরমাধুরী সমর্পণ করতে তার লজ্জা।

পরদিন সে নাম করতে গেল না। ঘরে থাকল। গুন গুন করে স্বরচিত কীর্তন গানের মহলা দিল। তার আশঙ্কা ছিল, হয়তো বিনুদের সঙ্গে তীর্থভ্রমণ ব্যবধানে তার কীর্তন ক্ষমতা অব্যবহৃত থেকে অব্যবহার্য হয়েছে। তা নয়। ডাক দিতেই সুর অমনি উড়ে এল। উজ্জয়িনী বিস্মিত হয়ে উপলব্ধি করল, তার ক্ষমতা কয়েকদিন পতিত থেকে উর্বরা হয়েছে। আয়াস নিষ্প্রয়োজন। আকাঙ্ক্ষা আপনি উদ্ভূত হয়। মহলা দিতে গিয়ে দেখে মহলাও সৃষ্টি। তাতে সৃষ্টির সব লক্ষণ আছে। আক্ষেপ এই যে, সেই সৃষ্টির কোনো দৃশ্যমান সাক্ষী রইল না।

সেদিন সন্ধ্যায় আরতির অন্তে উজ্জয়িনী একটি স্তম্ভে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ভঙ্গীতে সহসা গেয়ে উঠল, "লহ জীবন যৌবন লহ মাধুরী নিবেদন।" জনতা সচকিত হয়ে দিকে দিকে চাহনি ক্ষেপ করল, কোন্ দিক থেকে আসছে কার কণ্ঠের স্বর। ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তার নিকট সরে সরে এল, তার তিন দিক ঘিরল, এক দিক ছেড়ে দিল গোবিনজীর খাতিরে। উজ্জয়িনীর এক দৃষ্টি, এক মন, এক দশা। গোবিনজীতে তন্ময় হয়ে সে আবেগের রাশ আলগা করে চলেছে, ঘুড়ির মতো উড়তে উড়তে ঊর্ধ্বে উঠছে তার আবেগ। টান দিয়ে নামিয়ে আনবে সে ভরসা নেই। বৈকুণ্ঠের উদ্দেশে নিরুদ্দেশ হবার দাখিল।

একটি প্রণামের সহিত উজ্জয়িনী যখন শেষ করল তখনো রেশ ফিরছিল সকলের শ্রবণে।

"কে গো তুমি?" এক বর্ষীয়সী উজ্জয়িনীর কাছে এসে স্নেহভরে শুধালেন। "এমন সুন্দর গাইতে পার। আবার গাইবে তো?"

তাঁর দেখাদেখি আরো কয়েকজন মেয়ে এগিয়ে এসে আরো কয়েকটি প্রশ্ন করলেন ও প্রশ্নের সঙ্গে প্রশংসা জুড়ে দিলেন। উজ্জয়িনীর উত্তর দেবার শক্তি ছিল না। সে প্রত্যেককে একটি করে নমস্কার করল। শশীবালা বিবসনা প্রভৃতির দল সেদিন অন্য কোনো মন্দিরে আরতি দর্শন করতে গেছে। উজ্জয়িনীকে কেউ চিনত না, তাই তার পরিচয় এক অপরকে শোনাতে পারল না। সবাই বাধ্য হয়ে তারই মুখাপেক্ষী হল। সে নির্বাক।

একজন বললেন, "তোমার এত অল্প বয়স, তোমার এমন ক্ষমতা!"

দ্বিতীয় একজন বললেন, "কে তোমাকে এখানে আনল? কেমন করে এলে?"

"আহা! কার ঘর আলো করছিলে। কেন এলে?" তৃতীয় জনের উক্তি।

"ফিরে যাবে তো?" চতুর্থ জনের জিজ্ঞাসা।

উজ্জয়িনী উত্তর দিল না। নিষ্ক্রমণের পথ চাইল।

"সে কী? তুমি চললে? আর একটি গান করবে না?" বর্ষীয়সী হতাশ হলেন।

"কাল।" উজ্জয়িনী তাঁকে প্রবোধ দিল।

মুখে মুখে রটে গেল বৃন্দাবনে একটি তরুণবয়সী কীর্তনগায়িকা এসেছে, আরতি অবসানে গোবিনজীতে গান করেছে ও করবে। পর দিন সন্ধ্যায় লোকারণ্য। আরো নির্দিষ্ট করে বললে—স্ত্রীলোকারণ্য।

উজ্জয়িনী যতক্ষণ গান করল জনতা ততক্ষণ নিঃসাড়। গানের সমাপ্তি হলে বিবসনা শশীবালাকে বলল, "দিদি, এ তো আমাদের অনু।"

শশীবালা অপর একজনকে সগর্বে বলল, "আমাদের অনু।" তিনি তাঁর পার্শ্ববর্তিনীকে বললেন, "জানেন না বুঝি, ওর নাম অনু।" এমনি করে পরিচয়ের দাবানল সর্বত্র ছড়াল। সকলে বলাবলি করল, অনু। অনু এই মেয়েটির নাম।

বর্ষীয়সী আরজি পেশ করলেন, "হাঁ ভাই অনু, আর একটি হোক না ভাই।"

উজ্জয়িনী দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করল। তারপর দুই হাত নেড়ে জানাল, না। তার দেবতার জন্যে তার গান, অন্যের ফরমাসে নয়।

আমন্ত্রণের উপর আমন্ত্রণ বর্ষণ হল। বিভিন্ন কুঞ্জে বিভিন্ন সময়ে গান করবার। উজ্জয়িনী দুই হাত যোড় করল। সে কোনো আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারবে না। যাঁর অভিলাষ তিনি

গোবিনজীর সন্ধ্যারতি উপলক্ষ্যে আসুন, গোবিনজীর নাটমন্দিরে বসুন, গোবিনজীর দাসীর আনন্দ দেখুন।

বনমালীবাবু বাড়ীর দোরগোড়ায় ভিজে কাপড় পেতে রাখেন ও বৈষ্ণবজনের পদধূলি সেই ফাঁদে ধরেন। যেই শুনলেন অমু মেয়েটি অসামান্য কীর্তনগায়িকা, অমনি তাকে ভুলিয়ে তার পায়ের ধূলো নেবার ফন্দী আঁটলেন। সুরধুনীর কীর্তনের শখ নেই। তার মায়ের থাকলেও সময় নেই। তাঁকে বাড়ীর সমস্ত কাজ করতে হয়। উজ্জয়িনীকে দিয়ে তাঁর অন্দরে গান গাইয়ে নিতে হবে, বনমালী বুড়োর এই অভিসন্ধি তাঁর গৃহিণীর সমর্থন পেল। কাজও করবেন, গানও শুনবেন। যামিনী দেবী উজ্জয়িনীকে বললেন, "কে জানত তোমার এত গুণ। এখনো কেউ টের পায় নি তুমি কোথায় থাক, পেলে তোমাকে লুটে নিয়ে যাবে, অমু। তার আগে তোমার পিসিমাকে একটা গান শুনিয়ে দাও, বাছা। মন্দিরে যাওয়া কি আমার পোড়া কপালে আছে! আমার ঠাকুর ঘর দেখ নি বুঝি। শ্রীশ্রীরাধা রাসবিহারী জিউ আমার ঘরে বিরাজ করছেন। কত ভক্তের শুভাগমন হয়। তুমি এস।"

দুপুরে উজ্জয়িনীর মহলার দরকার ছিল না। সে রাজী হয়ে গেল। অজানতে ভিজে কাপড়ের উপর দিয়ে হেঁটে যেটুকু ধূলো তার পায়ে ছিল সেটুকুর ছাপ এঁটে দিল। বনমালী বাবু কোথায় ছিলেন, বোঁ করে বেরিয়ে এসে ছোঁ মেরে কাপড়টা সরিয়ে রাখলেন, তার বদলে আর একখানা পাতলেন। একালের ছোকরাদের যেমন অটোগ্রাফের বাতিক, সেকালের বুড়োদের তেমনি এই জাতীয় বায়ুরোগ।

ইনিও কাম্ব। উজ্জয়িনী রাসবিহারীজীকে পর ভাবল না। দেশ

কাল ভুলে তেমনি অকপট আন্তরিকতার সহিত মাধুরী নিবেদন করল। উৎসারিত বাক্, পল্লবিত ভাব, লীলায়িত সুর, প্রাণস্পর্শী টান। উজ্জয়িনী যতক্ষণ গান করে ততক্ষণ তার প্রত্যয় হয় কানু জীবন্ত মানুষের মতো তার সামনে দাঁড়িয়ে তারই গানের সুরে বাঁশি বাজাচ্ছেন। কী দুর্লভ সৌভাগ্য! তিনি তার শ্রোতা নন, তিনি তার সহযোগী। এমনি করেই না তিনি গোপীদের সঙ্গে কেলি করে ছিলেন। তিনি ছিলেন তাদের খেলার সাথী।

যামিনী দেবী মুগ্ধ হয়ে বললেন, "এইটুকু মেয়ে কেমন সুন্দর গায়, দেখছিস সুরো!"

সুরধুনী মন্তব্য করলেন, "শিক্ষা ও সাধনা।"

উজ্জয়িনীর ইচ্ছা করল বলে, শিক্ষা ও সাধনাও না। তাঁরই করুণা যিনি মূককে বাচাল করেন, পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করান।

"হাঁ বাছা, কোথায় শিখলে তুমি গান?" যামিনী দেবী জিজ্ঞাসা করলেন।

"তাঁর কাছে।" উজ্জয়িনী আঙুল দিয়ে টিপ করল তার কানুকে।

মা ও মেয়ে পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। বলে কী! পাগল নয় তো!

"বুঝতে পারলেন না?" উজ্জয়িনী মাথা দুলিয়ে মনোজ্ঞ ভাবে বলল, "আমি যে তাঁর দাসী। কেমন করে সেবা করতে হয় দাসীকে তিনি না শেখালে কে শেখাবে, বলুন!"

যামিনী চোখ অর্ধেক বুজে দাঁত অর্ধেক বার করে বললেন, "অ। এই কথা!"

সুরধুনী গম্ভীর হেসে নীরব রইলেন।

বনমালীবাবু ও ঘর থেকে বলে উঠলেন, "পরম ভক্ত। পরম ভক্ত। গৃহ পবিত্র হলো! মন পবিত্র হল। কী ভাব! কী ভাষা! কী দরদ! কী কমনীয়তা! আহা-হা-হা!"

যামিনী দেবী যা আশঙ্কা করেছিলেন তাই হলো। উজ্জয়িনীর ঠিকানা শশীবালা প্রভৃতির কাছে সংগ্রহ করে তাকে আমন্ত্রণ করতে প্রতিদিন পাঁচ-সাত জন নানা বয়সের নারী উপস্থিত হতে লাগলেন। তার সেই এক উত্তর। আরতির পর গোবিনজীর বাড়ীতে গান হবে, আপনারা আসবেন। তাঁদের ব্যক্তিগত অসুবিধার অজুহাত সে গ্রাহ্য করে না। কেবল যামিনী দেবী যদি অনুরোধ করেন তবে রাসবিহারীর সম্মানরক্ষার্থে সে সম্মত। যারা আমন্ত্রণ করতে আসেন তাঁরা নিজ নিজ গৃহদেবতার নাম করলে উজ্জয়িনী অস্বীকার করতে পারত না। কিন্তু তাঁরা তো জানে না তার ধারা। তার মন পাবার জন্যে কত রকম খাবার নিয়ে আসেন। বাজারে ভালো আম উঠেছে, কি আর কিছু। তাঁরা কিনলেন তাঁদের প্রিয় গায়িকার জন্যে। দিলেন তাকে উপহার। সে চেয়ে দেখল কি না। অমনি অনুযোগ করল, "এ সমস্ত কেন?" করলই না গ্রহণ।

কিন্তু গোবিনজীর মন্দিরে যারা তার গান শুনে বিচলিত হয় তারা তাকে শুধুমাত্র সাধুবাদ দিয়ে ক্ষান্ত হয় না, তার পায়ে সিকি আধুলি টাকা যে যা পারে সে তা অর্পণ করে। উজ্জয়িনী স্পর্শ করে না। যাদের দরকার তারা কুড়িয়ে ভাগ করে নিয়ে যায়। উজ্জয়িনী সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক। নয়ন ভরে তার প্রিয়তমের শ্রীরূপ নিরীক্ষণ করে। তিনি তো প্রতিমা নন। তিনি জীবন্ত মানুষ। উজ্জয়িনীর গানের সুরে তিনি বাঁশিতে ফুঁ দেন। তিনি দেবতা হয়ে অর্ঘ্য নিয়ে ঋণী হতে চান না। তিনি সাথী হয়ে খেলায় মিলে সমান হতে চান।

গভীর ঘন আনন্দরস উজ্জয়িনীকে আপ্লুত করে। যে পথ দিয়ে সে চলে যায় সে পথে ঝরিয়ে যায় তার আনন্দস্নানের বারিবিন্দু।

বিরল মুহূর্তে তার মনে পড়ে বিগত রজনীর স্বপ্নের মতো তার অতীত জীবন। কারুর উপর তার রাগ হয় না, অভিমান হয় না। অতীত জীবনের সঙ্গে তারাও অতীত হয়েছে—তার পার্থিব আত্মীয় স্বজন। পিতৃশোক তাকে ব্যাকুল করে না, পিতা যে ইতিমধ্যে দিব্য দেহ লাভ করেছেন। পিত্রালয়ের সুরুচি ও শৃঙ্খলা, শ্বশুরালয়ের দাসদাসী পরিবৃত স্বাচ্ছন্দ্য, সুশীলাবতীর ভবনবিভব, তীর্থপর্যটনের কণ্টকিত উত্তেজনা—কোনোটার অভাবে তার খেদ নেই। সে আছে ব্রজধামে, সে আছে গোপীজনবল্লভের লীলানিকেতনে, সে আছে জীবাত্মা পরমাত্মার মিলনবাসরগৃহে, এই মহত্তোমহীয়ান নিত্য সৌভাগ্যের পটভূমিকায় তার বহুবিধ অনভ্যস্ত আচার ও অভিজ্ঞতা নিষ্প্রভ হয়ে ধন্য হয়েছে।

সে এক নূতন উজ্জয়িনী। দিন দিন তার গীতিপ্রতিভার বিকাশ তাকে বিস্মিত করছে, অথচ এই বিস্ময় প্রাত্যহিক বলে তাকে আত্মহারা করতে পারছে না। উত্তরোত্তর বর্ধমান যশ নাগরদোলার মতো তাকে শূন্যে নিয়ে চলেছে, কিন্তু যশের চেয়ে দুর্লভ উপলব্ধি তাকে ব্যাপৃত রেখেছে বলে সে মাটি হতে কত উচ্চে উঠল সে দিকে চাইতে পারছে না। সে কী খায় কী পরে কখন শোয় কখন নায় তার ঠিক নেই। জীবনযাত্রার বহিরঙ্গ তাকে আর ভাবায় না, ভাববার সময় থাকলে তো ভাবাবে! একদা সে তিনবেলা স্নান করেও আপনাকে অশুচি মনে করত, কবে তার শুচিবাই অলক্ষে অন্তর্হিত হয়েছে।

বড় আশ্চর্য এই মানবজীবন। একই দেহে মানুষ কত বার ভূমিষ্ঠ হয়। যতক্ষণ না দেহ থেকে শ্বাস বিচ্ছিন্ন হয়েছে ততক্ষণ মানুষ বারম্বার নবজাত। নব জন্মের বেদনাকে সে বলে দুঃখ, সে বলে দুর্ভাগ্য। তাকে এড়াবার জন্যে তার কী অদ্ভুত প্রয়াস!

উজ্জয়িনীরও নবজন্ম হল। লজ্জার সে রাখল না অবশেষ। সঙ্কোচের সে ছায়া মুছে ফেলল। স্বাধীনভাবে সে চলাফেরা করত, কিন্তু বাস করল এই প্রথম। কখন বাসায় থাকে কখন থাকে না এর দরুন কারুর কাছে তার জবাবদিহির দায় নেই। কেবল একটি বিষয়ে সে দৃঢ় রইল। আপনাকে সুলভ করল না। আলাপ করল সকলের সঙ্গে। কিন্তু স্বীকার করল না কারুর আমন্ত্রণ। নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট কালে তার কীর্তন চলতে থাকল। একবার যারা শুনল বার বার তারা শুনতে এল। কিন্তু ফরমাস করে যে উজ্জয়িনীকে দিয়ে তাদের বাছাই গান গাওয়াবে, অন্তত উজ্জয়িনীর পুরোনো গান, তেমন প্রশ্রয় পেল না। একমাত্র যামিনী দেবীকে ও বনমালীবাবুকে উজ্জয়িনী এই নিয়ম থেকে ছাড় দিল। তাও সব সময় নয়।

সঙ্গে করে এনেছিল "পদকল্পতরু।" দুপুরে সেইখানার পাতা ওলটায়। মনে গেঁথে নেয় ভালো ভালো পদ। এখান থেকে এক পংক্তি ওখান থেকে আধ পংক্তি। তারপর ভুলে যায়। ভুলতে না জানলে স্মৃতির রসে জারিয়ে নেওয়া হয় না। তার থেকে আসে অপরিপাক দোষ। তাই সে মধুমক্ষিকার মতো মধু প্রস্তুত করণের প্রণালী অনুসরণ করল।

## ৪

মাসখানেক অতিবাহিত হল। তার পরের কথা।

একদিন শশীবালা উজ্জয়িনীর কাঁধে হাত রেখে বলল, "তোমাকে আজকাল কেমন যেন মলিন দেখায়। কেন বলতে পার?"

"মলিন দেখায়!" উজ্জয়িনী ভ্রূকুঞ্চন করল।

"হাঁ ভাই! জিজ্ঞাসা কর বিবুকে। "কি রে বিবু, তোর তাই মনে হয় না?"

"আমিও তাই বলব ভাবছিলুম। কী হয়েছে ভাই, অনু? বাড়ীর কথা মনে পড়ছে?"

তখনকার মতো হেসে উড়িয়ে দিল উজ্জয়িনী। কিন্তু থেকে থেকে তারও বোধ হতে থাকল কী যেন একটা বিষাদ তাকে ধীরে ধীরে অধিকার করছে। এর জন্যে আয়নায় মুখ দেখবার দরকার নেই। ভিতর থেকে সে বার্তা পাচ্ছিল।

"কানু," সে একান্তে আবেদন করল, "কী আমার অপরাধ? আমি তো আমার কিছুই হাতে রাখিনি। সব তোমাকে দিয়েছি। যখন গান করি তখন তোমাময় হয়ে গান করি। যখন আলাপ করি তখনো তুমি থাক স্মরণে। যখন করি বিশ্রাম তখন তোমার ধ্যান না করে পারিনে, আমার বিশ্রামেও আমার দাবী নেই। কেন তবে এ বিষাদ? কোন কর্তব্য অবহেলা করলুম?"

উত্তর পেল না। দিন গেল। তারপর তার মনে হল হয়তো তার নিজের দোষ নয়। দোষ তার আবেষ্টনের। যাই বল না কেন এ পাড়া, এ শহর, খুব পরিষ্কার নয়। আর ঐ বাঁদর হতভাগারা বড় জ্বালাতন করছে। শুকুতে দেওয়া জামা তুলে নিয়ে

যায়, তাড়া করলে দাঁত খিঁচায়, বাড়াবাড়ি করলে গাছে ওঠে। অগত্যা প্রথামতো তাদের এক প্রকার চৌথ দিতে হয়, যেমন দিতে হত বর্গীদের। খাদ্য পেলে ওদের উদ্দেশ্য পূরণ হয়, ওরা গৃহীত দ্রব্য অকাতরে বিনিময় করে।

আর কী অদ্ভুত ব্যাপার! এই নারীরাজ্যে এত নারী। কিন্তু প্রায় সবই তো বিগতযৌবনা, মন্দভাগিনী, কুরূপা। এই বিধবারাই কি ব্রজবধূ? এই প্রবীণারাই কি ব্রজযুবতী? গ্রাম্য মেয়েদের কথা আলাদা। তাদের মধ্যে রূপ যৌবনের এমন অপ্রতুলতা নেই। কিন্তু মন্দিরে যারা ভিড় করে গান শোনে তাদের এমন কী আছে যা পুরুষোত্তমের ভোগোপযোগী! তাঁর কি কোনো সুখ আছে এদের ঐ মাংসপিণ্ড অথবা অস্থিপঞ্জর বুকে নিয়ে? তড়িৎ কই এদের নেত্রে, উত্তাপ কই এদের রক্তে, ভঙ্গী কই এদের গমনে? পুরুষাধমও স্পর্শ করতে রাজী হবে না এদের দোদুল্যমান স্তন।

না। এও বাহ্য। উজ্জয়িনীর বিষাদ আবেষ্টনঘটিত নয়।

শরীরের বেদনার স্থান নির্ণয় করা কঠিন নয়, কিন্তু অন্তরের বেদনার হেতু নির্দেশ করা কঠিন। উজ্জয়িনীর নিত্য কাজের অন্তরালে বিষাদের নিদান অন্বেষণ চলল। পরিশেষে উজ্জয়িনীর প্রত্যয় জন্মাল, সে প্রকৃত কারণের সন্ধান পেয়েছে।

"কানু," সে কাতরভাবে বলল, "আমি যে এত দিচ্ছি, এর কিছু কি তুমি নিচ্ছ? জানি তোমার যোগ্য নয়, কিন্তু গোপীরা যা দিয়েছিল তাও কি ছিল নেবার যোগ্য? তাদের দেওয়া তুমি নিয়েছিলে, নিয়ে তাদের ধন্য করেছিলে, মুক্ত করেছিলে। কেন বল দেখি? কারণ ভক্ত যা যত্ন করে দেয়, যা দিতে তার যেমন পুলক তেমনি পরিশ্রম হয়েছে, তা তুমি না নিলে ভক্ত নিরাশ

হয়। গোপীদের দান তুমি সাদরে গ্রহণ করেছ, কখনো কখনো দস্যু তস্করের মতো সাদরে। আমার দান কই নিচ্ছ?"

তার মনে পড়ল কানু তার গানের সুরে বাঁশি বাজায়।

"কিন্তু সে কেমনতর নেওয়া?" সে প্রশ্ন করল। আপনি উত্তর দিল, "আমি যখন তোমার গলায় মালা দিতে গেলুম তুমি তখন সে মালার সঙ্গে আর একগাছি মালা একত্র করলে গলায় পরলে না তো। তুমি আমার সহযোগী, আমার সাথী। এ আমার ভাগ্য। কিন্তু এর থেকে নিবিড় করে চাই তোমাকে। সাথী পেয়ে কি গোপীরা সন্তুষ্ট ছিল? ওরা যেভাবে চেয়েছিল, যেভাবে পেয়েছিল, আমিও সেই ভাবে। ওরা আত্মসুখ কামনা করেনি, আমিও করি নে। তোমারি সুখ আমার ধ্যান। কিন্তু সে কোন্ তুমি? সখা তুমি, না নায়ক তুমি?"

তার কানু একদিন স্ববেশে অথবা ছদ্মবেশে তার কুঞ্জে আসবে, এই বিশ্বাস নিয়ে সে জীবন ধারণ করছিল। নইলে তার বেঁচে থাকার অর্থ হয় না। ইহজন্মে তো ছাই সুখ পেল। সীতার মতো দুঃখিনী।

"কানু, আমি যা চাই তার পরিবর্তে অন্য কিছু চাইনে, কী হবে আমার গীতিপ্রতিভা, কী হবে যশ ও বিত্ত, কী হবে লৌকিক বন্ধুতা মিত্রতা? ওদের সখ্য দূরে থাক তোমার সখ্যও আমার যথেষ্ট নয়। আমি যা চাই তার চেয়ে নিকৃষ্ট কিছু চাইনে।"

তার মনে পড়ল, চাওয়া তো গোপীভাব নয়। গোপীরা চায় না। গোপীরা নিঃস্পৃহ, তাই তারা আদর্শ। তারা দিয়েই মুক্ত। চাওয়া যদি তাদের থাকে তবে তা আপনার জন্যে নয়, তা প্রিয়তমের জন্যে। প্রিয়তমকে যা দিল তাতে তাঁর আনন্দ হোক, তাকে তিনি উপভোগ করুন, এই তাদের চাওয়া।

উজ্জয়িনী বলল, "তা হলে গোপীভাবের ভিতর চাতুরী আছে। মনে কর, কোনো গোপী তার তনু অর্পণ করে শুধু এই চাইল যে, তাতে তোমার আনন্দ হোক, তাকে তুমি উপভোগ কর। প্রথম দৃষ্টিতে ভ্রম হবে যে গোপীটি কী নিঃস্বার্থ, কী নিষ্কাম। কিন্তু সম্যক দৃষ্টিতে ধরা পড়বে ওটা একটা অব্যর্থ চাল। তোমাকে যে কামনা করে তার অযোগ্যতা দেখলে তুমি হয়তো তার কাছে যাবে না। সে যদি সাজে তোমারি হিতৈষী তবে তোমার দয়া পাবে। আর তুমি যদি তাকে স্পর্শ কর তবে সে কি পাষাণ যে তার দেহে বিদ্যুৎ সঞ্চার হবে না? পাষাণেরও হয়। তুমি স্পর্শসুখ পাও বা না পাও তার স্পর্শসুখের সীমা রইবে না, তা সে জানে। তুমি উপভোগ কর বা না কর তার উপভোগ অনিবার্য। বুঝলে কানু, তোমার গোপীরা বড় সরল নয়, তারা চতুরতমা। ভাগবতে তাদের হ্যাংলামি লক্ষ্য করেছি। কী করি, সবাই বলে তারা নিষ্কাম। তাই আমিও ভাবি তারা নিষ্কাম। যেমন নিষ্কাম তোমার বৃন্দাবনের কাঙালী ভিখারী। 'ঠাকুরজীকা গোয়ালবাল, কড়ি পয়সা তার লাল।' গাছে গাছে বাঁদর, পথে পথে বাঁদরেরই মতো নাছোড়বান্দা ছেলে।"

না। গোপীভাব আর না। মনকে চোখ ঠারতে থাকুন সুরধুনী দেবী। উজ্জয়িনী কিন্তু সোজাসুজি কবুল করছে, সে চায়। তার যোগ্যতা আছে কি না সে কী করে বলবে, কিন্তু তার সাধনা অকৃত্রিম তথা অবিচ্ছিন্ন। গোপীদের স্বামীপুত্র আছে, তাদের সেবার সঙ্গে কৃষ্ণসেবার বিচ্ছেদ যেন দিবার সঙ্গে রাত্রির। মন টানছে এক দিকে, সংসার টানছে অন্য দিকে। এই দোটানা গৃহীদের জীবনযাত্রায়, তাই গৃহীদের পক্ষে গোপীভাব বিহিত।

কিন্তু উজ্জয়িনী যে কুলত্যাগিনী। কুল থেকে বিছিন্ন হয়ে শ্যামসর্বস্ব হয়েছে, দান করতে গিয়ে অর্ধেক হাতে রাখেনি। গৃহীদের তিনি বলেছেন, তোমরা সংসারের শত কর্ম কর, মন রাখ আমার পায়ে। উজ্জয়িনীকে তেমন কথা বললে সে শুনবে কেন? সে কি গৃহী? সংসার আছে কি না জানে না, আছে কানু; একমাত্র কানুই সৎ, কানুই চিৎ, কানুই আনন্দ। বাকী সব মায়া। বাকী সব কানুর ছলনা! কানু যাকে নেয় তাকে পরীক্ষা করে নেয়। ছলনায় যার চোখ আটকে গেল সে কানুর দেখা পেল না, পাবে না। উজ্জয়িনী বুদ্ধিমতী, সে কি বাইরের চটকে ভুলবে? সে স্বামীও চায় না, পুত্রও চায় না, সমাজের মক্ষিরাণী হতেও তার শখ নেই, স্বদেশের পরিচারিকা হয়েও তার সুখ নেই। কত লোককে কানু কত রকম খেলনা দিয়ে ভুলিয়েছে—কাউকে চুষিকাঠি কাউকে ঝুমঝুমি কাউকে কলের গাড়ী কাউকে ফুলঝুরি। যারা সব ছাড়তে পারল তাদের গেল না মালপোয়ার লোভ।

"কানু," উজ্জয়িনী সগর্বে বলল, "বড় কঠিন মেয়ে আমি। আগুনে পুড়ব না, জলে ভিজব না, অস্ত্রে আহত হব না, লোকনিন্দায় মনমরা হব না। কী করবে আমাকে নিয়ে, দেখব।"

কানু তাকে খেলনা দিয়ে ভোলায় নি, কিন্তু বহির্জীবনের পরিবর্তনে ও পৌনঃপুনিক অবস্থান্তরে সে আপনি ভুলে রয়েছিল তার পুরাতন কামনা, তার গৃহত্যাগের আদিম কারণ। তার মনে পড়ল সে বলেছিল, "কানু, তোমাকে আমি পটে দেখে তৃপ্ত হব না, মূর্তিতে দেখে তৃপ্ত হব না। আমি চাই সশরীরে দেখতে। আমি তোমাকে অন্তরে দেখে তৃপ্ত হব না, স্বপ্নে দেখে তৃপ্ত হব না, আমি চাই স্বচক্ষে দেখতে, চর্ম চক্ষে।"

গান গাইবার সময় কানুকে বাঁশি বাজাতে দেখা—উজ্জয়িনী ভাবল —সশরীরে নয়। মূর্তিতে জীবন্যাস হয়, কিন্তু মূর্তি তো এক পদ অগ্রসর হতে পারে না। যদি তার কাছে আসত, তার হাত ধরত তবে বোঝা যেত মূর্তির স্বাধীনতা আছে। স্বপ্নে অমন ঘটেছে বটে, কিন্তু স্বপ্নে দেখা তো চর্ম চক্ষে দেখা নয়।

"না, না, কানু। শ্রীমতী তোমাকে যে আকারে পেয়েছিলেন ও পেয়ে থাকেন আমিও পেতে চাই সেই আকারে। আমি ঘোর সাকারবাদী। মূর্তি এক হিসাবে নিরাকার। কারণ আকারের যাবতীয় ধর্ম ওতে নেই। আমার ফটোগ্রাফ কি আমার মত সাকার? যে আমাকে চায় সে কি আমার ফটো পেলে আমাকে পায়? মূর্তি হচ্ছে স্মারক, স্মরণ করিয়ে দেয় যে ভগবান আছেন। কিন্তু ভগবানের জন্যে মানবের যে তৃষা সে কি মূর্তিতে মিটবার? দুধের তৃষা কি ঘোলে মেটে। আমরা সসীম, আমরা অসীমের কল্পনা করতে পারিনে। তাই অসীম আমাদের তরে সসীম হলেন, মানুষ হলেন, কৃষ্ণ হলেন। আমি মানুষ, আমি চাই মানুষকে। ওগো আমার মনের মানুষ, তুমি মানুষ হয়ে এস। চাইনে তোমার পাষাণ মূর্তি। ও থাক পাষাণীদের তরে।"

গোবিনজীর মন্দিরে যেতে তার রুচি হয় না আর। তবু যায়। সেখানে কত ভক্তের সঙ্গ লাভ হয়। সেও তো এক মহাপুণ্য। তাঁরা কত আগ্রহের সহিত শোনেন তার অশিক্ষিত কণ্ঠের আলাপ। তাঁদের নিরাশ করা অন্যায়। কানুকে পাচ্ছে না বটে, কিন্তু কানুর নিশানা তো পাচ্ছে। ইদানীং তার কেবল একই বিষয় গানের। তুমি আমাকে স্বদেহে দেখা দাও, যে দেহে তোমার ভক্তশ্রেষ্ঠদের দিয়ে থাক। তোমার মূরৎ সুন্দর, কিন্তু দেহ দিব্য সুন্দর। তোমার মূরৎ

মণিমণ্ডিত, কিন্তু সেহ একখণ্ড নীলকান্ত মণি। তোমার মূরৎ সুশীতল, কিন্তু সেহ কুসুমাদপি কোমল। তুমি আমাকে স্বরূপে দেখা দাও। যে রূপে তোমার ভক্তশ্রেষ্ঠদের দিয়ে থাক!

দিবানিশি এই সুর তার শয়নে জাগরণে ধ্বনিত হতে থাকে, তার আচারে আচরণে। কাউকে খুলে বলে না, কেউ ঠিক বোঝে না। সবাই জানে সে একটি নিঃসম্পর্কীয়া বিধবা, পোড়াকপালী এই নিয়ে আছে, এই হরিগুণগান। পরজন্মে ভাগ্যবতী হবে।

৫

প্রতি দিন উজ্জয়িনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কেউ না কেউ আসে। তাদের আহ্বানে উজ্জয়িনী কর্ণপাত করে না। গল্প গুজব ও তত্ত্ব-কথার পর তারা বিদায় নেয়।

এক দিন জনকয়েককে বিদায় দিয়ে উজ্জয়িনী একটু নিশ্বাস ফেলেছে এমন সময় হলো আরো এক জনের আবির্ভাব। প্রগল্‌ভস্বভাবা মধ্যবয়সিনী। পরিচয় দিল, ব্রজমণ্ডলেই বাস, কিন্তু বৃন্দাবনের বাইরে।

"দাউজী দর্শন করেছ? ওমা, করনি? তবে আর কী করলে? তিনি যে ব্রজের রাজা, অতি জাগ্রত দেবতা। ভক্তের দুঃখ দেখতে পারেন না, তাই তাঁর নাম দাউদয়াল। জান না বুঝি, মুসলমান যখন তাঁকে ধ্বংস করতে আসে তখন বাদশা এক পা এগোলে দাউজী চার কোশ এগোন। সেই দাউজী।"

উজ্জয়িনী কিছু বলবে, সেই জন্যে অপেক্ষা না করে আগন্তুক আবার আরম্ভ করল। "নন্দগ্রাম অবশ্যই দেখেছ। তাও দেখ নি?" গালে

হাত দিয়ে, "দেখ নি নন্দবাবার মূর্তি, যশোদামাইয়র মূর্তি? যশোদা কুণ্ডে মাই স্নান করতেন। তাঁর দুষ্টু ছেলে তাঁকে জালতন করে তুললে মাইজী কী বলে ভয় দেখাতেন, জান? বলতেন, 'ঝাউ গাছে হাউ; অমনি বাছাধন চুপ। নন্দগ্রাম দেখলে না। আঁজনও দেখ নি তা হলে। ওর নাম আঁজন কেন হল? একদিন প্রিয়াজী অঞ্জন পরবার সময় পান নি, বাঁশি শুনেই ছুটে এসেছেন। ঠাকুরজী তাঁকে নিজ হাতে আঁজন পরিয়ে দিয়েছিলেন।"

উজ্জয়িনী কুতূহলী হয়ে বলল, "সত্যি?"

"সত্যি গো সত্যি।" বৈষ্ণবী বলে চলল, "তোমরে কথা শুনে মনে হয় তুমি সংকেত বটও দেখ নি। শ্রীকৃষ্ণজী মহারাজের সঙ্গে শ্রীমতীজীর প্রথম সাক্ষাৎ সেইখানে।"

উজ্জয়িনী সাগ্রহে শুধাল, "এখান থেকে কত দূর?"

বৈষ্ণবী মুচকি হেসে বলল, "নিয়ে যাব এক দিন। কাছেই যাবট। সেখানে আয়ান ঘোষের বাড়ী, রাধিকাজীর শশুরবাড়ী গো!"

"চাইনে দেখতে।"

"জটিলা কুটিলার মূর্তি আছে। আয়ান ঘোষের মূর্তি আছে। আহা, প্রিয়াজী কত দুঃখ পেয়েছেন তাদের সেই বাড়ীতে। বাড়ী তো আর নেই। দেখবে, যদি যাও, কিশোরীবট ও কিশোরীকুণ্ড।"

"না। না।" উজ্জয়িনী মাথা নেড়ে বলল, "সে বড় কষ্ট।"

"হাঁ। বড় কষ্ট।" চোখ মুছে, "তবে লাডলিজীর বাপের বাড়ী ছিল নিকটেই, বর্ষানায়। বর্ষানা তো যাওনি, 'আলতা পাহাড়ী'তে তাঁর পায়ের আলতার চিহ্ন দেখতে।"

উজ্জয়িনী অবাক হয়ে রইল। বৈষ্ণবী বলতে লাগল, "বৃষভানু রাজার বাড়ী যে পাহাড়ে ছিল সেখান থেকে নন্দগ্রামের পাহাড় দেখা

যায়। দুই পাহাড়ের উপর দুই কিশোর কিশোরী দাঁড়িয়ে পরস্পর সংকেত করতেন আর মিলিত হতেন মাঝখানে সেই সংকেত স্থলে।"

"আমি যাব।" উজ্জয়িনী অধৈর্য হয়ে বলল। "আমাকে কেউ সঙ্গে করে সব দেখাতে শোনাতে পারে?"

"কেন পারবে না?" বৈষ্ণবী যেন এই চেয়েছিল। কুটিল হাসি হেসে বলল, "আমিই পারি। কবে যাবে বল। কোথায় কদিন থাকবে বল।"

"তা আপনি ভালো জানেন। আমি যে কোনো দিন রওনা হতে রাজী। কী নাম আপনার? আপনি অত উপকার করলেন!"

"আমার নাম চমৎকার।"

"কী? কী?" উজ্জয়িনী বিশ্বাস করতে পারছিল না।

"চমৎকার। কেন, মনে ধরছে না?" বৈষ্ণবী কটাক্ষ হানল।

"চমৎকার।" উজ্জয়িনী হেসে উত্তর দিল। মানুষের নাম যে চমৎকার হয় তা সে প্রথম শুনল। সেদিন 'বিবসনা' শুনে শক পেয়েছিল। 'বিবসনা' তবু কালীর নাম। কিন্তু 'চমৎকার!'

"দেখলে ফুরায় না, ব্রজে এত দেখবার আছে। সকলে কি দেখতে পায়! বহু জন্মের তপস্যা থাকলে তবে দর্শন ঘটে। ব্রজের তরু লতাও কত তপস্যা করেছে বলে ব্রজে জন্ম লাভ করেছে। ব্রজের ময়ূরময়ূরীও পরম ভক্ত। বর্ষানা পিরিপুকুরে যে ময়ূরকুঠি আছে সেখানে শ্রীকৃষ্ণজী মহারাজ ময়ূর সেজে রাধিকাজীর ও সখীদের হাত থেকে লাড্ড খেয়েছিলেন।"

উজ্জয়িনী ভারী আমোদ বোধ করল। কানুটা এমন লোভী।

"মিথ্যা নয়! তখন থেকেই ময়ূরগুলোর লাড্ডু খাবার শখ। দেখবে তুমি।"

"ময়ূরের অপরাধ কী? উজ্জয়িনী রঙ্গ করে বলল, "মানুষের যে মালপোয়ার শখ!

চমৎকার বৈষ্ণবীরও বোধ হয় সে দুর্ব্বলতা ছিল। সে অপ্রসন্ন হয়ে প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করল। "হাঁ। চরণ পাহাড়ী যেতে হবে। সেখানে ভগবানের চরণ চিহ্ন আছে। ভগবান সেখানে লুকালুকি খেলতেন কিনা। কাছেই পিছলি শিলা। সখীদের সঙ্গে পিছলি খেলেছিলেন! আমরাও পিছলি খেলব।"

উজ্জয়িনী জানতে চাইল সে কেমন খেলা। চমৎকার বলল, "খুব সোজা। একটা হেলানো পাথরে বসে নীচের দিকে পিছলে পড়া। লীলারস আস্বাদন না করলে কি বোঝা যায়! যারা পিছলায় তারাই বোঝে কী মধুর!"

"যথার্থ।"

"সখীদের সাথে যেমন পিছলি খেলা সখাদের সাথে তেমনি ভোজনানন্দ। কাছেই ভোজনস্থালী। তার মানে ভোজনের থালা। এখনো রয়েছে। পাথর কিনা। যাত্রীরা তাতে দই বাতাসা চড়ায়। আমরাও চড়াব।"

উজ্জয়িনী উৎসাহভরে বলল, "হাঁ। আমরাও!"

"হোলীর অনেক দেরি!" চমৎকার আক্ষেপ প্রকাশ করল। "নইলে দেখতে লীলাবৈচিত্র্য। বঠেন গ্রামে যে লীলা হয় সে কি বলবার! মেয়েরা লাঠি হাতে পুরুষদের তাড়িয়ে নিয়ে যায়, গান করতে করতে। আমরাও তাই করতুম।"

উজ্জয়িনী উত্তেজিত হয়ে বলল, "আমরাও।"

"রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড দেখেছ নিশ্চয়?"

"দেখেছি।"

"কার সঙ্গে দেখতে গেছলে ?"

"যাদের সঙ্গে এখানে আসি তাদের সঙ্গে, তারা একদল যাত্রী।"

চমৎকার একে একে উজ্জয়িনী সম্বন্ধে অনেক তথ্য উদ্ধার করল। কিন্তু পেল না তার নাম ধাম, তার ইতিহাস। উজ্জয়িনী শক্ত মেয়ে। ওসব কারুর কাছে ভাঙে না।

"শুনেছি তোমার কীর্তন। শুনে মন পবিত্র হয়। কতবার ভেবেছি তোমার সঙ্গে আলাপ করব, আলাপ করে কত পুণ্য হলো। আমার সঙ্গে চল তো তোমাকে সব ঘুরে দেখাই। আমি তো ব্রজের পোকা। অন্ধি সন্ধি জানি। তোমাকে দেখাব না তো কাকে দেখাব! তুমি দেখবে না তো কে দেখবে!"

উজ্জয়িনী বলল, "আমিও তাই চাই। গোবিনজীর কাছে দিন কয়েক ছুটি নেব।"

"কবে আসব বল।"

"আপনার যে দিন সুবিধা।"

"না, না, তুমি যেদিন আসতে বল।"

উজ্জয়িনী বলল, "কাল।"

"কাল!" চমৎকার উৎফুল্ল হয়ে বলল, "কোথায় যাবে বল।"

"এই ধরুন সংকেত।"

এত জায়গা থাকতে সংকেত। চমৎকার ভাবল, কী আছে সেখানে যা সব আগে দেখা চাই? "সংকেত। যা বলেছ, সংকেত। বেশ তাই হোক। সংকেত।"

উজ্জয়িনী ভাবছিল, রাধাকৃষ্ণ কি দ্বাপর যুগের! তাঁরা চিরকালের। আজো তাঁদের মিলন হয়। সকলে চাক্ষুষ করতে পায় না, তা বলে নিত্যলীলা কি অতীতের ঘটনা? বর্তমানের নয়? সংকেতের সাধারণ

মানুষ হয়তো তাঁদের চিনতে পারে না, কিন্তু চোখে দেখে নিশ্চয়। তাদের কাছে অনুসন্ধান করলে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে, অনেক আভাস ইঙ্গিত। যদি অন্ধকার রাত্রে কদমতলায় চুপ করে বসে দেখি তা হলে হয়তো দেখব দুজনের একজনকে। দেখলেই ঠিক চিনব। যার সঙ্গে এতকাল মনোরাজ্যে বাস করেছি তাকে চিনতে পারব না?

"সংকেত! কেমন?" চমৎকার আনমনাকে জাগাল।

"হাঁ। সংকেত।" উজ্জয়িনী আবার আনমনা হল।

চমৎকার উজ্জয়িনীকে চুরি করে দেখে আপনাকে আপনি চোখ ঠারল। তার চোখে সর্পিণীর সম্মোহন। বয়স হয়েছে। কিন্তু বয়সের ভার নেই। একেবারে তরুণ বয়সীর হাবভাব।

"তা হলে সংকেত থেকে শুরু। তার পর?"

"তার পর?" উজ্জয়িনী চিন্তা করে বলল, জানিনে। আপনি যেখানে যেতে বলবেন।"

"ক' দিন সেখানে থাকতে চাও?"

"তাও," উজ্জয়িনী রাশ ছেড়ে দিয়ে বলল, "আপনার হাতে।"

চমৎকার আশাতীত আহ্লাদে ভাষাহীন হয়ে রইল। তার চোখে শয়তানী ঝিলিক।

"কাল প্রাতে তৈরি থাকব। আপনি দয়া করে ভুলবেন না যেন।"

"ভুলব?" চমৎকার আহ্লাদের চাপে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, "তোমাকে ভুলব! ওগো, তোমাকে আমি কী চোখে দেখেছি, দেখতে না দেখতে ভালবেসেছি। শুনেছিলুম তুমি ভালো গাইতে পার। গান শুনে জানলুম শুধু তাই নয়, তুমি প্রাণ কেড়ে নিতেও আরো ভালো পার। তোমাকে ভুলব!" এই বলে কান্নার উপক্রম।

"ও কী! ও কী! করেন কী চমৎকারদি!" উজ্জয়িনী বিব্রত হয়ে বলল।

"আমাকে 'দিদি' বোলো না, ভাই। আমি তোমার অনেক ছোট।" চমৎকার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল। "আমাকে 'আপনি' বোলো না, ভাই। একটু ভালবেস।"

চমৎকার উজ্জয়িনীর পা ধরল, হাত ধরল।

উজ্জয়িনীর মনে হলো চমৎকার আর কেউ নয়, কানুর দূতী, কানুই তাকে পাঠিয়েছে। তার চাটুভাষণ উজ্জয়িনীর চিত্ত অধিকার করল। তা কি চাটুভাষণ! তা সত্যভাষণ। চমৎকার তো চমৎকার মানুষ! প্রথম দর্শনে ভালোবেসেছে, প্রথম আলাপে ভালোবাসা চায়। ত্যাগ স্বীকার করে সংকেত নিয়ে যাবে, সেখান থেকে অন্য কোথাও। কানুই তাকে পাঠিয়েছে, নইলে কেন তার এত সৌজন্য, এমন ভালোবাসা!

"তোমাকে ভুলব!" চমৎকার তখনো ফোঁপাচ্ছিল, "তোমাকে নয়নের মণি করলেও আমার ভয় যাবে না, কে জানে একদিন অন্ধ হতে পারি। তোমাকে আমার বুকের ভিতর রাখব, যেখানে আছে আমার প্রাণ।" এই বলে দুই বাহু দিয়ে বেষ্টন করল উজ্জয়িনীকে। "এই তো আমার বুকে রইলে। বুকটা জুড়াল।"

উজ্জয়িনী আস্তে আস্তে আপনাকে ছাড়িয়ে নিল।

"আজ থেকে জেনে রাখ আমি তোমার দাসী। তুমি আমার রাণী। তোমার হুকুম তামিল করতে নারাজ হই তো আমাকে মেরে ফেলো। আমি বড় সুখে মরব।" চমৎকার ঘটা করে চোখ মুছতে থাকল।

এমন মানুষকে বিশ্বাস না করে পারা যায়? একে একে উজ্জয়িনী খুলল তার মনের পর্দা। চমৎকার হাতে গাল রেখে অবাক হলো!

অবশেষে বলে উঠল, "আমি তো তোমাকে নিয়ে যেতেই এসেছি। তোমার প্রণয়ীর কাছে।"

"ঠিক নিয়ে যাবে ?"

"ঠিক। চল না তুমি সংকেত গ্রামে। তোমার মনোবাঞ্ছা পূরণ না হলে আমায় ঝাঁটা মেরো।"

উজ্জয়িনী ভাবী মিলনের সূচনায় রোমাঞ্চ বোধ করল। বলল, "চিনতে পারলে হয়।"

"আমি চিনিয়ে দেব।"

উজ্জয়িনী ভারী খুশি হয়ে তাকে আলিঙ্গন করল। লক্ষ্য করল না তার শিকারী কটাক্ষ।

"তুমি আমার হাতে সব ছেড়ে দাও। কেমন করে কী করি দেখ। যদি না ঘটাতে পারি তোমাদের মিলন তবে আমার কান মলে দিও, কান কেটে নিও। আমার কানদুটো তোমার কাছে বাঁধা রাখছি, সই।"

৬

গাছতলায় রাত কাটাতে উজ্জয়িনীর বহুকালের সাধ ছিল। যখন গাছতলায় রাত এল তখন কিন্তু ভয়ে তার চোখের পাতা পড়ল না। ভয়েও বটে, প্রতীক্ষায়ও বটে। চমৎকারকে ঠেলা দিয়ে বলল, "ও সই, তুমি যে ঘুমিয়ে পড়ছ।"

চমৎকার মস্ত হাই তুলে বলল, "না, সই। আমার জেগে থাকার লক্ষণ ঐ।"

সেই আকাশ, সেই সব তারা, পাতলা সাদা মেঘের মতো সেই

ছায়াপথ। এত পরিচিত এই বিশ্ব। তবু তার ভয় যায় না। একটিমাত্র মানুষ—সে নাই বা হলো বিশেষ পরিচিত—সে পাশে না থাকলে তার চেয়ে শতগুণ পরিচিত বিশ্ব শতগুণ ভয়ঙ্কর লাগত। মাঝে মাঝে সে মরণ কামনা করেছে। কিন্তু মরণ যদি হয় নিবিড় নির্জনতা, জনমানবহীন বিশ্বে অসহায় একাকিত্ব, তবে কে তাকে স্বেচ্ছায় বরণ করবে!

"ও সই, তুমি যে আবার ঘুমিয়ে পড়লে!"

"আঁউ, আঁউ, নাঁউ। না সই। হুঁ।" চমৎকার ততক্ষণে অর্ধেক সমুদ্র পার হয়েছে। ঠেলা খেয়ে গোঁ গোঁ করল, তারপর চুপ।

উজ্জয়িনী গুন গুন করে কীর্তন ধরল। তাতে চমৎকারের ঘুম আরো চমৎকার জমল। যাক, হরিনাম করলে সাপ, বাঘ, ভূত কেউ কাছে এগোবে না। কতকটা নির্ভয় হওয়া যাবে।

দুপুর রাত্রে উজ্জয়নীর আবছায়া মতো বোধ হলো, কে যেন বংশীধ্বনি করে এই দিকে আসছে। সে তার কীর্তনের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। ভূত হও প্রেত হও যক্ষ হও রক্ষ হও হরিনামকে সমীহ কর, নইলে তোমার নিস্তার নেই। আর যদি হয়ে থাক কানু স্বয়ং তবে তোমার নাম তোমাকে প্রীতি দিক, প্রিয়তম।

আগন্তুক উজ্জয়িনীর সামনে থেমে বলল, "এখনও জেগে আছ?"

উজ্জয়িনীর তখন ভয়ে দাঁতকপাটি। সে চমৎকারকে জোরে ঠেলা দিয়ে অকালে জাগিয়ে তুলল। ঘুমের ঘোরে চমৎকার নিজ রূপ প্রকট করল। "আ মর ছুঁড়ি, নাগর এসেছে, এত সতীপনা কিসের?"

আগন্তুক বাঁশিটি মুখে ছুঁইয়ে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়াল। বাঁশির সুর যখন বেঁকে বেঁকে যমুনাস্রোতের মতো বয়ে চলল তখন উজ্জয়িনীর সন্দেহ

রইল না যে এই তার কাছ। মন্ত্রচালিতের মতো সে কখন যে উঠল, কখন যে পা টিপে টিপে গেল, কখন যে প্রণাম করল, কখন যে কানুর বাহুলগ্ন হলো তার ইতিহাস নেই। বিশ্ব তখন অবলুপ্ত। সংজ্ঞাও।

জ্ঞান হলে উজ্জয়িনী দেখল চমৎকার কোনোখানেই নেই। যে আছে সে এক বয়স্ক পুরুষ। সেই পুরুষ বলল, "আর একটু ঘুমাও। যাবার সময় জাগিয়ে যাব।"

আর কি ঘুম আসে! রোমকূপে রোমকূপে হর্ষ, কম্পন, আতঙ্ক, লজ্জা, সঙ্কোচ, মোহ। জনম কৃতার্থ সুপুরুষসঙ্গ। তার কি এই মানে? ওহ্! চুম্বককে যেন চুম্বক আকর্ষণ করছে, অণু পরমাণু উতলা। নারী ও পুরুষ বিচ্ছিন্ন থাকবে এর বিরুদ্ধে নিখিল প্রকৃতির ষড়যন্ত্র, স্বয়ং প্রকৃতি সেজেছে দূতী, চমৎকার সেই প্রকৃতির ছদ্মনাম।

আমি নই, 'আমরা'। 'আমি'র দিন শেষ হলো। এখন থেকে আমরা, আমি ও কানু। সারা সংসার এক দিকে, আমরা অন্য দিকে। কানু আর আমি, আমি আর কানু। আমরা। এর মতো মিষ্টি কথা কী আছে! 'আমরা'।

উজ্জয়িনীর মনে পড়ল, 'যাবার সময় জাগিয়ে যাব।' যাবে। কানু যাবে। রাত আর কত বাকী! পেতে না পেতে তাকে হারাব! এই দুর্লভ লগ্ন কি আবার আসবে এ জীবনে! হায়, হায়। এত আনন্দের মাঝে এত নৈরাশ্য! রাত পোহাবে, মিলনও পোহাবে। 'আমরা' ঠেকবে 'আমি'তে। তখন এ পৃথিবী কেমন করে সহ্য হবে!

উজ্জয়িনীর সমস্ত শক্তির সহিত সঙ্গসুখ উপভোগ করতে থাকল। কানুকে এক মুহূর্ত দৃষ্টির আড়াল করল। তারার আলোয় কিছু যে দেখতে পাচ্ছিল তা নয়। রাত্রির মতোই কানু কালো। তা নইলে সে কানু হতো কেন? কানুর বাহুতে তার মাথা। তার সলজ্জ দৃষ্টি

কানুর মুখে পৌঁছাচ্ছিল না। কানুর কণ্ঠের আশেপাশে নূপুর বাজিয়ে ফিরছিল। চক্ষু ছাড়া তার অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসাড়, অশিথিল। তার নারীপ্রকৃতি আত্মরক্ষা করছে, সসংকোচে সযত্নে। ওদিক থেকে টান না পড়লে এদিককার গ্রন্থি খুলবে না। নারীদেহের অধিষ্ঠাত্রী যেন গ্রন্থির পর গ্রন্থি দিয়ে চলছে, দেখি কেমন করে খোলে। বোঝে না যে নিপুণ যাদুকরের হাতে যখন খোলে তখন এক লহমায় খোলে।

"নিয়তির আর কত দেরি?" উজ্জয়িনীর দেহ জিজ্ঞাসা করল তার মনকে।

মন বলল, "দেরিই ভাল। ঘটলে তো ফুরিয়ে গেল।"

উজ্জয়িনীর নিঃস্পন্দতা থেকে আগন্তুকের অনুমান হলো সে নিদ্রা গেছে। এই তো সুযোগ। লোকটা তার দিকে আর একটু সরে এল।

উজ্জয়িনীর শরীরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি ভূমিকম্প হয়ে গেল। কম্পন প্রশমিত হলে উজ্জয়িনী নিঃশ্বাস ধারণ করল। তার কানু টের পেল সে জেগে আছে। শুধাল, "কোনো কষ্ট হচ্ছে?"

উজ্জয়িনীর মুখ ফুটছিল না। সে শরমে মৌন রইল।

"এ ব্যাপারে অনভিজ্ঞ। না?"

উজ্জয়িনীর ইচ্ছা করল মরে যেতে। এ প্রশ্নের কী উত্তর দেবে। নীরবে স্বেদস্নান করল। অনভিজ্ঞ তো বটেই। তা বলে স্বীকার করবে! কানুটা কী গোঁয়ার! মুখ দিয়ে বলিয়ে নিতে চায়। ছি ছি।

"ভয় নেই। বুঝলে!" তার কানু তাকে অভয় দিল। "প্রথম প্রথম একটু চমক লাগে।"

উজ্জয়িনী আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করল, "এ কি কানুর মতো কথা? রসিকরাজ কি অন্য কথা খুঁজে পায় না?"

তার কানু যখন তার গণ্ডে একটি চুম্বন করল তখন তার মনে হলো তার দেহের রক্তকে আগুন ধরল। চকিতে সব পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে। অসম্ভব ভয়ে তার হৃৎপিণ্ড বুঝি বা স্তব্ধ হয়ে যায়।

তারপর কানু যেই তার কাপড়ে হাত দিল অমনি সে এক লম্ফে উঠে বসল। ইচ্ছার চালনায় নয়, বুদ্ধির চালনায় নয়, প্রকৃতির ইঙ্গিতে। যে প্রকৃতি তাকে মিলনোন্মুখ করেছিল সেই প্রকৃতি তাকে সহসা বিমুখ করল। সে কাপড় ঠিক করতে লাগল, সমনোযোগে।

ওসব মেয়েলি ঢং অনেক জানা আছে। এই ভেবে তার কানু তাকে টান দিয়ে বুকের উপর পড়ল। আচমকা অমন একটা টান কারই বা ভাল লাগে! উজ্জয়িনীর রোখ চাপল। সে কিছুতেই বশ মানবে না যদি বশ মানানোর রীতি হয় বলাৎকার।

ধস্তাধস্তির পর আগন্তুক বলল, "আচ্ছা, আজ তা হলে থাক। কাল হবে।"

উজ্জয়িনী আপন মনে বলল, "এই কি কানু! আলাপ করতে জানে না, মন পেতে জানে না, মান অভিমান মানে না। দস্তুরমতো গোঁয়ার গোবিন্দ!"

অন্ধকার থাকতে আগন্তুক বিদায়ের প্রস্তাব করল। উজ্জয়িনী হা-হুতাশ করল না, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল না। করল প্রণাম। মনে মনে বলল, "তুমি তো অন্তর্যামী। অপরাধ মার্জনা কোরো।"

কানুর অস্পষ্ট মূর্তি অন্ধকারে মিশে গেলে উজ্জয়িনী ঠাওরাল কানু অন্তর্ধান করল। অনুশোচনায় তার অন্তরাত্মা আকুল, অনিদ্রায় তার শরীর কাতর। তার প্রিয়তমকে ফিরিয়ে দিয়েছে, এই দুঃখের সান্ত্বনা কই! তিনি তো নিজগুণে ক্ষমা করবেন, কিন্তু সে কেমন করে ক্ষমার্হ হবে। ধিক ধিক ধিক তাকে। শত ধিক। শত ধিক। ধিক্কারে

ধিক্কারে উজ্জয়িনী আপনাকে উৎপীড়ন করতে থাকল। এক মূহূর্ত অব্যাহতি দিল না।

ভোরের আলোর সঙ্গে চমৎকারের আবির্ভাব হল। "ওলো সই, ওলো সই। মিষ্টি কই, বকশিশ কই?" এই বলে হাত পেতে রইল। তার মুখে সে কী হাসি!

উজ্জয়িনীর মাথার ঠিক ছিল না। সে বুঝতে পারছিল না। চমৎকার বলল, "নেকী সাজলে আমি ছাড়ব কেন? আমার পাওনা আমাকে দিতে হবে।"

৭

পরদিন সন্ধ্যা হতে না হতে উজ্জয়িনীর নিদ্রা এল। গাঢ় নিদ্রা।

স্বপ্ন দেখল কানু তার বস্ত্র হরণ করছে, অমনি তার গায়ে কাঁটা দিল। তার ঘুম গেল ভেঙে। চোখ মেলে সে যা দেখল তা বিশ্বাস করতে তার সময় লাগল। দেখল তার বসন নেই, কে একজন তার অন্তর্বাস খুলতে বৃথা চেষ্টা করছে। অন্তর্বাস পরা তার আশৈশব অভ্যাস, অনুচ্ছেদনীয় সংস্কার। আর তার অন্তর্বাস খোলার কৌশল অন্যের অজানা।

ঢাকা খুললে স্প্রিং যেমন লাফ দিয়ে আওয়াজ করে ওঠে, উজ্জয়িনী দণ্ডায়মান হয়ে চিৎকার করল, "আমার কাপড়?" কাপড় তার পায়ের কাছেই ছিল, মহামূল্য নিধির মতো সেটিকে তুলে নিয়ে দৌড় দিল গাছের আড়ালে। তার বোধ হচ্ছিল তার হৃৎপিণ্ডের প্রহারে তার বুক ফেটে যাবে। উঃ কী গোঁয়ার!

এদিকে তার কানু ভাবছিল, নতুন বকনা। চমকাবেই তো। পায়ের শব্দ শুনেই ভাগবে, বেড়া পাঁচিল ভাঙবে, উর্ধ্বশ্বাসে ছুটবে, থমকে থেমে কান খাড়া করবে, উল্টা দিকে ফিরবে, কাছে এলে আবার ফেরার! আর সম্মতি পাওয়া কি মুখের কথা! অধ্যবসায়, দারুণ অধ্যবসায়, নাছোড় অধ্যবসায়। এ ছাড়া উপায় নেই।

উজ্জয়িনী একজায়গায় দাঁড়িয়ে আপাদমস্তক কাঁপছিল আর মনে মনে বলছিল, "কানু, তুমি কি জান না আমি সব বিলিয়ে দিয়েছি, কিছু হাতে রাখিনি, সব বিলিয়ে দিয়েছি তোমাকেই। তবে কেন এ দস্যুপনা, এ অত্যাচার! তুমি প্রভু আমি দাসী। তা বলে দাসীরও কি সম্ভ্রম নেই, অপমানবোধ নেই?"

তার মনে পড়ছিল বৈষ্ণব সাধনার শেষ কথা লজ্জা ত্যাগ, বিকার ত্যাগ। কুকুরের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ মুখে নিতে যেদিন বাধবে না সেদিন হবে সিদ্ধিলাভ! বসনের শাসন যেদিন উপেক্ষা করা সম্ভব হবে সেদিন শমনের ভয় থাকবে না।

হয়তো সে ফিরে এসে কানুর পায়ে আত্মসমর্পণই করত। বলত, "আমি তোমার, আমি আমার নই। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। হে আমার মরণ, তোমার সঙ্গে সন্ধিশর্ত বৃথা। আমি অসম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়ে অস্ত্র সমর্পণ করছি। নারীর চরম অস্ত্র—তার লজ্জা—এই রাখলুম তোমার চরণে।" এই বলে তার বসন ও অন্তর্বাস অপসারণ করত।

এমন সময় তার পিছন দিক থেকে এসে তাকে শূন্যে চিৎ করে শুইয়ে দুই বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে তুলে নিয়ে চলল সেই লোকটা। চলল সে যেখান থেকে উঠে এসেছিল সেইখানে।

উজ্জয়িনী হতবুদ্ধি হয়েছিল। কিন্তু সংজ্ঞা হারায়নি। সে এক

প্রকার পুলক অনুভব করছিল। পরাভবের পুলক, সর্বহারা হলে লক্ষপতির যে পুলক উপজাত হয়, বিপুল অবমাননার পুলক।

কানু যেই হোক খাঁটি বিলাতী ব্লুমার্স তার সাত জন্মে দেখে নি। যত টানাটানি করে সেটা কিছুতেই স্খলিত হয় না। কামান্ধ হয়ে সেটাকে দুই হাতে ফাড়তে যায়, কিন্তু জানে না যে সেটার প্রত্যেক প্রান্ত রবার দিয়ে মোড়া। ছিঁড়তে চাইলে লম্বা হয়ে যায়, ছেড়ে দিলে ফট করে ফিরে আঁট হয়।

উজ্জয়িনী বাধাও দিল না, সাহায্যও করল না। তার প্রকৃতি তার কানে কানে বলল, "অসহযোগ।" প্রকৃতির নির্বন্ধে তার প্রতি অঙ্গ পাষাণ হয়ে গেল। তার ইচ্ছাশক্তি নিষ্ক্রিয় হলো, চেতনা হলো নিস্তেজ।

তার দুই চোখ দুই নিরাসক্ত সাক্ষীর মতো নিরপেক্ষ রইল। যেন তার নয়, আকাশের চোখ। না করল প্রতিবাদ, না দিল প্ররোচনা। দু ফোঁটা অশ্রুও ঝরাবে সে ক্ষমতা নেই।

তার নিঃশ্বাস পড়ল কি পড়ল না। কে যেন তার ওষ্ঠাধরে কুলুপ লাগিয়ে দিল!

কামার্ত নর তার দশা দেখে নিরস্ত হল না, গ্রাহ্য করল না তাকে। তার অস্তিত্ব ভুলে তার অন্তর্বাসের সঙ্গে কুস্তি করতে থাকল, যেন সেটা একটা জড় পদার্থ নয়, একজন সজীব মল্ল। কোনোমতেই কায়দা না করতে পেরে অবশেষে ইতর ভাষায় গালাগাল শুরু করল। বলল, "খুলবে না শালার বেটা শালা পায়জামা? শালা হাত দিয়ে না খোলে তো দাঁত দিয়ে খুলবে।" এই বলে তাতে দাঁত বসিয়ে দিল।

অকস্মাৎ উজ্জয়িনীর খেয়াল হলো এ কখনো কানু হতে পারে না, এ কোনো রাক্ষস, কানুর ছদ্মবেশে এসেছে। তৎক্ষণাৎ তার শরীরে

উদ্যম ফিরে এল। প্রবল উদ্যমে সে উঠে বসল, লোকটাকে দুই হাতে ধাক্কা দিয়ে হতভম্ব করে দিল। তার পর কাপড়ের জন্তে দেরি না করে তেমনি অবস্থায় দৌড়াতে দ্বিধা করল না। কাছেই ছিল জঙ্গল। হয়তো তাতে সাপ আছে বাঘ আছে ভূত আছে, তবু মানুষের মতো ভয়ঙ্কর কিছু নেই। লতাপাতার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে উজ্জয়িনী কান খাড়া করে থাকল। এই বিরাট বিশ্বে প্রতি তারা তার বন্ধু, একাকিত্বের ভয় মিথ্যা। ভয় কেবল মানুষকে।

লোকটা তাকে ঢুঁড়তে বেরিয়ে ক্রমে ক্রমে সেই জঙ্গলের দিকে এগোল। শিকার পালিয়েছে দেখলে শিকারীর যে বিমোহ হয় তারও তাই। সে ভাবছে, যাবে কতদূর! সামনের ঝোপে রয়েছে, ধরলেই ধরা দেবে।

উজ্জয়িনী নড়চড় করে ঠিকানা ফাঁস করল না। যা হবার হবে, থাকি এইখানে দাঁড়িয়ে। এই মনে করে যথাস্থানে নিঃসাড় রইল। লোকটা তার পাশ ঘেঁষে চলে গেল। তাকে চিনতে পারল না।

যখন মালুম হল যে লোকটা জঙ্গলের ভিতর পথ হারিয়েছে তখন উজ্জয়িনী কাঁটাগাছের আঁচড় গায়ে কাঁটা পায়ে সেই গাছতলায় ফিরল তার কাপড়ের খোঁজে। কাপড় যেমনকে তেমন পড়েছিল। ছোঁ মেরে তাকে বুকে তুলে নিয়ে উজ্জয়িনী অনেকক্ষণ ধরে আদর করল। বসন যে নারীর কতখানি এর আগে কি তা জানত!

কাপড় পরতে পরতে পূর্ব আকাশ ফরসা হয়ে এল। ডেকে উঠল বটগাছের বহু আশ্রিত পাখী! জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে উজ্জয়িনী লক্ষ্য করল একটা লোক তার অভিমুখে আসছে, বোধ হয় তাকে দেখতে পেয়েছে। তার কৌতূহল হলো তার পলায়নবাসনায়

চেয়ে বলবান। সে বেশ করে নিরীক্ষণ করল। কে এ? কানু যে নয় তার সন্দেহ নেই। তবু কে?

ও হরি! একে যে কতবার দেখেছি গোবিনজীর মন্দিরে কীর্তনের অদূরে। নামধাম জানিনে, কিন্তু কয়েকবার একে আমার দিকে একদৃষ্টে চাইতে দেখেছি যে। কে তখন ভেবেছিল যে এই লোকটা··· ওহ্। নারীর এর বাড়া অপমান আর কী হতে পারে!

না। লোকটা উজ্জয়িনীর অভিমুখে আসছিল না। এটা তার যাবার রাস্তা। নিশান্তের আলো-আঁধারিতে গাছের সঙ্গে লেপটে থেকে উজ্জয়িনী আত্মগোপন করল। লোকটা এক মিনিট থামল। কুড়িয়ে নিল তার বাঁশিটা। সেটাতে ফুঁ দিতে দিতে পূব মুখে অদৃশ্য হয়ে গেল। এক মাথা বাবরি চুল, কানের কাছে গোলাকার গুচ্ছ। গোঁপদাড়ি নেই। গলায় সোনার হার। পুরাতন লম্পটের মতো বেহায়া ও বেপরোয়া।

সংকেতবিহারীর মন্দিরে গিয়ে উজ্জয়িনী মাথা খুঁড়ল। "কানু, এ কী করলে! তোমার ভোগ্যা আমি, আমাকে ঐ লম্পটটার দ্বারা অশুচি হতে দিলে। এ কী পরীক্ষা, কানু? তোমার জন্যে সব ছেড়ে যে এল তাকে তুমি আপনি না নিতে পারতে, কিন্তু পরের কাছে বিলিয়ে দেবার অর্থ কী?"

ছি ছি ছি ছি। রাত্রের ঘটনা তার যতই মনে পড়ে ততই অনুতাপে লজ্জায় শরীর শিরশিরিয়ে ওঠে। বিশ্বাস হয় না যে, কেউ তার সর্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছিল, আকস্মিক কারণে তার বিজাতীয় অন্তর্বাসের কল্যাণে সে রক্ষা পায়। আর একটু হলে সে জন্মের মতো নষ্ট হত। উঃ!

"কানু, আমি আত্মহত্যা করতুম যদি জানতুম যে ও লোকটাকে আমি ও লোক বলে প্রশ্রয় দিয়েছি। আমার ধারণা ছিল ও তুমি। কেন আমাকে তুমি এ সঙ্কটে ফেললে? শেষ পর্যন্ত ত্রাণ করেছ বটে, তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ, কিন্তু আমার এ অশুচি দেহ কি তোমার গ্রহণযোগ্য হবে!"

একটা তীব্র প্রতিশোধস্পৃহা সেই লোকটার প্রতি ধাবিত হতে থাকল! কানুর ছবি ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

# স্বপ্নের ফলন

১

উজ্জয়িনী বৃন্দাবনে ফিরল। কিন্তু আর গেল না গোবিন্দজীর মন্দিরে, আর গাইল না কীর্তন। কী দরকার বল? কানুকে এই অশুচি দেহ অর্পণ করা যায় না। যমুনায় সহস্রবার স্নান করলেও ধৌত হবে না এ গ্লানি। প্রসাধনের দ্বারা চন্দ্রমার মতো উজ্জ্বল হলেও মোচিত হবে না এ কলঙ্ক। জীবন আছে, আশা নেই। যৌবন আছে, ভাগ্য নেই। আত্মহত্যা করলে মিটে যায়, অথচ এমন কোনো পাপ করেনি যার প্রতিক্রিয়ায় ঐ মহাপাপটা করবে।

"কানু," উজ্জয়িনী প্রতিদিন নালিশ করে, "বল বল বল আমাকে, কেন আমার এ দশা করলে? আমি তো জ্ঞাতসারে কোনো পাপ করিনি। তোমা হতে বঞ্চিত হলে জানতুম হয়তো আমার যোগ্যতা নেই। কিন্তু প্রবঞ্চিত হলুম কেন, কোন্ অপরাধে? ছি ছি ছি। কী অপমান করালে, কানু! কাকে দিয়ে করালে! সাজা দিতে হলে কি এমনি করে দিতে হয়! এর পর আমাকে বাঁচতে বল? চাইনে বাঁচতে। এবার একটু দয়া কর, পাঠিয়ে দাও মরণকে।"

অত লোকের মরণ হয়, তার হয় না। ওগো মরণ, কেন তোমার এ পক্ষপাত? যে মরতে পারলে বাঁচে তাকে ছেড়ে অন্যের উপর কেন তোমার নজর!

উজ্জয়িনীর মনে হয়, আছে। অর্থ আছে। তার বেঁচে থাকার

অর্থ আছে। সেই জানোয়ারটাকে শিক্ষা না দিলে তার নিজের মরণ নেই। প্রতিশোধ। ভয়ানক প্রতিশোধ। যা খুশি ভাবে ভাবুক কানু, হোক যা হবার তাই। যার ইহজন্ম ব্যর্থ তার পরজন্মের সুখে কাজ কী! শিক্ষা দিতে হবে ঐ জন্তুটাকে, নিতে হবে প্রতিশোধ। উজ্জয়িনী দাঁতে দাঁত চাপে। দ্রৌপদীর মতো জ্বলতে থাকে তার নেত্র। বেণী থাকলে বেণী বাঁধত না। আছে ছোট ছোট অসমান চুল, তাতে চিরুণি পড়ে না।

বনমালীবাবুর বাড়ীর বাইরে কোথাও যায় না উজ্জয়িনী। সেইখানেই প্রসাদ আনিয়ে খায়, কোনো কোনো বেলা খায়ই না। ভাবে, কেমন করে সেই লোকটার উপর শোধ তুলবে। জানে, সেই লোকটা এখনো তার প্রত্যাশায় আছে। আবার পাঠিয়েছিল চমৎ-কারকে। চমৎকারকে দেখে উজ্জয়িনীর বড় আপসোস হল, ঘরে কাঁচি নেই। "আরে বস বস, সই। তোমার কানদুটোর উপর আমার লোভ আছে, তুমিই বাধা দিয়েছিলে। কচ করে কেটে নেব, এক সেকেণ্ড লাগবে না, টের পাবে না যে তোমার কান দুটো নেই।... উঠলে যে বড়। কাজ আছে? আর একটি সই পেয়েছ বুঝি!"

সত্যিই আনিয়ে রাখল শানিয়ে রাখল একখানা কাঁচি। ঐ পাপিষ্ঠা কুট্টনীটার কর্ণচ্ছেদ না করলে আরো কত মেয়ের সর্বনাশ ঘটাবে তার ইয়ত্তা নেই। না জানি কত মেয়ে ঐ শিয়ালীর প্রবর্তনায় শতরাজের খপ্পরে পৌঁছেছে, উজ্জয়িনীর মতো প্রত্যাবর্তন করেনি, মরণাধিক মরণ মরেছে।

চমৎকার আর সে মুখো হলো না, কাঁচিখানাতে জং ধরতে চলল।

শশীবালা ও বিমলা জিজ্ঞাসা করে, যারা তাকে চিনত তারা

সবাই জিজ্ঞাসা করে, "কী হয়েছে, অনু? কোথাও যাও না যে? কীর্তনের কী হলো হঠাৎ?"

উজ্জয়িনী বলে, "আমাকে আমার প্রভুর আবশ্যক নেই। আমাকে তিনি প্রকারান্তরে জবাব দিয়েছেন।"

ওরা যদি এর এক বর্ণ বুঝত। ক্ষেপা মেয়ে কী যে বলে।

যামিনী দেবী পীড়াপীড়ি করেন। হোক একটা গান, অনেক দিন রাসবিহারী গান শোনেন নি। রাসবিহারীর কুঞ্জে বাস করে তাঁকে গীতিসুধার দিক থেকে অভুক্ত রাখা কি সঙ্গত!

উজ্জয়িনী ঘাড় নাড়ে। "না, পিসীমা। আমি জানি তাঁর আবশ্যক নেই আমার গান।"

মনে মনে বলে গান কি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন? গান যে দেহেরই ফসল। কণ্ঠ তার বৃন্ত। দেহ যদি অশুদ্ধ হয়ে থাকে তবে গানও হবে অশুদ্ধ। শিক্ষার অভাবেও গান হয়, কিন্তু শুদ্ধির অভাবে হয় না। যা হয় তা বিষয়ী মানুষের রোচক হতে পারে, কিন্তু দেবতার তাতে অরুচি।

দিন দিন তার এই প্রতীতি দৃঢ় হতে থাকল যে কানু তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সে তার দানশক্তির সীমান্ত অবধি গেছে, লজ্জা পর্যন্ত বিসর্জন করেছে, তবু তার প্রতি দেবতা বিমুখ। তার না রইল কুল না মিলল শ্যাম। বাকী থাকে মরণ। মরণের আগে মারণ। সেই দুর্বৃত্তের শাস্তিবিধান। তা যে কেমন করে সম্ভব উজ্জয়িনীর ধারণা ছিল না। লোকটার নাগাল পাওয়া কঠিন কথা নয়। এখনো সে লোক দূতী পাঠায়। পাঠায় নানা ছলে মিলনের প্রস্তাব। সেদিন একটা মেয়ে এসে বলছিল, "ঝুলন দেখতে আসছ তো? এস। এক এক করে প্রত্যেক মন্দিরে ও কুঞ্জে নিয়ে যাব।"

লোকটার প্রস্তাব শুনলেই ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু ও যে দুর্দ্ধর্ষ বলশালী। ওকে একখানা কাঁচি দিয়ে সাজা দেওয়া যায় না, যদি না ওর দুই চোখ বিঁধে অন্ধ করে দেওয়া হয়। তা করতে গেলেও অনেক হীনতার ভিতর দিয়ে যেতে হয়, ওর কোলে শুয়ে ওর বিশ্বাস অর্জন করতে হয়। দূর থেকে আঘাত করার কোনো কৌশল আছে কি না উজ্জয়িনী চিন্তা করে। ঢিল ছোঁড়া কোনো কাজের নয়। গুলি ছোঁড়া তো প্রশ্নের বাইরে।

কানু আমাকে চায় না। বেশ, কানুকেও আমি চাইনে। এক দিনে নয়, দিনে দিনে এই অভিমান উজ্জয়িনীকে অধিকার করল। যেমন করেছিল একদা বাদল সম্পর্কে। বাদল আমাকে চায় না। বেশ, বাদলকেও আমি আমি চাইনে।

কানু আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আমাকে নিয়ে এমন পরীক্ষা করেছে যার দরুন আমার বিনা দোষে আমার দেহ হয়েছে অস্পৃশ্য, অস্পর্শ্য। কানু যে আমাকে নেবে না, ছোঁবে না, এই কথাই তো সে প্রকারান্তরে জানাল। স্বামী যেন সতী স্ত্রীকে বলল, ভ্রষ্ট হও, অন্তত কলঙ্ক নাও, তা হলেই তোমাকে বর্জন করে দ্বিতীয় 'বিবাহ করতে পারি। কাপুরুষ! কাপুরুষ! চাইনে আমি এমন কাপুরুষকে। কলঙ্ক যখন নিতেই হল তখন ভালো করেই নেব। যাব আমি সুশীলাবতীর বাড়ী। তিনি আমার দিদি। আমারও যে কলঙ্ক তাঁরও সেই। আমরা গৃহস্থের মেয়েরা সুরক্ষিত থাকি বলে আমাদের মহা গর্ব আমরা সতী, আমরা শুচি। কেউ যদি পড়ল ধর্ষকের হাতে, কেউ যদি বিক্রীত হলো বেশ্যালয়ে, কেউ যদি নিয়তির নির্দেশে বেশ্যার গর্ভে জন্মাল, আমরা তাকে চরম ঘৃণা করি, অত ঘৃণা খুনের আসামীকেও করিনে। তাদের অবস্থার উপর কি

তাদের হাত ছিল? তাদের ইচ্ছায় কি তাদের অবস্থা অন্তরূপ হতে পারত?

মাস কয়েকের মধ্যে উজ্জয়িনীর পুঁজি যাবে ফুরিয়ে। তখন বৃন্দাবনে বাস করতে হলে ভিক্ষা ছাড়া গতি নেই। কীর্তন গেয়ে ভিক্ষা। অথচ কীর্তনের মতো মেকি জিনিস আর কী আছে! না, না। সে যাবে তার সুশীলাদির কাছে। বলবে, আমি বইয়ের চশমা চোখে দিয়ে জগৎকে দেখছিলুম, তাই সে দেখায় গলদ ছিল। এবার আমি দেখতে চাই খোলা চোখে জীবনকে। আমাকে তুমি শিখিয়ে দাও খাঁটি গানের খাঁটি সুর। বিশুদ্ধ মার্গসঙ্গীত। যা মানুষের বাসনাকামনার রাগে রঙিন নয়, আবেশের রসে চটচটে নয়, আবেগের তাপে ফেনিল নয়। পরিণত সাধনার নিষ্কাম নিরাসক্তি যাকে জীবলোকের ঊর্ধ্বে সুরলোকে উত্তীর্ণ করেছে। এত দিনে জানলুম কেন তুমি কাশীবাসী হয়েছ। তোমার সঙ্গীতের অধিষ্ঠাতা শিব। তিনি কামী জনের ইষ্টদেব নন। কামকে তিনি ভস্মসাৎ করেছেন। তিনি তুষারধবল, তিনি তুহিনশীতল।

আর এই কানুটা! আমি চাইনে একে। চাইনে এর কীর্তন। এর ধামে বাস করছি বটে, কিন্তু এর জন্যে নয়। যাকে দিয়ে এ আমার অপমান ঘটিয়েছে, আমার ইহজন্মের অসমাপ্তি, সেই দুরাত্মার দণ্ডবিধান করে আমি যাব দিদির বাড়ী কলঙ্কের ষোলকলা সম্পূর্ণ করতে। সবাই বলবে বেশ্যা। আমি বলব বেশ।

বাবা বিশ্বনাথের পায়ে শরণ নিতে উজ্জয়িনী মনে মনে প্রস্তুত হতে লাগল। তিনিই যোগানন্দ। সে তার বাবার হাতে গড়া। বাবার মতো কেউ তাকে ভালোবাসেনি। সেই বাবাকে ত্যাগ করে যেদিন সে শ্বশুরবাড়ী এল সেই দিন থেকে তার দুর্দশার সূত্রপাত।

নিশ্চিতকে ফেলে যে জন অনিশ্চিতের পানে ধায় বিষ্ণুশর্মা তাকে উপহাস করেছেন। হিতোপদেশের মূল সূত্র মেনে চললে সে কি আজ স্বামীহারা পিতৃহারা কানুহারা ও দিশাহারা হত! যাকে যাকে চেয়েছিল তাকে তাকে পেল না। যাঁকে অগ্রাহ্য করল তিনি গেলেন মহাশূন্যে বিলীন হয়ে। বাবা, বাবা, বাবা। উজ্জয়িনীর পিতৃশোক উথলে উঠল। এত দিন কানুর প্রেম তাকে দাবিয়ে রেখেছিল, ঢাকা আজ ফাঁকা।

সেই যোগানন্দের প্রতিরূপক কাশী বিশ্বনাথ। তাঁরই চরণে উজ্জয়িনী শরণার্থিনী হবে। এই বৃন্দাবন তার বিষ। বিধবা, আর বিধবা, আর বিধবা। কেউ লোলচর্ম, কেউ লোলজিহ্বা, কেউ শিথিলচরিত্র। কানুকে পতি ভাবা নিষেধ। তাই উপপতিভাবে ভজন করেন কানুকে, কিন্তু নির্জনে পেলে কানুর সুলভ সংস্করণকে নিয়ে সন্তুষ্ট। পতি-ভাবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে উপপতিভাব—এই যদি হয় বৈষ্ণবতত্ত্ব তবে উপপতিভাবের মন্দির ও বাহির আছে। মন্দিরে কানুর বিগ্রহ, বাইরে কানুর প্রতিনিধি।

"পিসীমা," উজ্জয়িনী যামিনী দেবীকে বলে, "বাঁদর পুষলে পোষ মানে?"

"কেন মানবে না?" যামিনী দেবী বললেন, "পুষবি নাকি?"

"আচ্ছা, যদি হুকুম করি একজনকে কামড়ে দাও তা হলে কামড়ায়?"

"কী জানি বাপু। তা জানিনে।" যামিনী দেবী বিব্রত হয়ে বলেন, "অমন হুকুম করতে চায় কে? এ যে বৃন্দাবন। এখানে জীবহিংসা নেই।"

"ও!" উজ্জয়িনী জিব কাটল।

সুরধুনীর সঙ্গে উজ্জয়িনীর তেমন আলাপ নেই। তার ধারণা

তিনি অহঙ্কারী। চুপ করে বাসায় বসে থাকতে ভালো লাগে না। সুরধুনীর ঘরে গিয়ে সে বেচারির পড়াশুনায় ব্যাঘাত ঘটায়। বলে, "কী এত পড়ছেন? পড়ে কী লাভ? কাগজ, আর কাগজ, আর কাগজ। তা ছাড়া আর কিছু? কালি? এই তো!"

সুরধুনী ভেবাচাকা খায়। মৃদু হাসে। বৈষ্ণবোচিত বিনয়বশত আপত্তি জানায় না!

"দেখুন," উজ্জয়িনী বিজ্ঞের মত গম্ভীর ভঙ্গীতে বলে, "একে তো বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ গ্রন্থে বহু দূর। তারপর বিশ্বাসে মেলে বলে মনে হয় না। অনেকে যেমন অজ্ঞেয়বাদী আমি তেমনি অপ্রাপ্যবাদী।"

সুরধুনী উজ্জয়িনীর ভুল সংশোধন করে, "তর্কে বহু দূর।"

উজ্জয়িনী আমোদ পায়। ভাবে, কৃপার পাত্র। পুঁথির ঠিক ভুল নিয়ে মত্ত। জীবনের ঠিক ভুল একবারও খতায় না।

কিন্তু সুরধুনীর ওকথা বলবার আসল উদ্দেশ্য তর্ক করতে না চাওয়া। অত্যন্ত স্বল্পভাষিণী নারী। তাই নারীজাতির চক্ষে অহঙ্কারী।

২

এক দিন সকালবেলা উজ্জয়িনী দেখল রাস্তা দিয়ে অগণ্য লোক ছুটেছে। কী হলো, কী হলো, কোথাও আগুন লাগল নাকি? শশীবালা বলল, "গিন্নীগিরি পথ ছাড়। আমি যাব।" বিবসনা বলল "আমিও।" যামিনী দেবী তাঁর স্বামীকে বললেন, "তুমিও যাও না গো, কী হলো খোঁজ নাও।" এমন কি গ্রন্থকীট সুরধুনীও জানালার ধারে এসে দাঁড়াল।

উজ্জয়িনীর খেয়াল হলো জনসাগরে ঝাঁপ দিয়ে ঢেউ খেতে। সাধারণ উত্তেজনার ভাগ নিতে। কৌতূহলও ছিল কী ঘটল জানবার।

লোকের ভিড় তাকে ঠেলতে ঠেলতে যেখানে হাজির করে দিল সেখান থেকে দৃশ্যটা বেশ গোচর হয়। একটা বুলডগ একটা বাঁদরকে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছে। বাঁদরের স্বজাতি এবং ডারুইনের মতে বাঁদরের সমজাতির বংশধর এদের কেউ বাঁদুরে ভাষায় ও কেউ মানুষী ভাষায় চিৎকার করে বলছে, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে। বুলডগ কি ছাড়ে! বোধ হয় এই প্রথম বাঁদর দেখল। প্রথম দর্শনে প্রেম। বুলডগের প্রেম মানুষ প্রেমের চেয়ে বড়। তাকে আঁচড় দিয়ে কামড় দিয়ে কাহিল করতে পারছে না সমবেত বানরবর্গ। লাঠির খোঁচা, চিমটের চিমটি ইত্যাদি সহযোগে নরগণও তাকে উত্ত্যক্ত করছে, তবে চাচাজনোচিত দূরত্ব বজায় রেখে, আপনা বাঁচিয়ে। জাঁতায় আটকে থাকা জন্তুর মত বিশ্রী চেঁচাচ্ছে বুলডগের মুখের বাঁদরটা।

উজ্জয়িনী এগিয়ে গেল, প্রধানত বুলডগটারই খাতিরে। তাকে রক্ষা করতে হবে। এবং সম্ভব হলে বাঁদরটাকেও। এগিয়ে যাওয়া তার পক্ষে কঠিন হলো না। কেননা আর কেউ ভয়ে এগোতে চায় না। লোক পিছু হটতে পেলে খুশি হয়। সব চাচা কিনা। তা বলে একেবারে স্থানত্যাগ করতে নারাজ। দেখা যাক না মজা। এক দিকে একা বুলডগ, অপর দিকে এক পাল বাঁদর। কলিযুগের লঙ্কাকাণ্ড। বুলডগটা রাক্ষুসে জানোয়ার। কুম্ভকর্ণের ভায়রা ভাই।

উজ্জয়িনী এগিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় আরো দুজনকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। তাদের এক জন সাহেবী স্বরে বলছে,

"হট যাও, হট যাও।" আর দুই হাতে রাস্তা করে নিচ্ছে। অন্য জন বিনয়নমস্কারপূর্বক পথ ভিক্ষা করে পূর্বোক্ত জনের অনুসরণ করছে।

তিনজনের মধ্যে আগে পৌছল উজ্জয়িনীই। বুলডগের পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে একটি আঙুল নিজের ঠোঁটে ছুঁইয়ে উচ্চারণ করল, "শ্‌শ্‌শ্‌। শ্‌শ্‌শ্‌। শ্‌শ্‌শ্‌।"

বুলডগের মালিক পিঠ চাপড়ে দিয়ে ইংরেজিতে বলতে লাগল, "কোয়ায়েট, ওল্ড ফেলো। কোয়ায়েট, ওল্ড্‌ ফেলো।" তারপর বাঁদরটার গায়ে হাত রেখে বলল, "লীভ হিম টু মি, লীভ হিম।"

বুলডগটি আজ্ঞাবহ। বাঁদরটাকে ছেড়ে দিয়ে কাটা লেজ নাড়তে সুরু করল। বিভূতি বাঁদরটাকে একটা লাথি মেরে তার সম্প্রদায়ের সামিল করে দিল। তারপর আর একবার কুকুরের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, "থ্যাঙ্ক ইই, ড্রামণ্ড। থ্যাঙ্ক ইউ, ল্যাড।"

পাশেই একজন মহিলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে আবিষ্কার করে বিভূতি যারপরনাই লজ্জিত হল। এতক্ষণ তাঁর দিকে মনোযোগ দেয়নি। এবার তাঁর দিকে ফিরে বলল, "এক্‌সকিউ—। আরে এ যে উজ্জয়িনী।··· উজ্জয়িনী না ?"

উজ্জয়িনী তাকে চিনতে পারছিল না। কী করে চিনবে? সে কি সেই বিভূতিদা আছে? কাজের লোক হয়েছে। লায়েক ব্যক্তি। তার কত বড় দায়িত্ব। কত প্রতিপত্তি। প্রাইভেট ডিটেকটিভ যে।

"আমি বিভূতি। বহরমপুরের বিভূতিদা। সম্প্রতি বিলেত থেকে আসছি। এবার চিনেছ ?"

উজ্জয়িনী চিনতে পেরে বলল, "চিনেছি।" সে কেমন সঙ্কোচ বোধ করছিল। তার এই বেশ, এই দেশে বাস। না জানি বিভূতিদা কী মনে করছেন!

সুধী সেই বাঁদরটির তত্ত্ব নিচ্ছিল। সামান্য জখম। সেরে যাবে। লোকজনকে আশ্বাস দিয়ে বলছিল, মরবে না, মরণের আশঙ্কা নেই। ওদের বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে উজ্জয়িনীর সামনে এসে বলল, "আমি সুধীদা!"

উজ্জয়িনী তার বিস্ফারিত নয়ন সুধীর প্রতি নিবদ্ধ করল। আপনি রইল নির্বাক। সুধীদা। বাদল। চিঠি। এক নিমেষে কত না স্মৃতি তার মনকে ভারাক্রান্ত করল।

"এস বিভূতি, ভিড়ের মধ্যে বেশিক্ষণ থাকা যায় না। উজ্জয়িনী, তুমিও এস।"

উজ্জয়িনী মুগ্ধের মতো তাদের সঙ্গে চলল। কুকুরটার রক্ত দেখতে সেটার পিছু পিছু চলল অনেক ছেলেছোকরা। বিভূতি থেকে থেকে আক্ষেপ করছিল, "দেখেছ সুধীদা? বেটারা খুঁচিয়ে ড্রামির গায়ে ঘা করে দিয়েছে। ইস্। বেটারা চোয়াড়।"

সুধী বলল, "চুপ, চুপ, চুপ। ওরা বাংলা বোঝে।"

ধর্মশালায় ড্রামিকে নিয়ে মুশকিল। ওকে ঢুকতে দেয় না। গাছতলায় ওকে বেঁধে রাখতে হয়। কখন এক সময় বাঁধন ছিঁড়ে ফেরার হয়েছে, বাঁদর দেখে এই কাণ্ডটি বাধিয়েছে। বিভূতি যখন উজ্জয়িনীকে তার দুঃখের কথা জানাল উজ্জয়িনী ফস্ করে বলল, "দিন না আমাকে ওর ভার। আমি ওকে আমার বাসায় রাখব। ওর কিছু চিকিৎসার দরকার।"

"চল না, তোমার বাসা দেখে আসি।" প্রস্তাব করল বিভূতি

"সে আর দেখবার মতো কী!" উজ্জয়িনী সসঙ্কোচে বলল।

সুধী মধ্যস্থ হয়ে বলল, "কাজ কী ওজিনিস দেখে? যাকে দেখতে বেরিয়েছিলুম তার সঙ্গে যখন দেখা হলো।" মুচকি হেসে মন্তব্য করল, "সাবাস ডিটেকটিভ।"

বিভূতি সগর্বে ও সকপটবিনয়ে বলল, "আমার চেয়ে আমার বুলডগেরই কেরামত বেশি। সে জানত কান টানলে যেমন মাথা আসে বাঁদরকে পাকড়ালে তেমনি বৃন্দাবনশুদ্ধ মানুষ আসে। বৃন্দাবনে থাকলে উজ্জয়িনীকেও আসতে হবে, তা আমার ড্রামি জানত।"

ধর্মশালায় নিজেরাই যদি কুকুর আগলিয়ে বসে তবে বেড়াবে কখন? অথচ চৌকিদারের জিম্মায় সেটাকে গছিয়ে দিয়ে এই বিপদ। বাঁদরটা মরলে তো বৃন্দাবনের লোক কুকুরটাকে লিঞ্চ করত। কুকুরের মালিককেও আস্ত রাখত না। বিভূতি ভেবে বলল, "তোমার বাসায় একে বন্দী করতে পারা যায় কি না একবার তদারক করতে দোষ কি?"

উজ্জয়িনী ঢোক গিলে বলল, "আমি তো বলছি, দিন আমার উপর ওর দায়িত্ব। মনে করুন, ও আমারই কুকুর। মনে করুন, আমি এত দিন ওরই খোঁজে ছিলুম, ওরই মতো নাছোড়বান্দা জন্তুর। যাকে ধরবে তাকে কামড়াবে, প্রাণ গেলেও ঢিলে দেবে না। দিন রাত আমি ওর কাছে কাছে থাকব। বিশ্বাস করুন, বিভূতিদা।"

বিভূতি গলে গিয়ে বলল, "তোমাকে বিশ্বাস করব না তো কাকে করব, বেবী! মনে পড়ে! সেই হারাধন রজক?" হারাধনের উল্লেখ এক্ষেত্রে অবান্তর। কিন্তু একটা উদাহরণ দিতে হবে তো! হারাধনকেই বিভূতির মন হাতের কাছে পেল। "সেই যে বেটা," বিভূতি বানিয়ে

বলল, "আমার চাদর তোমাদের বাড়ীতে দিয়েছিল, তুমি চিনতে পেরে আমার মার কাছে পাঠিয়ে দিলে।"

উজ্জয়িনীর মনে পড়বার কথা নয়। তবু মাথা হেলিয়ে সরল হেসে বলল, "মনে পড়ে। হারাধন কি এখনো তেমনি ছোট আছে, না, একটু বেড়েছে? ওহ্, কি পাজী!"

ওদের দুজনের স্মৃতিসমুদ্রমন্থনে সুধী যোগ দিতে পারছিল না। ভাবছিল, কেমন করে উজ্জয়িনীর কাছে কথাটা পাড়বে। কী ভাবে বলবে, এস, এ পথ তোমার পথ নয়। তোমার প্রকৃত পথ তোমাকে বাতলে দিই। উজ্জয়িনী যদি বলে, কে আপনি? কী আপনার অধিকার? পথ বাতলে দেবার যোগ্যতাই বা আপনার কী আছে? তখন সুধী কী উত্তর দেবে। এই সব চিন্তা করছিল। আর উজ্জয়িনীকে আড় চোখে দেখছিল। এই সেই উজ্জয়িনী। বিধবার কেশবেশ। মলিন বিরস বদন। হাসি যেন কৃষ্ণপক্ষের জ্যোৎস্না। চলন এলোমেলো। চাউনি আনমনা। এ তো চিঠির উজ্জয়িনী নয়, এ যে স্বপ্নের উজ্জয়িনী। এর সঙ্গে পতাকা বিনিময় করতে হবে, স্বপ্নে তাই করা গেছে। এর ঐ বৈরাগ্যের পতাকা একে মানায় না। একে ওর বহনকাজ থেকে নিষ্কৃতি দিতে হবে। উজ্জয়িনী, তোমার বৈরাগ্য আমাকে দান কর। স্বপ্নে সুধী তাকে এই অনুরোধ করেছিল। সে শুধিয়েছিল, সুধীদা, বিনিময়ে তুমি আমাকে কী দেবে? তখন সুধী বলেছিল, কল্যাণী হবার দীক্ষা।

"ভালো কথা, ডলির সঙ্গে লণ্ডনে দেখা। ওরা স্কটলণ্ড গেছে। তেড়ে গল্‌ফ্‌ খেলছে, এ-মনি করে।" বিভূতি দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে মাথার ডান দিকে উঠিয়ে জোরসে নামিয়ে আনল বাঁ দিকের হাঁটুর কাছে।

"আপনিও খুব গল্‌ফ্‌ খেলেন বুঝি?"

"আমার কি অত সুখের জীবন!" বিভূতি আর্দ্রস্বরে বলল।

পাশে বনমালীবাবুর বাড়ী ওরফে রাসবিহারীজীর কুঞ্জ। উজ্জয়িনী বলল, "একটু দাঁড়ান। আমি খবর দিই।"

যামিনী দেবী বাইরে এসে বললেন, "এস বাবারা, এস।" হঠাৎ কুকুরটাকে লক্ষ্য করে তাঁর প্রাণ উড়ে গেল। ওমা, বৈষ্ণবের বাড়ীতে কুকুর! আমার কী হবে গো! সব অশুচি হবে! নিকাতে হবে, ধুতে হবে, ফেলে দিতে হবে।

আত্মসম্বরণ করে বললেন, "আহা, কেষ্টের জীব।"

বনমালীবাবু ইতিমধ্যে বাড়ী ফিরেছিলেন। কুকুরের রূপগুণ দেখে তাঁর বুঝতে বাকী ছিল না যে ঈদৃশ নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ভূভারতে সম্ভব নয়। এঁর সঙ্গে উচ্ছিষ্ট ভাগ করে খাওয়া যমের অসাধ্য, ইনি খাস বিলাতী আমদানি। এঁকে কৃষ্ণ নাম দিলে ইনি উষ্ণ হয়ে টুঁটি টিপে ধরবেন।

বললেন, "অধমের কুটিরেই কি থাকা হবে?"

সুধী বলল, "আজ্ঞে না। আমরা ধর্মশালায় উঠেছি।"

বিভূতি বলল, "কেবল কুকুরটিকে এইখানে বেঁধে রেখে যাব।"

বনমালীবাবুর কপালে ও রগে কালঘাম দেখা দিল। "গিন্নী," তিনি মুমূর্ষুর মতো ক্ষীণ স্বরে বললেন, "মথুরায় আমার এক ঘর শিষ্য এসেছেন, না গেলে নয়, আমি তা হলে চললুম।"

"ভূতেশ্বর মহাদেব আমি কতকাল দেখিনি। আমাকেও নিয়ে চল, একবার প্রণাম করে আসি।" গিন্নী পুঁটলি বাঁধলেন।

"ওরে সুয়ো," বৃদ্ধ তাঁর কন্যাকে ডাক দিয়ে বললেন, "তোর রমাদিদি এসেছে রে। মথুরায় আজকের দিনটা থাকবে। আয়, ওদের সঙ্গে দেখা করে আসবি।"

ড্রামণ্ড তখন চারি দিক চেয়ে ভাবছিল, আই য়্যাম মনার্ক অফ অল আই সার্ভে। তার স্বদেশের কবির ভাষায়। বিভূতির মোটা বুদ্ধি। বনমালীবাবু সপরিবারে সহসা মথুরা প্রয়াণ করতে সম্যক ব্যস্ত হলেন, এতে তার খটকা বাধল না। সুধী কিন্তু মাথুরের মর্ম উদ্ধার করল। বলল, "ওকে আমরা তালিম দিয়ে দুরন্ত করেছি, ও ঠিক টের পায় কে গৃহস্থ কে চোর। জাতওয়ালা কুকুর। এদেশে এসে এই প্রথম বাঁদর দেখল কিনা। তাই অমন উত্তেজিত হয়ে উঠল।"

বনমালীবাবুর আংশিক প্রত্যয় হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ওদেশে কি বাঁদর নেই, বাবা?"

সুধীর উত্তর কেড়ে নিয়ে বিভূতি বলল, "চিড়িয়াখানায় কিছু আছে। নইলে যত্র তত্র—বুঝলেন কিনা—এই সব অসভ্য অভব্য জন্তুকে বিচরণ করতে দিলে ভদ্রসমাজের শ্লীলতাবোধে আঘাত লাগে।"

বিভূতি মিশুক মানুষ। হাসতে ও হাসাতে পটু। বনমালীবাবু এত হাসলেন যে, তাঁর বুলডগভীতি হাসির হাওয়ায় উড়ে গেল। বললেন, "আচ্ছা, তোমার কুকুর তা হলে এইখানে বাঁধা থাকল। পাড়ায় কয়েক রাত চুরি হয়ে গেছে হে। মাঠবনের চোর এসে চুরি করে চলে যায়। কেউ টের পায় না। সেই যে বলে, ধন্য মাঠ বনকা চৌর, বৃন্দাবনকা ধ্যান লাগাতে য্যায়সা চন্দ্র ঔর চকোর।"

উজ্জয়িনী ড্রামণ্ডকে খাইয়ে দাইয়ে ঠাণ্ডা করে তার ক্ষতস্থানগুলিকে ভালো করে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে বাঁধছিল। পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তার নিপুণ হাতের সেবা এক দৃষ্টে পর্যবেক্ষণ করছিল। অবশ্য সেবার চেয়ে সেবিতের উপর ছিল তাদের অধিক মনোযোগ। এমন কুকুর তো এ দিকে দেখা যায় না।

৩

শশীবালাকে উজ্জয়িনী বলল, "একটা কাজ করতে দেব, পারবে ?"

"কেন পারব না ? কী কাজ ?"

"ছোট হরিমতিকে বোলো তাকে আমার দরকার। যেন আজকেই দেখা করে।"

শশীবালা বলল, "আচ্ছা।"

বৈকালে ছোট হরিমতি এসে স্মিত হেসে শুধাল, "কি গো! তুমি নাকি ডেকেছ ?"

"বস।" উজ্জয়িনী তাকে আপ্যায়ন করে আশ্চর্য করে দিল। তার হাতে হাত রেখে তার কানে কানে বলল, "ভেবে দেখলুম, তোমার কথাই শুনব।"

"কী কথা ?"

"মনে পড়ে না ? সেই যে তুমি ইঙ্গিতে বলেছিলে। তা কি আমি বুঝিনি ?"

"বুঝেছিলে ? তবে যে বড় সতীপনা ফলালে ?"

"ভুল করেছিলুম। সেইজন্যে তো তোমাকে ডাকা।" উজ্জয়িনী চোখ টিপে বলল, "বুঝতে পারলে ? এখন আমি প্রস্তুত।"

ছোট হরিমতি তাকে আলিঙ্গন করে বলল, "আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম। আমি তো তোমার আশা ছেড়ে দিয়েছিলুম, ভাই।

"আমি স্বেচ্ছায় আশা দিচ্ছি।"

ছোট হরিমতির খোলা মন। চমৎকারের মতো খল নয়। উজ্জয়িনীর গায়ে চিমটি কেটে নিজের উল্লাস উদ্‌ঘোষণ করল। বলল,

"আজ আমার শুভ দিন। কোনো দিন তোমার মত পাবার ভরসা রাখিনি।"

"তা হলে আজকেই খবর দাও না তাকে।"

ছোট হরিমতি রঙ্গ করে বলল, "কেন, ত্বর সইছে না?"

উজ্জয়িনী পালটা রঙ্গ করল। বলল, "তোমারও এমনি এক দিন গেছে।"

কথাবার্তার দ্বারা স্থির হলো এই বাড়ীতেই একটু বেশি রাত করে সেই লোকটি আসবে। নারীবেশে এলে ধরা পড়বার ভয় থাকবে না। বৃন্দাবনে তো পুরুষরাও নারীবেশ পরে সখীভাবের সাধনা করে। কত ললিতা দাসী পুং, বিশাখা দাসী পুং, যমুনা দাসী পুং, কালিন্দী দাসী পুং মাথায় ঘোমটা টেনে প্রকাশ্যে চলাফেরা করছে। প্রশস্ত দিবালোকেও এদের দ্বিধালেশ নেই। নারীরাজ্য বৃন্দাবন। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কে পুরুষ আছে যে পৌরুষের অভিমানে এদের লজ্জা দেবে।

ছোট হরিমতি বিদায় নেবার সময় বলে গেল, "নতুন শাড়ী বকশিশ দিতে হবে কিন্তু।"

ড্রামও মাংসাশী কুকুর, মাংস ছাড়া অন্য কিছু খায়নি কোনো দিন। দেখা গেল নিরামিষেও তার সমান আসক্তি। উজ্জয়িনী তাকে সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের মতো ফলার করাল, খেতে দিল দই আর মিষ্টি, বিশেষ করে মালপোয়া। তার ঘণ্টায় ঘণ্টায় ক্ষুধা না পাওয়ার কথা, তবু উজ্জয়িনী তাকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ভূরিভোজন করাত। তার গা ডলাই মলাই করে, তার ঘা বেঁধে দেয়। পাড়াপড়শীর পরিহাস করে বলে, কুকুর না ঠাকুর।

যতই রাত বাড়তে থাকল উজ্জয়িনী ততই চকিত হতে থাকল।

বার বার ড্রামণ্ডের কাছে ছুটে যায়, অকারণে তাকে আদর করে। ড্রামি, ড্রামি, ড্রামি, ড্রামন, ড্রামু, ড্রামু, ড্রামো ; সেও কতকটা নেওটা হয়ে পড়ল। উজ্জয়িনীর হাত চাটে। উজ্জয়িনীর কোলে উঠতে চায়। বাচ্চ কুকুর। কত আর বয়স। সাত আট মাস হবে।

শশীবালা ও বিবসনা সারাদিন চরে এসে গোহালে ঢুকল। তাদের দৈনিক অভিজ্ঞতার রোমন্থন সারা হলে তাদের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। বনমালীবাবুর চোরের ভয়ে ভালো ঘুম হয় না, কিন্তু সেদিন বাড়ীতে বুলডগ বাঁধা, তাই তিনি বুলডগের কাজ না করে সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর স্ত্রী এত খাটেন যে শ্রান্ত হয়ে বিছানায় যেতে না যেতে অচেতন। সুরধুনী রাত জেগে বাতি জ্বেলে চুপ করে বই পড়ে। যখন বারোটা বাজল সেও বাতি নিবিয়ে দিল।

উজ্জয়িনী বার বার ওঠে, পা টিপে টিপে বাইরে যায়, উঁকি মারে, ড্রামণ্ডকে জাগিয়ে রাখে। সুরধুনী যখন বাতি নিবিয়ে দিল তখন উজ্জয়িনীর বুক দুর দুর করতে লাগল। কে জানে কী হতে গিয়ে কী হবে। যা ভেবেছে তা যদি না হয়।

ঘুম তারও পাচ্ছিল, কিন্তু ঘুমকে ঠেকিয়ে না রাখলে সে লোকটা দরজায় টোকা মেরে সাড়া না পেয়ে ফিরে যাবে, অথবা ধাক্কা মেরে সবাইকে জাগিয়ে তুলবে। উজ্জয়িনীর উদ্দেশ্যসিদ্ধি হবে না। অন্ধকার ঘরে একবার বসে, একবার দাঁড়ায়, একবার পায়চারি করে, একবার বাইরে যায়।

অবশেষে উজ্জয়িনীর কানে এল কেউ সদর দরজার ওধারে একটু অর্থপূর্ণভাবে কাশছে। তিনবার কাশি, আধ মিনিট ব্যবধান, আবার তিনবার কাশি, আবার আধ মিনিট ব্যবধান।

উজ্জয়িনীর বুকে তবলা বাজছিল। যা থাকে কপালে এই ভেবে সে সর্বপ্রথমে গেল ড্রামণ্ডের কাছে, দেখল সে সতর্ক রয়েছে। তার গলায় হাত বুলিয়ে দিয়ে তাকে একটু সোহাগ জানিয়ে সন্তর্পণে চলল দরজার দিকে। কান পেতে শুনল, সাংকেতিক কাশিই বটে। সর্দিকাশির কাশি নয়। সেও একবার কাশল। বুঝতে পারল ওধারের লোক উৎসাহিত হয়েছে, কাশির ব্যবধানে হাসির আওয়াজ এল।

যখন সংগ্রামের মুহূর্ত আসে তখন মুহূর্তের শতাংশকাল দীর্ঘসূত্রিতার স্থান নেই। তখন দ্বিমনা হলে পরাজয়, একমনা হলে জয়। দৃঢ় হস্তে শত্রু নাশ করতে হবে, নতুবা শত্রুর হস্তে নাশ অনিবার্য।

উজ্জয়িনী দরজা খুলে দিয়েই ঝট করে ছুটে গেল ড্রামণ্ডের কাছে। নারীবেশী লম্পট তাকে দেখতে পাচ্ছিল, কুকুরকে না। ঠাওরাল, এখনো সেই নতুন বকনাই আছে, শরমে লাজে হাত দূরে সরে গেছে। আত্মবিশ্বাসের উদ্ধত হাসি হেসে সে উজ্জয়িনীর দিকে অগ্রসর হল। অমনি উজ্জয়িনী করল কি না ড্রামণ্ডের গলার শিকল খুলে দিয়ে তাকে ইংরেজীতে হুকুম করল, "গো! র‍্যাট হিম।"

লোকটাকে কুকুরের মুখে সঁপে দিয়ে উজ্জয়িনী ক্ষিপ্রপদে তার ঘরে ফিরে গেল। লোকটা যখন অভ্রভেদী চিৎকার করে উঠল তখন উজ্জয়িনীর বুকটা ছেঁক করে উঠল। কে জানে। বাঁচবে তো? কী করলুম! ছি ছি! নরহত্যা!

বনমালীবাবু "চোর" "চোর" বলে জোর করে গিন্নীকে ঠেলতে থাকলেন। "ওগো! ওগো!"—অর্থাৎ গিন্নীকে সামনে না রেখে তিনি এগোবেন না।

শশীবালা ও বিবসনা হুড়মুড় করে উঠে আপন আপন পোঁটলা পুঁটলি হাতড়াতে লাগল।

কেবল সুরধুনীরই মাথা ঠিক ছিল। সে তাড়াতাড়ি বাতি জ্বালিয়ে বাতি হাতে করে বেরিয়ে এল। ততক্ষণে বাইরের লোকও কেউ কেউ এসে পড়েছে। দেখা গেল, একটা মেয়েমানুষের কাপড় ধরে টান দিতে দিতে ড্রামও আর সামান্য বাকী রেখেছে। মেয়েমানুষটা একহাতে ঘোমটা বাঁচাচ্ছে, অন্য হাতে কাপড়ের নিম্নাংশ। ড্রামও একবার করে লাফ দেয়, আর কাপড়ের অনেকখানি করে ছিঁড়ে ফাঁকা হয়ে যায়। পাঁচ মিনিট পরে সব ফরসা হয়ে যাবে, তখন চামড়ার উপর দাঁত বসবে। মাংস উঠে আসবে। ইতিমধ্যে নখর লেগে জায়গায় জায়গায় ছড়ে গেছে।

ধরা পড়বার ভয়ে লোকটা আর চিৎকার করছে না। যারা জমায়েৎ হয়েছে তারা বলছে এ কী রকম হলো। মেয়েমানুষ হয়ে চুরি করতে আসে অন্ধকার রাত্রে। বনমালীবাবু লোকজনের গলা শুনে সাহসপূর্বক বাহির হয়েছেন। তিনি বলছেন, মাঠবনের চোরনী। উজ্জয়িনী সমবেত মহিলাদের মাঝখানে মিশে গিয়ে তাঁদের মুখে শুনছে, মাগীর কী আস্পর্ধা। এমন সময় ড্রামও কারুর মনে কোনো সন্দেহ টিকতে দিল না। সকলে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, "হাঁ! পুরুষ!"

মহিলারা লজ্জায় প্রস্থান করলেন। উজ্জয়িনীও।

লোকটার ঘোমটা তবু ঠিক আছে। একজন দুঃসাহসী দর্শক সেইটেতে টান মেরে আলোটা তুলে ধরল। তখন সকলে চুকরে উঠল, "আরে, এ যে ভূষণলাল!" প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

৪

ভূষণলালকে ওরা থানায় নিয়ে গেল, থানার লোক পাঠাল ডাক্তারখানায়। তার যা হবার তা হবে। এদিকে জনরব, ভূষণলাল কেন নারীবেশে বনমালীবাবুর বাড়ী আসে? কার আকর্ষণে? কার প্রশ্রয়ে? নিশ্চয় সেই তরুণ গায়িকার।

রটতে আরম্ভ করলে কত কথা রটে। তাকে কে কবে ভূষণলালের সঙ্গে দেখেছে তা মুখে মুখে বিরচিত ও পল্লবিত হয়ে বিধবামহলে তুমুল উত্তেজনা সঞ্চার করল। পরচর্চা পরিষদের প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো তাই। পরিশেষে সর্বসাধারণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, সে ভূষণলালের প্রণয়ে কুলত্যাগিনী হয়েছে।

এ কিন্তু পরের ঘটনা। এর আগেই উজ্জয়িনী ধর্মশালায় দেখা করে বলেছে, "বিভূতিদা, তোমার কুকুর তুমি নাও। আমি আর এ শহরে থাকছিনে।"

বিভূতি জিজ্ঞাসা করেছে, "কোথায় যাবে?"

"কাশী।"

"কাশী কেন যাবে?"

"জেনে তোমার লাভ?"

বিভূতির মুখে উত্তর যোগায়নি। সুধী গম্ভীরভাবে বলেছে, "উজ্জয়িনী, তোমারি সন্ধানে আমরা ইংলণ্ড থেকে ভারতবর্ষে এসেছি। ভারতবর্ষের বহু স্থান ঘুরেছি। তুমি কি মনে করেছ তুমি কাশী গেলে আমরাও কাশী যাব না?"

বিভূতি সুধীকে শেষ করতে না দিয়ে বলেছে, "তুমি কি মনে করেছ তুমি কাশীতে কোথায় থাকবে আমরা তার খোঁজ পাবে না?"

আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলুম। যদিও তোমাকে জানিয়ে রাখা উচিত যে আমি তোমার বিভূতিদা হিসাবে এদেশে আসিনি। এসেছি প্রাইভেট ডিটেকটিভ হিসাবে, দস্তুরমতো প্রোফেসনাল কল্ পেয়ে।"

উজ্জয়িনী অবাক হয়ে আকাশপাতাল ভেবেছে। কে এঁদের ইংলণ্ড থেকে ভারতবর্ষে পাঠিয়েছে? কে এঁদের খরচপত্র দিয়েছে? সে কি বাদল? বাদল ছাড়া আর কে হতে পারে? তবে কি বাদল আমাকে ভালোবাসে, এ কি সত্য? যদি সত্য হয় তবে এর চেয়ে সুখের কথা আর নেই। এত সুখ সইতে পারব না। আমি মরে যাব।

"সুধীদা, আমাকে সত্য করে বল, কে তোমাদের পাঠিয়েছে?"

"উজ্জয়িনী, তোমাকে সমস্ত বলব। কিন্তু এখন নয়।"

"কিন্তু কখন বলবে? আমি যে থাকতে পারছিনে। আমি যে কাশী যাচ্ছি।"

"আজই?"

"এই ট্রেনে।"

তা শুনে সুধী বলেছে, "এই ট্রেনেই যদি যেতে চাও, উজ্জয়িনী, তবে কাশী কেন? অন্যত্র কেন নয়?"

উজ্জয়িনী প্রথমে হতবাক ও পরে পুলকিত হয়ে প্রশ্ন করেছে "অন্য কোথায়?"

"মুঙ্গের। কলকাতা। বম্বে। লণ্ডন।"

"কী যে বল সুধীদা। মুঙ্গের! বললে পারতে আন্দামান।"

"আচ্ছা, মুঙ্গের বাদ দেওয়া যাক। কলকাতা—"

"কলকাতা! কেন বল দেখি?"

"মা'র সঙ্গে দেখা করতে।"

"কার মা'র সঙ্গে? আমার তো মা নেই।"

"ছিঃ। অমন কথা বলে না। তোমার মা তোমার বাবার শোকে সন্তপ্ত। উপরন্তু তোমার জন্যে উৎকণ্ঠিত। পৃথিবীতে তাঁর আপন বলতে যে কয়জন তাঁদের সংখ্যা গেছে কমে। তাই অবশিষ্টদের প্রতি তাঁর প্রাণের টান বেড়েছে। তোমার জন্যে কত দুঃখ করলেন আমাদের কাছে।"

বিভূতি বলেছে, "আর সে মিসেস গুপ্ত নেই। বড় ভেঙে পড়েছেন।"

উজ্জয়িনী অশ্রু রোধ করে বলেছে, "কিন্তু এসব কথা অবান্তর। আমাকে কেন নিতে এসেছ তোমরা? কে আমাকে চায়? কার আমাকে দরকার? বিশেষ করে আমাকে না হলে কার দিন অচল?"

সুধী বলেছে, "ট্রেনে বলব। যেতে যদি হয় আর সময় বেশি নেই। গুছিয়ে নাও হে ডিটেকটিভ। তুমি কি বিদায় নিয়ে তৈরি হয়ে এসেছ, উজ্জয়িনী?"

উজ্জয়িনী অসহিষ্ণুভাবে বলেছে, "আমি কাশী যাব। সেখানে কোথায় উঠব, জান? সুশীলাবতীর বাড়ী।"

"কে তিনি?"

"জান না!" উজ্জয়িনী বিস্মিত হয়েছে। তাঁকে বাধ্য হয়ে উচ্চারণ করতে হয়েছে, "বেশ্যা!"

"কী! কী! কী!" বিভূতি হল্লা করে উঠেছে।

সুধী তাকে শান্ত করে উজ্জয়িনীকে শুধিয়েছে, "তাঁর ওখানে ক'দিন থাকবে জানতে পারি?"

উজ্জয়িনী সপ্রতিভ ভাবে বলেছে, "যত দিন না উপার্জনক্ষম হয়েছি।"

বিভূতি রাগ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। সুধী তাজ্জব

বলেছে। উজ্জয়িনী তা লক্ষ্য করে নিষ্ঠুরভাবে বলেছে, "আমি জানতে পারলে বাধিত হই পতিপরিত্যক্তার ও ছাড়া কী উপায় আছে? সব দিক ভেবে বলতে পার তো বল। তোমার সেই সব মহান উপদেশ মনে পড়লে গা জ্বালা করে। যদি মাপ কর তো একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলি, সুধীদা।"

"বল।"

"বলব?" উজ্জয়িনী ইতস্তত করে বলেছে, "ওসব উপদেশ আমার বৌদির জন্যে তুলে রাখ, অপাত্রে অপচয় কোরো না, দাদা।"

সুধী হেসে বলেছে, "আমিও যদি একটা কথা বলি?"

"কী কথা?"

"পতিপরিত্যক্তা কেন পতিপরিত্যাগিনী হবে?···বুঝতে পারলে না? স্বামী যদি ধর্মাচরণ না করে তবে স্বামীর দোষ। তা বলে স্ত্রী কেন ধর্মাচরণ করবে না, কেন দোষীর উপর রাগ করে দোষী হবে? দুটো অন্যায় মিলে একটা ন্যায় হয় না।"

উজ্জয়িনী ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছে, "আবার হিতোপদেশ। আমি বেশ্যা হয়ে না গেলে দেখছি তোমাদের উপদেশের জ্বালা থেকে নিস্তার নেই। তোমরা সাত হাজার মাইল দূর থেকে এসে আমাকে অগাধ জল থেকে ছেঁকে তুলবে কী জন্যে? না, উপদেশের আগুনে ভাজতে?"

"আচ্ছা, তোমাকে আমি উপদেশ দেব না। ওটা আমার বদ্ অভ্যাস। আচ্ছা, উজ্জয়িনী, আচ্ছা। তোমাকে একটা খবর দিই। অশোকা তালুকদারকে চেন?"

উজ্জয়িনী ভেবে বলেছে, "জাস্টিস তালুকদারের মেয়ে না?"

"সেই।···তাকে তোমার বৌদিদি করবে?"

প্রত্যেক নারীর মধ্যে ঘটকালি করার যে স্বাভাবিক অভিলাষটি আছে উজ্জয়িনীরও সেটি ছিল। এত দিন পায়নি, এই বার পেয়েছে আত্মপ্রকাশের সুযোগ। উজ্জয়িনী বলেছে, "বাহবা সুধীদা। তুমি কেবল সামান্য মীনকে অব্যর্থ জালক্ষেপে উর্ধ্বে তোল না! তুমি ডুবুরী, তুমি অমূল্য রত্ন উদ্ধার কর।"

"তোমার পছন্দ হয়েছে?"

"হবে না?" উজ্জয়িনী বলেছে, "দাদার সৌভাগ্যে বোনের হিংসা হয়। আমি কেবল ভাবি, অত মহার্হ রত্ন তুমি কোথায় রাখবে, তুমি তো দীনদরিদ্র মানুষ। অন্তত পাটনায় তাই শুনেছি।"

"আমারও সেই ভয়। কিন্তু সেই ভয়ে পশ্চাৎপদ হওয়া কাপুরুষতা নয় কি?"

"তা বটে।"

"আসল কথা কী জান, উজ্জয়িনী", সুধী অন্তরঙ্গ ভাবে বলেছে, "আমি মস্ত ভুল করেছি বাদলকে বিয়ে করতে রাজী করিয়ে। যে ট্র্যাজেডীর পত্তন করেছি নিজ হাতে, নিজ হাতে তাকে উপড়ে ফেলতে পারিনে, এমনি কঠোর নিয়তি। আজো আমার স্পষ্ট মনে পড়ে সেই দিন, যে দিন আমি তাকে রহস্য করে বলেছিলুম সে নিজে বিয়ে করে প্রমাণ করে দিক যে বিয়ে বলতে কিছুই বোঝায় না। তাই সে করল। সে বলেছিল, তোমাকে ভালোবাসবার বা তোমার প্রতি একনিষ্ঠ থাকবার দায়িত্ব তার নেই। আমি তামাশা করে বলেছিলুম, দেখা যাবে। দেখলুম।"

উজ্জয়িনীর দুই চোখ জলে ভরে তাকে অপূর্ব রমণীয় করেছে। সুধী গাঢ় স্বরে বলেছে, "তোমাকে বান্ধবী রূপে লাভ করবার লোভে তোমার যে ক্ষতি করলুম, উজ্জয়িনী, তার যদি কোনো

প্রতিপূরণ থাকত আমিই তোমাকে তা সংগ্রহ করে দিতুম। যার প্রতিকার নেই তাকে সইতে হয়, তা তো জান।"

"আমি পরীক্ষা করে শিখতে চাই যে প্রতিকার নেই।"

"বেশ তো। আমি কি বারণ করছি? পরীক্ষা তুমি কতক এই ক' মাস ধরে করেছে, আরো করতে চাও তো আরো কয়েক মাস কর। তবে আমি তোমার বড়। আমি যদি বলি যে ও পথে তুমি তৃপ্তি পাবে না, অতৃপ্তি থেকে অতৃপ্তিতে যাবে, রিক্ততা থেকে রিক্ততায়, তবে আমাকে ভুল বুঝো না, উজ্জয়িনী। আমি তোমার ব্যথার ব্যথী।"

উজ্জয়িনী ব্যাকুল হয়ে বলেছে, "আমি চাইনে তোমার ব্যথা। যাও তুমি অশোকাকে বিয়ে কর, সুখী হও। ছেড়ে দাও আমাকে। আমার পথ ছাড়। আমি পরিত্যক্তা শুধু পতির নয়, পরমপতির। আমি কলঙ্কিনী, আমি অশুচি। গৃহে আমার প্রবেশ নেই, গৃহবধূদের থেকে আমি দূরে। আমার আত্মসম্মান নিয়ে আমাকে সমাজের বাইরে বাস করতে দাও। আমি ঘৃণা করি এই অর্ধ সমাজ। এই না-ঘর না-ঘাট। এই বৃন্দাবন। আমি আজই এখান থেকে কাশী যাব। সমাজের বাইরেও মানুষ বাঁচে। তাতে এমন কোনো ব্যথা নেই যার সমব্যথী হয়ে তুমি আমাকে অনুগৃহীত করবে।"

সুধী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছে। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ। তারপর করুণ হেসে বলেছে, "কিন্তু আসল কথাটা চাপা পড়ে গেল যে! আমিই ভুল করেছি, আমিই করব প্রায়শ্চিত্ত। আমি বিয়ে করব না, উজ্জয়িনী।"

"সে কী!" উজ্জয়িনী শিউরে উঠেছে।

"না। আমি বিয়ে করব না। বিয়ে আমার ভয়ে নয়।"

উজ্জয়িনী স্তম্ভিত হয়েছে! সুধী সহজ স্বরে বলে চলেছে, "আমার প্রায়শ্চিত্ত নিছক ব্যথার নয়, উজ্জয়িনী। আমার আনন্দ প্রকৃতির সহধর্মে। নারীও প্রকৃতি বলে নারীর দাবি মানি। কিন্তু উপায় নেই নারীকে সহধর্মিণী করবার।"

"কিন্তু সুধীদা," উজ্জয়িনী জড়তা কাটিয়ে উঠে সবেগে বলেছে, "অশোকাকে বঞ্চিত করবার অধিকার তোমার নেই।"

"আমি যদি প্রাক্তন কর্মের দ্বারা আবদ্ধ না থাকতুম তবে," সুধী দু' হাত রগড়াতে রগড়াতে অত্যন্ত খেদের সহিত বলেছে, "তাকে বঞ্চিত করবার অধিকার আমার থাকত না।" তারপর হাত দুটিকে বেঁধে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছে, "বন্দীর আবার কিসের অধিকার?"

উজ্জয়িনী অশ্রু সম্বরণ করতে পারেনি। সাশ্রুলোচনা সকাতরে বলেছে, "তুমি আমার দাদা। কেবল বয়সে না, বিজ্ঞতায়। কেবল সম্পর্কে না, বেদনায়। তোমার কাছে আমি তেমনি স্বচ্ছন্দে স্বীকারোক্তি করব যেমন ক্যাথলিকরা করে তাদের কন্‌ফেসরের কাছে।"

সুধী দুই হাত যোড় করে সশ্রদ্ধ ভাবে শ্রবণ করতে প্রস্তুত হয়েছে।

উজ্জয়িনী বলেছে, "আমার স্বামীকে আমি প্রথম দিন থেকে ভালবেসে এসেছি প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত, আজও, এখনও।"

সুধী মাথা হেলিয়ে জানিয়েছে, আচ্ছা। বলে যাও।

"তাঁর ভালোবাসা পাইনি। তুমি লিখেছ পাব না।"

"কোনো নারীই পাবে না।" সুধী অভয় দিয়ে বলেছে, "তার তো হৃদয় নেই। আছে মনীষা। আর যা আছে তাকে সে বলে,

বায়োলজিকাল নীড।" ক্ষেপিয়ে বলেছে, "তোমারো যদি তা না থাকত তুমি সুশীলাবতীর বাড়ী যেতে চাইতে কেন ?"

উজ্জয়িনী লুটিয়ে পড়ে বলেছে, "পরিহাস কোরো না, দাদা। পরিহাসের বিষয় নয়। আমি তোমার মতো শক্তিমান নই। আমি নিঃসংশয়ে বুঝেছি আমি দুর্বল আমি আর্ত। আমার কামনা আমাকে যে গহ্বরের মুখে টেনে নিয়ে গেছল অসংখ্য নিরীহ নারীর সমাধি সে। আজো আমি জীবিত আছি, কেবল প্রাণে নয় আত্মসম্মানে, এর জন্যে ধন্যবাদ দিতে হয় আকস্মিককে। আর আমি ভগবান মানিনে। মানুষকে আমি অবিশ্বাস করতে শিখেছি।"

সুধী তার মাথায় হাত রেখে তাকে নিঃশব্দে আশীর্বাদ করেছে।

"বলতে পার, দাদা, কেন এমন হয় ?" উজ্জয়িনী পাগলের মতো প্রশ্ন করেছে, "পুরুষকে আমি প্রাণভরে ঘৃণা করি। অথচ পুরুষকে চিন্তা না করে আমি বাঁচিনে।"

সুধী দৃঢ়তার সহিত বলেছে, "বিধাতা আমাদের এত নিরুপায় করে গড়েননি যে আমাদের সুন্দর জীবন আমরা আপন শক্তিতে সফল করতে পারব না, অন্যের অপেক্ষা রাখব।" তারপর কোমলস্বরে বলেছে, "আমি গোঁড়া নই, উজ্জয়িনী। গোঁড়ামিকে আমি ধর্ম বলিনে। সামান্য স্খলনকে বাড়িয়ে দেখো না, উজ্জয়িনী। ক্ষণিককে চিরন্তন মনে করো না।"

৫

এমন সময় ঝড়ের মতো বেগে ঝড়েরই মতো উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে ছুটে এসেছে বিভূতি। হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছে, "সর্বনাশ হয়ে গেছে, সুধীদা, পুলিশ !"

সুধী অস্ফুট স্বরে বললে, "পুলিশ ?"

উজ্জয়িনীর সেই আশঙ্কা ছিল। সে প্রমাদ গণল।

"জানতে চায় কে ঐ বুলডগের মালিক।"

"কেন জানতে চায় ?"

"সেইটেই তো ভয়ের কথা। চৌকিদার আমার নাম করতে পারেনি। আমাকে ডাকতে এসেছে। দারোগা ম্যানেজারের ঘরে বসে আছে। কী হবে সুধীদা ? যদি আমাকে গ্রেপ্তার করে ?"

"না, না। গ্রেপ্তার করবে কেন ? চল দেখি।"

উজ্জয়িনীকে না নিয়ে দুই বন্ধু দারোগা-সন্দর্শনে চলল।

"বৈঠিয়ে, সাব।" দারোগা বিভূতিকে সম্বোধন করে বলল, "আপকা নাম বি. বি. নাগ ? খাস সাকিম বারদি, ঢাকা জিলা। হাল সাকিম লণ্ডন।"

বিভূতি মনে মনে ম্যানেজারটার মুণ্ডপাত করতে করতে ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে অথচ বাইরের ঠাট বজায় রেখে বলল, "ঠিক।"

"তব শুনিয়ে।" এই বলে দারোগা অভিযোগের বৃত্তান্ত পাঠ করে শোনাল। ভূষণলাল—হিন্দী উচ্চারণ ভুখনলাল—কাল রাত্রে বাড়ী ফিরছিলেন। রাজপথের উপর হঠাৎ একটা কুকুর, পরে জানা গেছে সেটা একটা বুলডগ, আচমকা তাঁকে ধরেছে। ধরে ক্ষতবিক্ষত করেছে। লোকজন বাতি নিয়ে ছুটে আসার পর তাঁদের সাক্ষাতে তাঁকে বেইজ্জৎ করেছে। তিনি একজন জায়গিরদার। মানী ব্যক্তি। কুকুরের মালিকের কর্তব্য ছিল কুকুরকে বেঁধে রাখা। সকলেই দেখেছে তার গলায় শিকল ছিল না। প্রকাশ থাকে যে, ঘটনাকালে কতক লোক 'চোর' 'চোর' বলে চিৎকার করায় তাঁর সম্মানের হানি হয়েছে। তাঁর মতো অবস্থার লোকের পক্ষে চুরি

করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অনাবশ্যক। এই চোর অপবাদের জন্তে কুকুরের মালিক গৌণত দায়ী। মালিকের নাম বনমালী গোস্বামীর বাড়ীতে খোঁজ করলে মালুম হবে।

দারোগা সমঝিয়ে দিল ২৮৯ ধারায় অভিযোগ। অপরাধ প্রমাণিত হলে ছয় মাস ফাটক কিম্বা হাজার টাকা জরিমানা হতে পারে।"

বিভূতি ঠক ঠক করে কাঁপতে শুরু করল। কাঁপুনি চাপা দেবার চেষ্টা করে কাষ্ঠ হাসি হেসে বলল, "আই টেল ইউ, আই নো নাথিং য়্যাবাউট ইট।"

দারোগা গম্ভীর মুখে বলল, "দেখুন," হিন্দীতে, "ভূষণলালজী খানদানী বংশের ছেলে। তাঁকে যারা থানায় নিয়ে যায় তারাও বলেছে যে একটা কুকুর, যার মতো কুকুর বৃন্দাবনে দেখা যায় না, যে কুকুর কাল একটা বাঁদর ধরেছিল, সেই তাঁকে আঘাত করেছে, তাঁর কাপড় ছিঁড়ে নিয়ে তাঁকে উলঙ্গ করেছে। আমিও দেখেছি ভূষণলালজীর গায়ে নখরের দাগ, জায়গায় জায়গায় রক্ত বেরিয়েছে। এও সত্য, যদিও দরবকি বাৎ, যে তাঁর পরনে ছিল একখানা ছিন্নভিন্ন শাড়ী।"

"শাড়ী!" ঘরে যারা ছিল সবাই বিস্ময়সূচক উক্তি করল।

"জী হাঁ!" দারোগা গম্ভীরভাবে বলল। তার চোখের কোণে বাঁকা হাসি।

ম্যানেজার কপালচাপড়ানি করে বলল, "কিন্তু ইনি তো কাল রাত্রে এই ধর্মশালায় ঘুমিয়েছেন।"

"অথচ এঁর কুকুর সারা শহর ঘুরেছে।" দারোগা বক্রোক্তি করল।

বিভূতি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে সুধীর দিকে চেয়ে রইল, মনে হল সে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠতেও পারে। সুধী বলল, "দারোগাজী,"

হিন্দীতে, "কুকুরটা এত মানুষ থাকতে তুষণলালজীকে ধরে কেন? সারা শহরে কি অন্য মানুষ নেই?"

সবাই দারোগাকে চেপে ধরল! "কহিয়ে।"

"তা আমি কী করে বলব। এত বাঁদর থাকতে একটাকে ধরেছিল কেন?"

সবাই এবার সুধীকে চেপে ধরল। "কহিয়ে।"

সুধী ও কথায় কান না দিয়ে বলল, "তারপর রাজপথেই যে এ ঘটনা ঘটেছে সে বিষয়ে কি আপনি তদন্ত করেছেন?"

"করেছি। কিন্তু যেখানে কুকুরের পায়ের দাগ পড়েছে সেটা রাজপথ নয়।"

"সেটা তা হলে কোনো ভদ্রলোকের বাড়ীর সামিল?"

"বনমালীবাবুর সদরদরজার ভিতরের দিকের জমিন।"

সুধী বলল, "দারোগাজী, শাড়ী পরে একজন জায়গিরদার রাত্রের অন্ধকারে সেখানে কেমন করে পৌঁছলেন, দরজা ভেঙে, না পাঁচিল টপকিয়ে?"

অট্টহাস্য সহকারে উপস্থিত জনতা (ইতিমধ্যে রবাহূত) দারোগাকে অপ্রস্তুত করল। দারোগা মুখ লম্বা করে দুই হাত ছড়িয়ে বলল, "ক্যা জানে।"

দারোগা ঠাওরেছিল কুকুরটার উপর বৃন্দাবনশুদ্ধ চটে রয়েছে। মামলা চালালে হাজার সাক্ষী জুটবে। এর ভিতর যে এমন প্যাঁচ আছে তা কে জানত।

সুধী বলল, "দারোগাজী, গ্রেপ্তার করার অধিকার আপনার আছে। আমার বন্ধুকে আপনি এই মুহূর্তে গ্রেপ্তার করতে পারেন। কিন্তু আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, এই এক ঘর মানুষকে সাক্ষী

করে, যে, এ মোকদ্দমা মিথ্যা। আমার বন্ধুর বুলডগেরই মতো গোঁ। তিনি ভূষণলালকে সহজে ছাড়বেন না, আপনাকেও হয়তো পস্তাতে হবে।"

বিভূতি সাহস ফিরে পেয়ে মনে মনে জপ করছিল, আমার খুব রাগ করা উচিত, খুব রাগ করা উচিত। কিন্তু রাগ করা তার ধাতে নেই। স্বভাবত গোবেচারা। ক্রোধের ভান করে বলল, "আপনাকেই আগে এক হাত নেব। প্রাইভেট ডিটেকটিভের সঙ্গে ইয়ার্কি!" সাড়ম্বর ইংরেজীতে।

দারোগা ভড়কে গেল। বিভূতি তাতে তাড়া করে নিয়ে গেল, অবশ্য বাহুবলে না, বাক্য যোগে। "জানেন ও কুকুরের নাম কী? বুলডগ ড্রামণ্ড। কখনো বিলিতী ডিটেকটিভ গল্পের বই পড়েছেন? হা হা হা। বুলডগ ড্রামণ্ডের নাম শোনেননি। কেন ওকে বিলেত থেকে এনেছি? কেন বৃন্দাবনে এসেছি? বাঁদর মারতে? জায়গিরদার পাকড়াতে? আপনাকে বলে দিই আর কী!"

দারোগা মাথা হেঁট করে বসে থাকল। ম্যানেজার হাত যোড় করে দাঁড়িয়ে থাকল। দর্শকেরা একে একে সরে পড়তে থাকল। বাপরে, ডিটেকটিভ। তাদেরি কাকে না জানি সন্দেহ করেছে। কার নামে কী ঠুকেছে! এই বেলা বৃন্দাবন ছেড়ে দ্বারকা চল। তীর্থ করতে এসে টিকিটিকির পাল্লায় পড়া। ওরে বাপ রে! এক্কা যোলাও, টিশনমে চলো।

"কর্‌ছ কী, বিভূতি!" সুধী তাকে সংযত করল। "এ ভদ্রলোকের দোষ কী? ইনি এঁর কর্তব্য বলে যা মনে করেছেন তাই পালন করতে এসেছেন। দারোগাজী, আপনাকে আমরা ভয় দেখিয়ে রেহাই পেতে চাইনে। আমরা শুধু সাবধান করে দিয়েছি মাত্র। আপনি এঁকে গ্রেপ্তার করুন। আমি এঁর জামিন দাঁড়াচ্ছি।"

দারোগা জানাল তার দরকার হবে না। কারণ এঁর বুলডগ যে সেই বুলডগ তা সনাক্ত করা শক্ত হবে। রাত সাড়ে বারোটার সময় ঘটনা। ঘোর অন্ধকার। মেঘলা ছিল। বাতির আলোয় লোকে দূর থেকে যেটাকে দেখেছে সেটা বুলডগ কি পাই ডগ অর্থাৎ রাস্তার কুকুর তা জোর করে বলা যায় না। ওদের উচিত ছিল কুকুরটাকেও থানায় হাজির করে দেওয়া। বনমালীবাবু বলছেন বটে সেটা তাঁর ভাড়াটের আত্মীয়ের বুলডগ, কিন্তু তিনিও মোকদ্দমার ভয়ে সত্যগোপন করেছেন, স্বীকার করেন নি যে কুকুরটাকে তাঁর বাড়ীতেই বাঁধা থাকতে তাঁর প্রতিবেশীরা দেখেছে। স্বীকার করলে পাছে তাঁকেই সাময়িকভাবে মালিক সাব্যস্ত করা হয়, পাছে তিনিই হন এ মোকদ্দমার আসামী। তাঁর ভাড়াটেকে নাকি কুকুরটার তদ্বির করতে দেখা গেছে। কিন্তু বাড়ীর উপর তা ভাড়াটের কর্তৃত্ব খাটে না। ভাড়াটে একখানা কি দুখানা ঘর নিয়ে আছে। কুকুরটাকে যেখানে বেঁধে রাখা হয়েছিল বলে শোনা যায় সেখানটা তো ভাড়াটের দখলে নয়। কে জানে কে কুকুরটাকে ছেড়ে দিয়েছে। বনমালীবাবুর বাড়ীতে তো লোকের অভাব নেই।

"তা হলে," সুধী জিজ্ঞাসা করল, "আমরা বৃন্দাবন থেকে বিদায় নিতে পারি ?"

"নিশ্চয়।" দারোগা অন্য মূর্তি ধারণ করে বলল, "কে আপনাদের কী করতে পারে। আমি আপনাদের বুলডগের পাহারার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।" বিভূতিকে, "থেকে যান না, সার, আরো দু-চার দিন। বিলেত থেকে ধাওয়া করে এসেছেন। বোধ হয় বিলিতী ডাকু। যদি দয়া করে বিশ্বাস করেন আমরাও কাজে লাগতে পারি। দিল্লীর একখানা কাগজে সেদিন পড়ছিলুম লেডী উডবার্নের

না কার মুক্তা চুরি গেছে। তাঁর ভারতীয় ভৃত্যকে সন্দেহ হয়। সেই নয় তো?"

বিভূতি অর্থপূর্ণ হাসি হাসল।

দারোগা বলল, "আচ্ছা, আপনার সঙ্গে একদিন নিরিবিলিতে দেখা করব, যদি ততদিন থাকেন।"

বিভূতি 'সার' গিরি ফলিয়ে বলল, "আমি তো আজ এখনি কলকাতা যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলুম। আপনি আমার ট্রেনটা মিস করালেন! লুক হিয়ার, ম্যান, একটা ট্যাকসি যোগাড় করে দিতে পারেন? মথুরায় ট্রেন ধরব।"

দারোগা সেলাম ঠুকে বলল, "জরুর।"

সুধী ও বিভূতি উপরে গিয়ে দেখল উজ্জয়িনী একলা বসে কী ভাবছে। বিভূতি বলল, "সিংহের মামা আমি নরহরি দাস। পঞ্চাশ দারোগায় এক এক গ্রাস।"

সুধী বলল, "থাম। আর হাসিও না। নরহরি দাসের থরহরি ত্রাস বুকে হাত দিলে এখনো বোঝা যায়।"

উজ্জয়িনী ভাবছিল, এই বৃন্দাবন! এখানে পুলিশ পর্যন্ত আছে। তার মানে এখানে চুরি বাটপাড়ি হয়। আসামী চালান যায়। আমার শ্বশুরের মতো কেউ তাদের বিচার করেন। তবে কেন এর জন্যে মুঙ্গের ত্যাগ করলুম? দোকান-বাজার বেচা-কেনা সবই তো এখানে সব জায়গার মতো। কোন বিষয়ে এখানকার লোক কম বিষয়ী? এরা যদি ছদ্মবেশী গোপ-গোপী হয় তবে মুঙ্গেরের লোক কেন তা নয়? ভগবানের লীলা যদি মন্দিরে নিবদ্ধ হয়ে থাকে তবে যেমন এখানে তেমনি মুঙ্গেরে তেমনি পাটনায় তেমনি কুষ্ণনগরে। যদি মূর্তিতে নিবদ্ধ হয়ে থাকে তবে তো ঘরে

ঘরে। এমন কোন বাড়ী আছে যে বাড়ীতে অন্তত একখানা পট নেই?

ইস! কী ভ্রান্তি! উজ্জয়িনী চেয়ে দেখল সুধী ও বিভূতি তার সামনে দাঁড়িয়ে। বলল, "কী হলো? পুলিশ গেছে না আছে?"

"গেছে আমাদের জন্তে ট্যাকসি ডাকতে। মথুরা গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে। আর বসে থেকো না। ড্রামগুকে ড্রেস কর। ওর ঘা এখনো শুকোয়নি।" ইতি বিভূতি।

৬

ট্রেন যখন মোগলসরাই স্টেশনের নিকটবর্তী হলো উজ্জয়িনী বলল, "সুধীদা, সত্যি বলছ আমার অন্ত উপায় আছে? না কাশীর গাড়ী ধরব?"

সুধী আশ্চর্য হয়ে বলল, "এখনো তোমার দ্বিধা গেল না, উজ্জয়িনী?"

উজ্জয়িনী স্নিগ্ধকণ্ঠে বলল, "সবাই ত তুমি নয়। মা আমাকে মনে মনে ঘেন্না করবেন। আত্মীয়রা আমার জন্ত লজ্জিত হবেন। শ্বশুর ত মুখ দর্শন করবেন না। শ্বশুরপুত্রের কথা তুমিই ভাল জান।"

বাদল সম্বন্ধে সুধী তাকে আশ্বস্ত করল। "বাদল তোমাকে ভাল না বাসতে পারে, কিন্তু তুমি দেখবে, উজ্জয়িনী, ও সত্যিকার ভদ্রলোক। ওর স্ত্রী বলে ওর কাছে পরিচয় না দিলে ওর কাছে যে ব্যবহার পাবে তা খুব কম স্ত্রীই খুব কম স্বামীর কাছে পেয়ে থাকে।"

"তা আমি স্বীকার করি।" উজ্জয়িনী স্মরণ করে বলল, "যে ক'দিন ওঁকে কাছে পেয়েছি, কি আমার পরিচয় ছিল জানিনে. কিন্তু ব্যবহার যা পেয়েছি তা অনিন্দ্য।"

"ঠিক সেই ব্যবহারই পাবে। তোমার উপর ওর বিরাগ নেই, ওর রাগ তোমার সঙ্গে বন্ধনের উপর। বন্ধনমাত্রেরই উপর। তুমি যদি রূপে ও বর্ণে রমণীকুলের রাণী হতে, যদি তার স্বমনোনীত দেশের শ্বেতবরণা রানী হতে, তথাপি সে বিবাহকে বন্ধন জ্ঞান করত, তোমার খাতিরে বন্ধন বহন করত না।"

"বুঝেছি।" উজ্জয়িনী অনেকক্ষণ ভেবে বলল, "বুঝেছি। কিন্তু আমার কি উপায় হবে? আমার কি অবলম্বন?"

"শোননি বুঝি তোমার বাবা তোমার জন্য তাঁর উইলে কি ব্যবস্থা করে গেছেন?"

"না!

"তোমার মাকে দিয়েছেন তাঁর ফাণ্ড, ইনশিওরেন্স ও কলকাতার বাড়ী। তোমার দিদিদেরকে তাঁর পৈত্রিক উত্তরাধিকার। তোমাকে তাঁর সমগ্র জীবনের স্বোপার্জিত সঞ্চয়। তবে তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন একটি শর্ত। কি শর্ত? এই সর্ত যে তুমি যক্ষ্মা রোগিণীদের জন্য একটি ক্লিনিক চালাবে।"

উজ্জয়িনী চোখের জলে ভেসে বলল, "কই, বাবা ত কোনো দিন অমন ইচ্ছা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করেননি।"

"লিখেছেন, জ্ঞানচর্চায় সময় অতিবাহিত করলেন, পীড়িতের প্রতি কর্তব্য করেননি। বিপন্ন মানবের জন্য চিকিৎসক হয়েছিলেন, চিকিৎসার চেয়ে জ্ঞানপিপাসা প্রবল হল। তাঁর প্রিয়তমা কন্যা যদি মানবের নিকট তাঁর ঋণ শোধ করে তবে তিনি পিণ্ডপ্রাপ্তির

আনন্দ পাবেন। যদিও তিনি পরলোক বা পরজন্ম মানেন না, মৃত্যুই তাঁর চরম দশা।

মোগলসরাইতে বিভূতি দেখা করতে এল। সে উঠেছে অন্য কামরায়, সেখানে ফিরিঙ্গী মহাপ্রভুরা তাস খেলছেন, বিভূতি তাঁদের দলে পসার করে নিয়েছে। লণ্ডনে বসে বসে ব্রিজ খেলাতেও সে পোক্ত হয়েছে, শুধু নৃত্যকলায় নয়।

"উজ্জয়িনী কাঁদছে কেন, সুধীদা ?"

"কাঁদছে তার বাবার উইলের কথা শুনে।"

"বাই জোভ। লিলি ডলি ডুবোনে মিলে পেল এক লাখ আর এ মেয়ে একাই পাবে এক লাখ আশী হাজার। কাঁদছে! কি উজ্জয়িনী! এত টাকা নিয়ে কী করবে, তাই ভেবে কাঁদছ!"

উজ্জয়িনী তাকে আমল দিল না। সুধীকে বলল, "শুধু ইচ্ছা থাকলে হয় না, যোগ্যতা থাকা চাই। আমি কি ক্লিনিক চালনার যোগ্য ?"

"যোগ্যতা অর্জনসাপেক্ষ। অর্জন করিতে বাধা কা? ইউরোপ চল। ডাক্তারী পড়। কোনো ক্লিনিকে শিক্ষানবিশ হও। ক্লিনিক তো আজই খুলতে বলা হচ্ছে না। দশ বছর পরে খুলো।"

"ততদিনে," বিভূতি যেন কত বড় একটা রসিকতা করছে এই ভাবে বলল, "ওর স্বামী হয়েছে জেলা জজ কি ম্যাজিস্ট্রেট। ও করবে ডাক্তারী! কী যে বলে!"

"তুমি চুপ কর, বিভূতিদা।" উজ্জয়িনী রুষ্ট হয়ে বলল।

বিভূতি আরো দু চারটে বাজে রসিকতা করে তার কামরায় ফিরে গেল। ফিরিঙ্গী বাবাজীরা স্টেশন থেকে বোতল কিনে নিয়ে জমিয়ে বসেছেন। বিভূতির ওতে মতি নেই, তবে টু কীপ কম্পানী সে যে এক ফোঁটা বীয়ারও খাবে না এ কিন্তু বাড়াবাড়ি।

"সুধীদা," উজ্জয়িনী চলন্ত ট্রেন থেকে কাশীর উদ্দেশে চেয়ে থেকে বলল, "উপায়ের জন্যে কাশী যেতে হল না, উপায় আপনি এল। কিন্তু ইচ্ছা কই? একদা আমার অভিলাষ ছিল নার্স হব। বাবাও বলতেন, তুই নার্স হবি। সেই অভিলাষের রঙিন মোমবাতি নিষ্প্রভ হয়ে যায় বিয়াহের রোশনাইয়ে। এখন দেখছি রোশনাই নিবে গিয়ে চারি দিক অন্ধকার। মোমবাতিও কখন জ্বলে ফুরিয়ে গেছে। আমাকে একটা নতুন আলো দাও, সুধীদা। কী হবে আমার টাকা? কেন শর্ত মানব?"

"পিতার তৃপ্তির জন্যে।"

"এ কিন্তু অত্যাচার। তাঁর আরো দুই মেয়ে আছে। তারা টাকাও নিক, ক্লিনিকও চালাক।"

"তার ব্যবস্থা তিনিই করে গেছেন। তুমি যদি না চালাও ট্রাস্টিরা চালাবে।"

উজ্জয়িনী মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "বাঁচা গেল। পিতার তৃপ্তির জন্যে বিয়ে করেছি। সেই হালে পানি পাচ্ছিনে। আবার কেন?"

বহুক্ষণ নীরব থেকে সুধী বলল, "আলোর কথা বলছিলে, উজ্জয়িনী। আমার যা আদর্শ তাই আমি তোমায় হস্তান্তরিত করব। তুমি হও জীবনশিল্পী। জীবনকে পরতে পরতে পর্বে পর্বে আপন হাতে সাজাও। গান শিখতে যাচ্ছিলে সুশীলাবতীর কাছে। মনে কর, তোমার জীবনটাই একখানি গান। সঙ্গীতের নিয়ম মেনে, সংযম রক্ষা করে, নিষ্ঠার সহিত ও অন্তর থেকে এই গানখানি গাও দেখি।"

উজ্জয়িনী বলল, "সে কী রকম?"

"প্রতি দিনের প্রত্যেক কাজ," সুধী বলল, "পরম্পরা সঙ্গত হবে, সবটা

মিলে হবে চমৎকার একটি ঠাসবুনন। তাতে অবান্তর কিছু থাকবে না, অতিরিক্ত কিছু থাকবে না, অভাবও থাকবে না কিছুর।"

"অভাব থাকবে না!" উজ্জয়িনী অবিশ্বাসের স্বরে বলল।

"যা অবান্তর তাকে এড়িয়ে চলতে পারি। যা অতিরিক্ত তাকে বাদ দিতে পারি। কিন্তু যার অভাব তাকে পাই কোথায়? বামনের যদি চাঁদের অভাব হয়!"

"সেইখানে তো নিপুণ গৃহিণীর নিপুণতা। অভাবকে ঐশ্বর্যে রূপান্তরিত করার কৌশল তিনি আয়ত্ত করেছেন। সকল কলার শ্রেষ্ঠ তো সেই।"

"তা আমাকে শেখাতে পার?"

"যথাসাধ্য।"

উজ্জয়িনী উৎফুল্ল হয়ে বলল, "হাঁ। এরই নাম নতুন আলো। ধন্যবাদ, সুধীদা।"

"কিন্তু," উজ্জয়িনীই আবার বলল, "তোমার জন্যে কী হাতে রাখলে দাদা?"

"আমি কচ। অধীত বিদ্যার প্রয়োগ করতে পারব না, কিন্তু অধ্যাপন করব।"

"তা হলে তোমার দেবযানীটির কী হবে?"

"আমি কি করে বলব?" সুধী ব্যথা চেপে বলল, "কোনো যযাতির রাণী হবে!"

"অত সোজা নয়, সুধীদা। যযাতিকে নিয়ে দেবযানী সুখী হয়েছে, পুরাণে এর প্রমাণ নেই।"

"কচকে পেলে দেবযানী সুখী হত, এরই বা প্রমাণ কী?" সুধী ম্লান হেসে বলল, "অশোকা যদি আমার হাতে পড়ে তবে এত

দিক থেকে তাকে এত ত্যাগ করতে হবে যে সুখের অবকাশ পাবে না।"

"তবু ভালবাসা তো পাবে।" উজ্জয়িনী প্রত্যয়ের সহিত বলল, "তাইতে সব ত্যাগ পুষিয়ে যাবে, পুষিয়ে গিয়ে কিছু লাভ থাকবে।"

"ঠিক জান ?" সুধী তাকে ক্ষেপিয়ে বলল, "আমি কিন্তু ভালবাসার উপর নির্ভর রাখিনে। ভালবাসা হল বহুরূপী। কখনো সে কামনা, কখনো স্নেহ, কখনো আসক্তি, কখনো অভ্যাস, কখনো অবজ্ঞা, কখনো বা ঘৃণা। বহুরূপীকে নিয়ে ঘর করা কেমন করে সুখের হবে ? বরফকে ধরতে গেলে দেখবে সে জল হয়ে বয়ে যাচ্ছে, জলকে আটকাতে গেলে দেখবে সে বাষ্প হয়ে উড়ে গেছে।"

উজ্জয়িনী মেনে নিতে পারছিল না, অথচ প্রতিবাদ যে করবে তার প্রতিষ্ঠাভূমি কই ! তার অভিজ্ঞতা তো সুধীরই স্বপক্ষে।

"তুমি ভেবেছ বাদল না হয়ে যদি অন্য কেউ হত—ধর শ্রীকৃষ্ণ হত —তবে তুমি সুখী হতে ?" সুধী এর উত্তর আপনি দিল। "না উজ্জয়িনী, সে তোমাকে ভালোবাসত বটে, কিন্তু তুমিই হয়তো বলতে, চাইনে। বলতে, অবাদলের প্রেমের চেয়ে বাদলের অপ্রেম ভালো।"

উজ্জয়িনীর কানে লেগে রয়েছিল শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ। সে লজ্জায় লোহিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "সুধীদা, রাধাকৃষ্ণের প্রেম কি তোমার মনে ধরে না ?"

"কেন মনে ধরবে না ?" সুধী বুঝিয়ে বলল, "লোকসাহিত্য লোকনৃত্য লোকসঙ্গীত যেমন মনে ধরে রাখাল ছেলের সঙ্গে সমবয়সিনী গোপ-বধূর প্রেম-প্রেম খেলা তেমনি মনে ধরে। আমি বুঝি খেলিনি ?"

"ওমা, তুমিও ! উজ্জয়িনী ভারী কৌতুক বোধ করল। কে

বলবে এই জ্ঞানবৃদ্ধ গুরুগম্ভীর মানুষটি এক দিন বালক ছিল! বালিকাদের সঙ্গে লুকাচুরি খেলত!

"সব জিনিসের বয়স আছে, উজ্জয়িনী। ছোটবেলায় তুমি কী খেতে ভালবাসতে জানিনে, আমি ভালবাসতুম যত রাজ্যের টক ফল। হাসছ? সত্যি আমি এক এক দিন তিন শ চার শ কুল খেয়েছি, জাম খেয়েছি। কিন্তু এখন আর ওসব অমৃত মুখে রোচে না।"

"আমিও," উজ্জয়িনী না বলে থাকতে পারছিল না, "মিষ্টি একেবারে ছেড়েছি। দুচক্ষে দেখতে পারিনে। মুখে দিলে তো রোচা না রোচার প্রশ্ন উঠবে।"

"আমি তা হলে তোমার তুলনায় লোভী।" সুধী হেসে বলল।

"না দাদা। টকের কথা তো বলিনি। ওর উপর আমার ষোল আনা মমতা।"

"কিন্তু," সুধী তর্কের খেই হাতে নিয়ে বলল, "রাধাকৃষ্ণের অপরিণত বয়সের লোকরঙ্গকে পুরুষ ও প্রকৃতির নিত্য লীলা রূপে দর্শনের স্তরে উন্নীত করতে চাওয়া বৃথা। কোথায় আমাদের ষড়্‌দর্শন আর কোথায় বৈষ্ণবতত্ত্ব! বীণার কাছে বাঁশী! পুরুষ বলতে বোঝায় নির্বিকার নির্গুণ আত্মসমাহিত যোগমগ্ন। শিবের মধ্যে তার আভাস পাই। আর প্রকৃতি বলতে বুঝি উর্বরা পত্রসমৃদ্ধা পুষ্পোচ্ছলা ফলভারনতা। কুমারজননী উমার মধ্যে এর ইঙ্গিত আছে।"

"কী আশ্চর্য!" উজ্জয়িনী সুধীর কথা কেড়ে নিয়ে বলল, "আমিও আজ কয়েকদিন শিবের বিষয় ভাবছি। কিন্তু এ দিক থেকে ভাবিনি।"

"এই আমাদের ক্লাসিক আদর্শ, উজ্জয়িনী। আমাদের ক্লাসিক কবি কালিদাস এরই দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তুমিও হবে।

তোমার স্বামী উমার স্বামীর মতো ভোলানাথ, উমার মতো তোমারও এই নিয়ে দুঃখ। প্রভেদ এই যে তোমার স্বামী তোমাকে স্ত্রী বলে স্বীকার করে না। তাতে কী আসে যায়, যখন সে আর কাউকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করছে না ?"

উজ্জয়িনী মাথা নীচু করে বলল, "বুঝেছি। আমি উমা, তিনি শিব। তিনি তাঁর মতো হোন, আমি আমার মতো হব। সুখের জন্যে লালায়িত নই, দুঃখ আসে তো দুঃখিত হব না। প্রেম যদি পাই তো ভাগ্য মানব, না পেলে জীবন ব্যর্থ মনে করব না।"

৭

উজ্জয়িনী ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতেই তার মা তাকে বুকে তুলে নিয়ে বার বার চুমো খেলেন। সুর করে বললেন, "তোর বাবা আর নেই রে! কাকে দেখতে এলি!"

সেও কেঁদে উঠে বলল, "আমারি উপর রাগ করে তিনি চলে গেলেন, আমি জন্মে ভুলব না।"

দুজনে মিলে জড়াজড়ি করে খানিক শোক করার পর মা বললেন, "হাঁ? তোর এ বেশ কেন? তোর চুল কে কাটল? কে তোর গহনা কেড়ে নিল?"

উজ্জয়িনী বলল, "কেউ না। আমার দুর্বুদ্ধি।

"আয় আয় আয়।" বলে তার মা তাকে টেনে নিয়ে গেলেন। নিজে সাজসজ্জা করতে পারেন না, অথচ সাজসজ্জার শখ তেমনি আছে। মেয়েকে মনের মতো সাজালেন। এমন করে সাজালেন যে তার কাটা চুলকে আধুনিকতম ফ্যাশান বলে ভ্রম হবে। নিজের

গহনাগুলি নিজে তো পরতে পারেন না, মেয়েকে পরালেন। ভীষণ দামী গহনা, ফ্যাশানের শেষ কথা। সুন্দর পরিচ্ছদ সুন্দর অলকার সুন্দর প্রসাধন কোন নারীর না ভালো লাগে ? উজ্জয়িনী মর্মে মর্মে নারী। সে অকারণে এঘর ওঘর করতে থাকে। একবার এ আয়নায় তাকায়, একবার ও আয়নায়।

মনে মনে বলে, "গর্ব করতে চাইনে, কিন্তু নিশ্চয় করে বলতে পারি আমার শিবঠাকুরটি যদি আমাকে এই বেশে দেখেন তবে—" লজ্জায় উজ্জয়িনীর গায়ে কাঁটা দেয়। সে একমুঠা জবা ফুলের মতো রাঙা হয়ে ওঠে।

"সুধীদা," উজ্জয়িনী সুধীকে তাদের লাইব্রেরীতে পাকড়াও করে বলে, "দেখ দেখি। আমাকে উমা বলে চেনা যায় ?"

সুধী তার দিকে চেয়ে বিমুগ্ধ হয়ে বলল, "উমা যে রাজকন্যা। বাপের বাড়ীতে সে বছরে একবার আসে, মা মেনকা তাকে রাজার মেয়ের মতো দেখতে চান। তাই রাজার মেয়ের মতো সাজান।"

"বিভূতিদা। ও বিভূতিদা।" উজ্জয়িনী বিভূতিকে খুঁজে পায় বিলিয়ার্ড রুমে। সে একাই দুই খেলোয়াড়, একাই মার্কার। এক একটা 'পট' করে আর চেঁচিয়ে ওঠে, "থ্যাঙ্ক মি। থ্যাঙ্ক মি।"

"বিভূতিদা, চিনতে পার ?"

বিভূতি খেলার টেবল থেকে মুখ তোলে না। বলে, "খেলবে ? এস। একটা কিউ বেছে নাও।"

"দেখ না আমার দিকে চেয়ে। বল না আমি কে ?"

বিভূতি খেলার ব্যাঘাত বরদাস্ত করতে পারে না। এক সেকেণ্ড আড় চোখে তাকিয়ে প্রায় লাফিয়ে ওঠে। "এ কে! ডলি!"

তারপর অপ্রতিভ হয়ে বলে, "অবিকল ডলির মতো দেখতে। শুধু রংটা যা একটু মলিন।"

উজ্জয়িনী তাকে মারতে উদ্যত হয়। খিল খিল করে হেসে উঠে বলে, "তোমার বৌকে এ কথা বলে দেব। তুমি এখনো সকলের মুখে ডলির মুখ দেখতে পাও।"

"না, না, বেবী। কখনো অমন কথা বোলো না।" বিভূতি খেলা ফেলে কাকুতি মিনতি শুরু করে। "ও হিউমার বোঝে না। কী জানি কী মনে করবে। আমার দাম্পত্য জীবনের সুখ শান্তি যাবে। অমন কাজ কোরো না, বেবী।"

উজ্জয়িনী রসিকতায় রসিকতায় বিভূতিকে কোণঠাসা করে। "রেখাদির সঙ্গে দেখা হলে তাঁকে কী বলব, জান? বলব অবিকল ডলিদির মতো দেখতে। শুধু চোখ নাক ঠোঁট চিবুক হাত-পা গড়ন ধরন মাপ জোখ এই সব যা একটু অন্য রকম।"

উজ্জয়িনীর মনটা খুব হালকা হয়ে গেছে। মাকে ডেকে বলে, "মা মণি!" এমনি। ডাকতে ইচ্ছা করে তাই ডাকে। বাবাকে তো ডাকতে পারছে না। ডাকলে পাবে না। এত বড় বাড়ী হাঁ করে রয়েছে। তার কোনো কোণে বাবা লুকিয়ে নেই। শুই মা-ই এখন তার বাবা এবং মা। তাই এখন তাঁর নাম, মা-মণি।

"মা-মণি, চল আমরা কোথাও যাই।"

"তাই চল। তোর সাহস আছে, তুই জীবনকে দেখেছিস, তুই যেখানে নিয়ে যাবি আমি সেইখানে যাব। যদি কোনো দিন তোর মনে হয় যে বুড়ীটা বড় জঞ্জাল তবে ফেলে দিস অতল সমুদ্রে। নতুন করে জীবন আরম্ভ করব সে সামর্থ্য নেই, তবু জীবিত থেকে জীবনের দর্শন পাব না এ অতি দুঃসহ।"

সুধী তাঁর অনুমতি নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কাকে আপনি জীবন বলছেন, মা?"

তিনি প্রস্তুত ছিলেন। বললেন, "যাকে পেয়েছি তা জীবন নয়। যাকে পাইনি তাই জীবন।"

"কাকে পাননি?"

"তা কি জানি? শূন্য ঠেকে। তাই থেকে বুঝি কী যেন পাইনি, কী যেন বাকী আছে।"

সুধী তাঁর ক্ষমা ভিক্ষা করে বলল, "আপনার কি কোনো ভোগ বাকী আছে, মা?"

তিনি লজ্জিত ভাবে শিরশ্চালন করলেন। "না, সুধীন।"

"মা," সুধী তাঁকে বোঝাল, "মৃত্যু আপনার পাশ থেকে আপনার সাথীকে হরণ করল। মৃত্যুবেশী জীবনের সেই রুদ্র রূপ দেখবার পর কোমলতর রূপ আকাঙ্ক্ষা করেন?"

"বলতে পারব না, সুধীন। চিন্তা করিনি।" তিনি চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, "বুঝেছি। যে একবার কঠিনের স্বাদ পেয়েছে সে আর সহজের মধ্যে রস পায় না! আমি রুদ্রতর রূপ আকাঙ্ক্ষা করি। তাকে পাই কোথায়?"

সুধী বলল, "যেখানে অহোরাত্র তাণ্ডব চলেছে সেইখানে। আপনি ডাক্তারের স্ত্রী। আপনাকে বলে দিতে হবে না। হাসপাতালে। ...নিকে।"

"কোনো দিন ভুলেও ওসবের ছায়া মাড়াইনি। স্বামী ডাক্তার কি মোক্তার ছিলেন সেটা ছিল বাইরের তথ্য। আমার ...বনে আমি তাকে প্রতিফলিত হতে দিইনি। আমার পক্ষে তা একই কথা। পদমর্যাদার দিক থেকে স্বাচ্ছন্দ্যের দিক থেকে তার

বিচার করেছি। কিন্তু তাকে আমার জীবনের নিয়ন্তা করিনি।” আফসোস করে বললেন, “এ বয়সে রোগী ঘাঁটতে বল ?”

“ওরা কি কেবল রোগী ? ওরা কি কারুর মা নয়, বোন নয়, স্ত্রী নয়, মেয়ে নয়, বাপ নয়, ভাই নয়, স্বামী নয়, ছেলে নয় ?” সুধী সুগভীর অনুকম্পার সহিত বলল, “ওরা কি আপনার আমার কেউ নয় ?”

“কিন্তু এই বয়সে !”

“বয়সের দ্বারা কী আসে যায়, মা ? এখনো তো আপনি পঁয়তাল্লিশ পার হননি। অন্তত পনেরো বছর পরমায়ু রয়েছে। এই দীর্ঘকাল কী করে কাটাবেন ? আপনার শিক্ষা, আপনার অভিজ্ঞতা, আপনার ক্ষমতা সমাজের কল্যাণে খাটুক। চলুন, আপনি ক্লিনিকের কাজ শিখবেন। পরে খুলবেন ক্লিনিক।”

উজ্জয়িনী এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। বলল, “মা-মণি, তুমি হও দুঃখী দুঃখিনীদের মা। তা হলে আমারও সত্যিকার মা হবে ; জন্মদায়িনী মা নয়, অন্তর্যামিনী মা।”

সুজাতা দেবী বললেন, “তাই হবে।”

---

( ১৯৩৪ )